কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

কেমন ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

দারুস সালাম বাংলাদেশ

কেমন ছিলেন

মূল

আল্লামা আব্দুল মালেক আল-কাসেম

আদেল বিন আলী আশ-শিদ্দী

অনুবাদ-সম্পাদনা

মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ

এম.এম, বিএ অনার্স, [ইসলামিক স্টাডিজ] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বিসিএস (শিক্ষা)
সহযোগী অধ্যাপক, বদরুন্নেসা সরকারী মহিলা কলেজ, ঢাকা।

মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন

বিএ অনার্স, ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট [ইসলামিক স্টাডিজ]
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

প্রকাশনায়

দারুস সালাম বাংলাদেশ

বুক্স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯
E-mail: darussalambangladesh@gmail.com

পৃষ্ঠপোষকতায়
মোসাম্মাৎ সকিনা খাতুন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ আবদুল জাব্বার
দারুস সালাম বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯, ০১৭১৫৮১৯৮৬৯

পরিচালক
ফাওযুল আযিম ফাওযান

পরিচালনায়
মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯২৬২৭৩০৩৫

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ২০১৪
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ২০১৫

মুদ্রণে ঃ ক্রিয়েটিভ প্রিণ্টার্স

হাদিয়া : ২৩০ টাকা মাত্র।

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবীকূল শিরমনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর যিনি প্রেরিত হয়েছেন বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও অবাধ্যতায় বর্তমান যুগের লোক দুভাগে বিভক্ত।

তাদের মধ্যে অনেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে এমন বাড়াবাড়ি করে যে, তাদের কার্যক্রম শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। [আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই]

অনেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরীকা ও তাঁর সীরাত-আদর্শের অনুসরণ হতে উদাসীন। তারা তা নিজেদের জীবনে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে না।

অতএব, সে সমস্ত লোককে তাঁর সীরাতের নিকটতম করার ও তাদের জীবনের ক্ষেত্রসমূহে তা ধারণ করবে এ আশায় অতি সহজ ও সরলভাবে কয়েক পৃষ্ঠায় তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করছি; যা তাঁর সকল দিকগুলোর জন্য অবশ্যই যথেষ্ট নয়; বরং তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ, বৈশিষ্ট্য ও জীবন-চরিতের এক ঝলক বা কিছু ধারণা মাত্র। মানুষের জীবনে অতি জরুরী এমনই কিছু অতি সংক্ষেপে তুলে ধরেছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনাদর্শ একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ। আর তিনি হলেন যাবতীয় সৎকর্ম, ইবাদত, উত্তম চরিত্র, লেন-দেন, আচার-আচরণের শ্রেষ্ঠতম অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।" (সূরা কালাম, আয়াত নং : ৪)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঐ মর্যাদা প্রদান করে থাকে, যে মর্যাদা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রদান করেছেন।

এ ভিত্তিতে তাদের বিশ্বাস হল, তিনি আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল ও অন্তরঙ্গ অকৃত্রিম বন্ধু। তারা তাঁকে তাদের সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এমনকি নিজেদের জীবনের চেয়েও বেশী ভালবাসে। তাঁর ব্যাপারে তারা কোন প্রকার বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করে না। বরং আল্লাহ প্রদত্ত মান-মর্যাদাই তাঁর জন্য যথেষ্ট মনে করে।

আর আমরাও এ বিশ্বাসই পোষণ করে থাকি। সুতরাং আমরা তাঁকে অনুরূপই ভালবাসি যেভাবে নির্দেশ রয়েছে এবং তাঁর সে ভাবে অনুসরণ করি যা নির্দেশ রয়েছে এবং যে সব কিছুর তিনি সংবাদ দিয়েছেন বিশ্বাস করি এবং যে বিষয়ে তিনি নিষেধ ও সতর্ক করেছেন তা হতে বেঁচে থাকি।

যদিও প্রিয় রাসূল ﷺ-এর সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমরা হারিয়েছি, আমাদের ও তাঁর মধ্যে বহুদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে.. । তা সত্ত্বেও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, আমরা যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হই, যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ

“আমি চাই আমরা যেন আমাদের ভাইদেরকে দেখতে পাই। সাহাবীরা বলেন: আমরা কি আপনার ভাই নই, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বলেন: তোমরা তো আমার সাহাবী, আর যারা এখনও আগমন করেনি তারা হল আমাদের ভাই। অত:পর সাহাবীরা বললেন: আপনার উম্মতের মধ্যে যারা এখনও আগমন করেননি তাদেরকে আপনি কিভাবে চিনতে পারবেন হে রাসূল ﷺ? তিনি বলেন: তোমরা কি মনে কর! যদি কোন ব্যক্তির নিছক কাল মিশমিশে ঘোড়াসমূহের মধ্যে উজ্জ্বল শুভ্র রং বিশিষ্ট ঘোড়া থাকে তবে কি সে তার উক্ত ঘোড়া চিনতে পারবে না? তারা বললেন: জী হ্যাঁ, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ। অত:পর তিনি বললেন: সুতরাং তারা [আমার উম্মত] ওজুর উজ্জ্বল শুভ্র আলামত নিয়ে [কিয়ামতের দিন] উপস্থিত হবে, আর আমি তাদেরকে হাউজে কাউসারে অভ্যর্থনা জানাব।” (সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৪৯/৩৯)

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, তিনি আমদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তাঁর সীরাত আঁকড়ে ধরেছে ও তাঁর সুন্নাতের ঝর্ণাধারায় তৃপ্ত হয়েছেন। অনুরূপ আল্লাহর নিকট আরও দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর সাথে জান্নাতে একত্রিত করেন এবং তাঁকে যেন তাঁর খিদমতের পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রদান করেন।

বিনয়াবনত

মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায়-১

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পারিবারিক জীবন

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র বংশ পরিক্রমা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নসব হল, আবুল কাসেম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আব্দে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কাআব ইবনে লুআই ইবনে গালিব ইবনে ফিহর ইবনে মালিক ইবনে নাযার ইবনে কিনানাহ ইবনে খুযাইমা ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলয়াস ইবনে মুযার ইবনে নাদযার ইবনে মাআদ্দ ইবনে আদনান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ বংশ পরিক্রমা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত। আদনান ইসমাঈল আ. এর সন্তান এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামসমূহ

আল্লাহ তায়ালার সত্তাবাচক নাম যেমন "আল্লাহ" তেমনি মহানবীর সত্তাবাচক নাম হলো "মুহাম্মাদ" ﷺ। আল্লাহ তায়ালা নবী ﷺ-এর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের মাধ্যমে নবী ﷺ-এর নামকরণ করেছেন।

নবী করীম ﷺ-এর পূর্বে কোনো নবীর নাম মুহাম্মাদ রাখা হয় নাই, এটা তার নবুওয়তের অন্যতম নিদর্শন। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই প্রিয় বীর নামকরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, যেন অন্য কারো সাথে তাঁর প্রিয়নবীর নাম মিলে না যায়।

প্রিয়নবী ﷺ-এর আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে আসলে তৎকালীন আহলে কিতাবগণকে আখেরী জামানার নবীর নাম জানিয়ে দেয়া হলো। আরব গোত্রের মধ্যে সকলেই কামনা করতো তাদের গোত্রে আখেরী নবীর জন্ম হোক। এই জন্য আরব গোত্রের লোকজন তাদের সন্তানদের নাম মুহাম্মাদ রাখার চেষ্টা করতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বে মাত্র ৪ জন এমন ব্যক্তি পাওয়া যায় যাদের পরিবার তাদের নাম রেখেছিল মুহাম্মাদ কিন্তু আল্লাহর কৃপায় তাদের কেউ নবী দাবি করেনি, কেননা আল্লাহ জানেন তার নবীকে তিনি কোথায় কোন গোত্রে কোন বংশে পাঠাবেন। রাসূলে কারীম ﷺ-ইরশাদ করেছেন, কুরআনে কারীমে আমার নামের সংখ্যা (৭ সাত) মুহাম্মাদ, আহমদ, ত্বহা, ইয়াসীন, আল

মুদ্দাসসির এবং আল মুজ্জাম্মিল। এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে। মাদারিজুন নবুওয়াত গ্রন্থে ৪০০ (চার শত) নাম উল্লেখ আছে।[১] আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

"আমার পরে যিনি নবী আসবেন তার নাম হবে আহমাদ।"[২]

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

"মুহাম্মাদ তো কেবল একজন রাসূল বৈ কিছু নয়, তাঁর পূর্বে অনেক রাসূলকে পাঠানো হয়েছে।" সূরা আলে-ইমরান, আয়াত নং ১৪৪

জুবাইর ইবনে মুতইম থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ لِي أَسْمَاءَ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الماحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ.

আমার অনেকগুলো নাম রয়েছে : আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমদ, আমি মাহী আমার দ্বারা আল্লাহ তাআলা কুফরকে মুছে দেবেন। আমি হাশির (একত্রিত কারী) আমার পায়ের নিকট মানুষদেরকে একত্রিত করা হবে। আমিই আকিব সর্বশেষ আগমনকারী যার পর আর কেউ আসবে না। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৪৮৯৬)

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَه أَسْمَاءً فَقَالَ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالمُقَفِّي وَالْحاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ. وَنَبِيّ الرَّحْمَةِ.

আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে তার অনেকগুলো নাম উল্লেখ করে বলতেন: আমি মুহাম্মাদ, আহমদ, আল-মুকাফাফ, আল হাশির, আমি তাওবার নবী, আমি রহমতের নবী। (সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৩৫৫/১২৬)

---

[১] মাদারিজুন নবুওয়াত, ২য় খণ্ড পৃ ১৯।

[২] সূরা ছফ আয়াত-৬

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বংশ তালিকা
হযরত ইব্রাহিম (আ)
হযরত ইসমাঈল (আ)
আদনান
মা'আজ
ফিহর (কুরাইশ)
কা'ব
মুররা
কুসাই
আবদুদদার
আবদুল মান্নাফ
আবদুস শামস্
মুত্তালিব
হাশিম
উমাইয়া
আবদুল মুত্তালিব
হারাব
আবদুল্লাহ
আল হারিস
আবু লাহাব
আব্বাস
হামযা
আবু সুফিয়ান
হযরত মুহাম্মাদ
আবু তালিব
আবদুল্লাহ
মু'আবিয়া এবং পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণ
কন্যা ফাতিমা
আলী
আলী
মুহাম্মাদ
ইব্রাহিম
আবুল আব্বাস আস্সাফ্ফাহ্
আবু জাফর আলমনসুর এবং পরবর্তী আব্বাসীয় খলিফাগণ
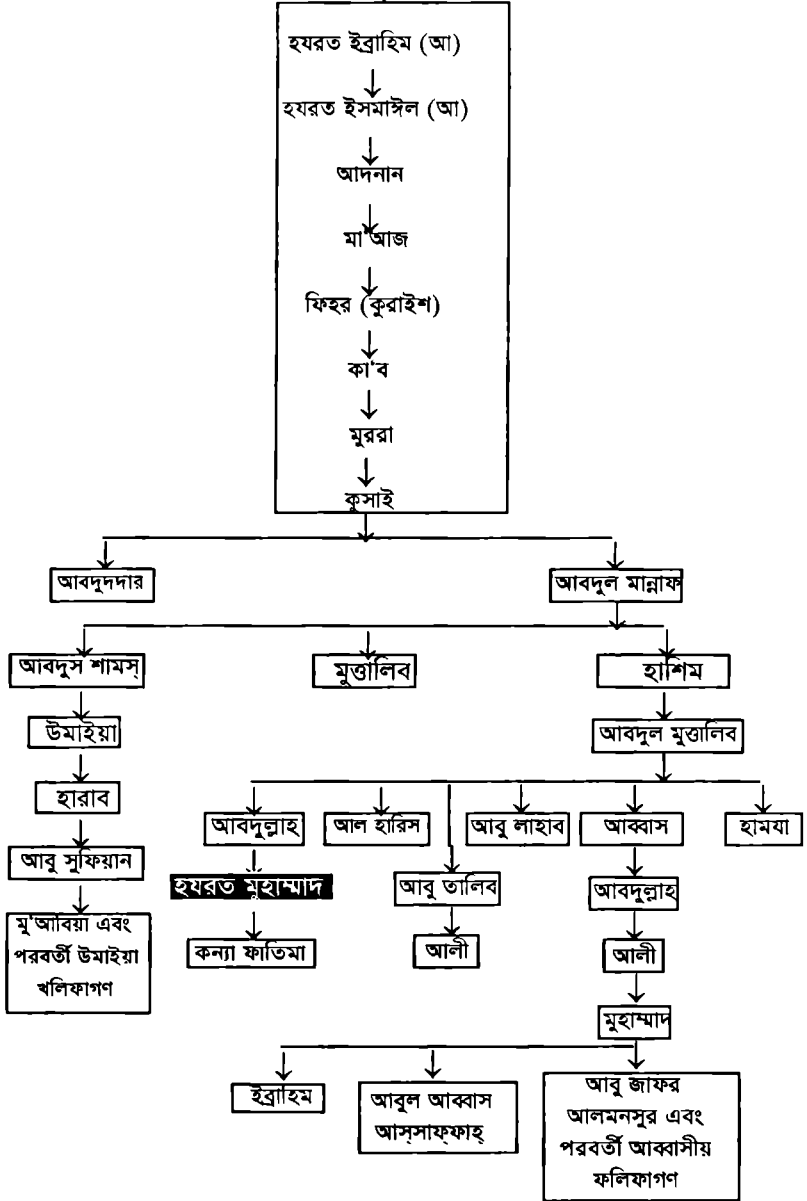
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মধারার পবিত্রতা

মহানবী ﷺ গোত্রীয়ভাবে বনী হাশেম এর অন্তর্ভুক্ত ও কোরাইশ বংশ-ধারার। তিনি আরবদের মধ্যে সর্বোত্তম বংশ পরিক্রমার অধিকারী। মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছেন যা আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম জায়গা।

আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে হিরাকলিয়াসের প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উচ্চ বংশ মর্যাদা স্বীকার করে বলেছিলেন, তিনি আমাদের মধ্যে উঁচু বংশের অধিকারী। উত্তরে হিরাকলিয়াস বলেছিলেন, রাসূলগণ এরকমই হন। তাঁরা তাদের জাতির উঁচু বংশধারায় জন্মগ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

আল্লাহ তাআলা ইবরাহীমের সন্তানদের মধ্যে ইসমাঈলকে মনোনীত করেছেন। আর বনী ইসমাঈলের মধ্যে কেনানাকে বেছে নিয়েছেন, বনী কেনানা থেকে কুরাইশদের বেছে নিয়েছেন। আর কোরেশদের থেকে বনী হাশেমকে। আর বনী হাশেমের মধ্যে হতে আমাকে নির্বাচিত করেছেন।[৩]

তিনি যে পবিত্র বংশের, তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর মাতা-পিতাকে যিনা-ব্যভিচার কর্মে জড়িত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি বৈধ ও শুদ্ধভাবে সম্পাদিত বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ দম্পতির ঔরসজাত সন্তান। তিনি বলেন : আমি বিবাহ থেকে বের হয়েছি, যিনা থেকে বের হইনি। আদম থেকে নিয়ে আমার পিতা-মাতা আমাকে জন্মদান পর্যন্ত কোন পর্যায়েই জাহেলী যুগের যিনা ও অশ্লীলতা আমাকে স্পর্শ করেনি।[৪]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: আমি আদম থেকে (নিয়ে শেষ পর্যন্ত), যিনা নয়, বিবাহ থেকে বের হয়েছি।

ইবনে সাদ ও ইবনে আসাকের (র) কালবী রা. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাঁচ শত মাতার নাম লিপিবদ্ধ করেছি, এঁদের

---

[৩] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৩৭৬/১

[৪] তাবরানী: আল আওসাত, আলবানী রহ. এ হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।

মধ্যে কাউকেই আমি যিনাকারিনী পাইনি। জাহেলী যুগের কোন জিনিসও তাদের কারো কাছে পাইনি। পাঁচ শত মা এর অর্থ মা ও বাবা উভয় পক্ষের দাদী, পরদাদী... ইত্যাদি।

কোন এক কবি বলেন :

مِنْ عَهْدِ آدَمَ لَمْ يَزَلْ تَحْمِي لَهُ   فِي نَسْلِهَا الْأَصْلَابُ وَالْأَرْحَامُ.

حَتَّى تَنَقَّلَ فِي نِكَاحٍ طَاهِرٍ   مَا ضَمَّ مُجْتَمِعَيْنِ فِيهِ حَرَامُ.

فَبَدَا كَبَدْرِ التمِّ لَيْلَةَ وَضْعِهِ   مَا شَانَ مَطْلَعَهُ الْمنِيرَ قَتَامُ.

فَانْجَابَتِ الظَّلْمَاءُ مِنْ أَنْوَارِهِ   وَالنُّورُ لَا يَبْقَى عَلَيْهِ ظَلَامُ.

شُكْرًا الْمُهْدِيهِ إِلَيْنَا نِعْمَةً   لَيْسَتْ تُحِيطُ بِكُنْهِهَا الْأَوْهَامُ.

আদম থেকে মায়ের গর্ভ ও বাপের পৃষ্ঠ বংশপরম্পরা তাকে হিফাযত করে এসেছে।

অবশেষে পবিত্র বিবাহের মাধ্যমে আবর্তিত হলেন। তাঁর ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর সাথে হারাম কিছু যুক্ত হয়নি।

প্রসবের রাত তিনি পূর্ণিমার চাঁদের মত প্রকাশ পেলেন। তাঁর আলোকময় উদয়কে অন্ধকার আচ্ছন্ন করতে পারেনি।

ফলে তাঁর আলোকে অপসারিত হল অন্ধকার। কারণ, আলোর ওপর অন্ধকার বিদ্যমান থাকে না।

আমরা শুকরিয়া আদায় করছি সে দাতার, যিনি আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন এমন এক নিয়ামত, যার মর্ম মানুষের কল্পনা নাগাল পায় না।

মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে পূর্ববতী নবী-রাসূলদের সুসংবাদ ও অঙ্গীকার প্রদান পবিত্র কুরআনে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"আর আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা যা দান করলাম তারপর যখন একজন রাসূল আগমন করবেন, যিনি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান কিতাবের সত্যতা স্বীকার করবেন, তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার সাহায্যকারী হবে। বললেনঃ তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ দায়িত্বের বোঝা গ্রহণ করলে? তারা বলেছিলঃ আমরা স্বীকার করলাম, তিনি বললেনঃ তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত রইলাম। অত:পর যে লোক এ ওয়াদা থেকে ফিরে দাঁড়াবে, তারাই হলো দুষ্কার্যকারী।"[৫]

আলী বিন আবু তালেব এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাঁচাত ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করছেন, আল্লাহ তাআলা যে নবীকেই পাঠিয়েছেন তাঁর কাছ থেকেই এ-মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তিনি জীবিত থাকাবস্থায় যদি মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রেরণ করেন তাহলে তিনি তাঁর ওপর ঈমান আনবেন ও তাঁকে সাহায্য করবেন। সাথে সাথে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে তিনি যেন স্বীয় উম্মতের কাছ থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, তারা জীবিত থাকাবস্থায় যদি মুহাম্মাদ ﷺ প্রেরিত হন তাহলে তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে।

সুদ্দী থেকেও এ মর্মে অনুরূপ একটি বর্ণনা এসেছে।

আল্লাহ তাআলা নবী ইবরাহীম আ. এর ভাষ্য উল্লেখ করে বলেনঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"হে আমাদের রব! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করুন যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শোনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন, নিশ্চয় আপনি মহা-শক্তিমান, প্রজ্ঞাময়।"[৬]

আল্লামা ইবনে কাছীর (রহ.) বলেন,

আল্লাহ তাআলা, নবী ইবরাহীম আ. কর্তৃক পবিত্র নগরীর অধিবাসীদের জন্য পরিপূর্ণ দুআর সাকুল্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, আল্লাহ যেন তাদের

---

[৫] সূরা আলে ইমরানঃ৮১-৮২

[৬] সূরা বাকারা, আয়াত নং : ১২৯

মাঝে তাদেরই মধ্য হতে অর্থাৎ ইবরাহীমের বংশধর হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেন। আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ ﷺ-কে, সকল জিন-ইনসানের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরণের মাধ্যমে তাঁর এ দুআ কবুল করেন।

ইমাম আহমদ রহ. সাহাবী ইরবায বিন সারিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

إِنِّي عِنْدَ اللهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ: دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبُشْرَى عِيسَى بِي، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ يَرَيْنَ.

"আমি আল্লাহ তাআলার নিকট শেষ নবী (হিসেবে নির্বাচিত) আর আদম তখন কাদা-মাটিতে ঘুরপাক খাচ্ছেন। আমি তোমাদেরকে এর প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে বলছি: আমার পিতা ইবরাহীমের দুআ, আমার সম্পর্কে নবী ঈসার সুসংবাদ এবং আমার মাতার দেখা স্বপ্ন, নবী জননীগণ এমনি করেই স্বপ্ন দেখে থাকেন।"[৭]

মানুষের মাঝে ধারাবাহিকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আলোচনা চলে আসছিল। এক পর্যায়ে এসে বংশীয়ভাবে বনী ইসরাঈলের শেষ নবী ঈসা আলাইহিস সালাম সর্বশেষ নবীর নাম সরাসরি উল্লেখ করলেন। তিনি বনী ইসরাঈলের উদ্দেশ্যে এক বয়ানে বলেছেন।

إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ.

"আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, পূর্বে নাযিলকৃত তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং এমন একজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন। তার নাম হবে আহমাদ।"[৮]

এজন্যেই মহানবী ﷺ এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন আমি আমার পিতা ইবরাহীমের দুআ এবং নবী ঈসা বিন মারইয়ামের সুসংবাদ।

---

[৭] মুসনাদে বায্যার, হাদীস নং : ৪১৯৯

[৮] সূরা সফ, আয়াত নং : ৬

পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে মর্যাদা ও মাহাত্ম্য আলোচিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াত তার প্রমাণ বহন করে।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"যারা অনুসরণ করে নিরক্ষর নবীর, যাঁর বর্ণনা তারা নিজেদের কাছে থাকা তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎ কর্ম থেকে, তাদের জন্যে যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের ওপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দিত্ব অপসারণ করেন যা তাদের ওপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর ওপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।"[৯]

عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللهِ فِي التَّوْرَاةِ.قَالَ: أَجَلْ وَاللهِ، إِنَّه لمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِصِفَتِهِ فِي القُرْآنِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا للأُمِّيِّينَ, أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي, سَمَّيْتُكَ المتَوَكِّلَ, لَيْسَ بِفَظٍّ, وَلَا غَلِيظٍ, وَلَا صَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ, وَلَا يُجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِئةَ,

---

[৯] সূরা আরাফ, আয়াত নং : ১৫৭

وَلَكِنْ يَعفُو وَيغْفِر، ولَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ المِلَّةَ العَوْجَاءَ؛ بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ, فَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيناً عُمْيًا, وَآذَانًا صُمًّا, وَقُلُوبًا غُلْفًا.

"আতা বিন ইয়াসার বলেন: আমি আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে দেখা করে বললাম, তাওরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়ে যে বিবরণ এসেছে সে সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ তাওরাতে তাঁর বর্ণনা ঠিক একইরূপে বিবৃত হয়েছে যেভাবে হয়েছে কুরআনে: (হে নবী আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।) এবং উম্মী-নিরক্ষরদের আশ্রয়স্থল, আপনি আমার বান্দা ও রাসূল, আপনাকে আমি মুতাওয়াক্কিল (ভরসাকারী) নামে আখ্যায়িত করেছি। তিনি কঠোর হৃদয় নন এবং নির্দয় স্বভাব ও বাজার-ইত্যাদিতে হৈ চৈ কারীও নন, তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দ দিয়ে নেন না, বরং মন্দের মুকাবিলায় উপহার দেন ক্ষমা ও মার্জনা। বক্র ও গোঁয়ার জাতিকে শিষ্ট ও ভদ্র জাতিতে পরিবর্তিত করা অবধি আল্লাহ তাঁকে পৃথিবী থেকে তুলে নেবেন না অর্থাৎ তারা আল্লাহ তাআলাকে একমাত্র উপাস্য স্বীকার করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত তাঁর ইন্তেকাল হবে না। তিনি তাঁর মাধ্যমে অন্ধ চক্ষু, বধির কান এবং বন্ধ হৃদয়সমূহকে খুলে দেবেন।[১০]

ইমাম বায়হাক্বী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, জারূদ ইবনে আব্দুল্লাহ (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট) এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর বললেন, যিনি আপনাকে দ্বীনে হকসহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ : আমি আপনার বিবরণ ইঞ্জিলে পেয়েছি এবং আপনার সম্পর্কে ইবনুল বতূল -ঈসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম সুসংবাদ দিয়েছেন।

عَنْ أَبِي مُوسى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّجَاشِيُّ: أَشْهدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ اللهِ, وَأَنَّه الَّذِي بَشَّر بِهِ عِيسى، وَلوْلَا مَا أَنَا فِيه مِنْ أَمْرِ الـمُلْكِ، وَمَا تَحمَّلتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ، لَأَتَيْتُه حَتَّى أَحْمِلَ نَعْلَيْه.

"আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নাজ্জাশী বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। তিনিই সে ব্যক্তি যার সম্পর্কে নবী

---

[১০] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ২১২৫

ঈসা সুসংবাদ দান করেছিলেন। আমাকে যদি জনসাধারণ ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতে না হতো তাহলে তাঁর জুতা উঠানোর জন্যে আমি তাঁর দরবারে চলে যেতাম।"[১১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম

নবী আকরাম ﷺ রবিউল আউয়াল মাসে সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেন। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ মোটামুটি একমত। তবে তা কোন তারিখ, এ বিষয়ে তাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছেন আট তারিখ। আবার কারো কারো মতে, বার তারিখ। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে ৯ তারিখ।

আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. বলেন, বিশুদ্ধ মত হচ্ছে তিনি হাতির ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বছর জন্মগ্রহণ করেছেন। ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইবরাহীম ইবনুল মুনযির ও খলীফা বিন খাইয়াত প্রমুখ এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের ইজমা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

বিজ্ঞ ঐতিহাসিকবৃন্দ বলেছেন, নবী মাতা আমেনা তাঁকে গর্ভে ধারণ প্রসঙ্গে বলেন, তার কারণে আমি কোন ভার অনুভব করিনি। যখন ভূমিষ্ঠ হল তার সাথে একটি নূর (আলো বিশেষ) বের হয়ে আসল আর প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য সব আলোকিত হয়ে গেল।

ইবনে আসাকির ও আবু নুআইম সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন, নবী আকরাম ﷺ জন্মগ্রহণ করে ধরা পৃষ্ঠে আগমন করার পর দাদা আব্দুল মোত্তালিব একটি মেষ জবাই করে আকীকা দিলেন এবং তাঁর নাম রাখলেন, মুহাম্মাদ। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আবুল হারেছ! বাপ-দাদাদের রীতি ভঙ্গ করে তার নাম মুহাম্মাদ রাখার হেতু কি? কি কারণে এ বিষয়ে আপনি উৎসাহী হলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমার আশা, আল্লাহ যেন আকাশে তার প্রশংসা করেন এবং পৃথিবীতে মানুষের নিকটও যেন সে সমধিক প্রশংসার পাত্র হয়, সকলেই যেন তার প্রশংসা করে।

পিতার ইন্তেকাল

মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায়ই তাঁর পিতা পৃথিবী ত্যাগ করেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর আগমনের কয়েক মাস পরে ইন্তেকাল করেছেন। প্রথম মতটিই প্রসিদ্ধ।

---

[১১] সুনানে আবি দাউদ, হাদীস নং : ৩২০৫

দুগ্ধ পান

জন্মের পর তার মা তাকে দুধ পান করান। অতঃপর আবু লাহাবের বাঁদি ছুয়াইবীয়াহ্ কিছুদিন তাঁকে দুগ্ধ পান করান। শিশু মুহাম্মাদকে উপলক্ষ্য করে আবু লাহাব খুশিতে নিজ বাঁদি ছুয়াইবীয়াহকে মুক্ত করে দেয়। অতঃপর বনী সাআদ গোত্র থেকে ধাত্রীর ব্যবস্থা করা হয়। হালীমা সাদিয়া নাম্নী জনৈকা পুণ্যবতী নারী তাঁকে দুধ পান করানোর সৌভাগ্য অর্জন করেন। বনী সাআদ গোত্রে হালীমা সাদিয়ার নিকট তিনি প্রায় পাঁচ বছর অবস্থান করেন। সেখানেই তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ-কর্ম সংঘটিত হয়। ফেরেশতারা তাঁর পবিত্র অন্ত:করণ বের করে ধৌত করেন এবং তাঁর প্রবৃত্তিতে শয়তানের নির্ধারিত হিস্সা বের করে নিয়ে আসেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিশেষ নূর, প্রজ্ঞা, অনুকম্পা ও রহমত দ্বারা পূর্ণ করে দেন। এরপর ফেরেশতারা তাঁকে স্বস্থানে রেখে আসেন।

এ ঘটনা সংঘটিত হবার পর হালীমা তাঁর ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাই তাঁকে মা আমেনার কাছে ফেরত দিয়ে আসেন এবং ঘটনার পূর্ণ বিবরণ তাকে শুনান। ঘটনা শুনে মা আমেনা শঙ্কিত হননি।

আল্লামা সুহাইলী বলেন, এ পবিত্রকরণ কর্মটি মোট দুবার সংঘটিত হয়েছে।

প্রথমবার: শিশু বয়সে, যাতে তাঁর অন্তরাত্মা শয়তানের দোষ থেকে পবিত্র হয়ে যায়।

দ্বিতীয়বার: মিরাজের সময়, এ সময় তাঁকে অন্দর ও বাহির উভয় দিক থেকে পবিত্র করা হয় এবং তাঁর হৃদয় ঈমান ও হিকমত দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়।

চিত্র : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতা ও মাতার ওফাতের স্থান

মাতৃ বিয়োগ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছয় বছর বয়সে উপনীত হলে মাতা আমেনা তাঁকে নিয়ে মদীনা মুনওয়ারায় তার স্বামীর কবর যিয়ারতে গেলেন। তাদের সাথে উম্মে আইমানও ছিলেন। সেখানে তিনি একমাস অবস্থান করেন। অতঃপর মক্কায় ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মক্কা বিজয় অভিযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবওয়া অতিক্রম করার সময় আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর মাতার কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রার্থনা করলে আল্লাহ অনুমতি প্রদান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ নিজে খুব কেঁদেছেন, সাথে থাকা সাথীদেরকেও কাঁদিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন:

فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

"তোমরা কবর যিয়ারত কর, কারণ এটি মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"[১২]

মাতৃ বিয়োগের পর বাবা থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে-প্রাপ্ত বাঁদি উম্মে আইমান তাঁকে কোলে তুলে নেন। আর দাদা আব্দুল মুত্তালিব লালন-পালনের দায়িত্বভার

---

[১২] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ৯৭৬/১০৮

গ্রহণ করেন। বয়স আট বছর হলে দাদাও পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তবে চাচা আবু তালিবকে তাঁর ব্যাপারে অসিয়ত করে যান। আবু তালিব দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পরিপূর্ণ দায়িত্বশীলতার সাথে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করে যান। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবী হিসেবে প্রেরণ করার পর যথাসম্ভব সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। জীবনবাজী রেখে তিনি রাসূলকে সহায়তা দিয়েছেন। তবে এতকিছুর পরও নিজে শিরকের বেড়াজাল ছিন্ন করে বের হয়ে আসতে পারেননি বরং শিরকের ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন। হ্যাঁ... ইসলাম ও মুসলমানদের সহায়তা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দায়িত্বশীল ভূমিকার কারণে আল্লাহ তাআলা তার শাস্তি বেশ শিথিল করবেন এবং জাহান্নামের সবচেয়ে সহজ শাস্তি দিবেন। এ প্রসঙ্গে বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

জাহেলী পঙ্কিলতা থেকে আল্লাহ তাআলার সংরক্ষণ

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে সেই শিশুকাল থেকেই বিশেষ যত্ন সহকারে তত্ত্বাবধান ও হেফাযত করেছেন এবং জাহেলী যুগের নানাবিধ পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র রেখেছেন। তাঁর মধ্যে প্রতিমা ইত্যাদির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। ফলে কখনই তিনি মূর্তিপূজা করেননি। প্রতিমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেননি। কোন প্রকার শরাব পান করেননি। কুরাইশ যুবকদের সাথে মিশে কোন অন্যায় ও পাপ-কর্মে জড়িত হননি। বরং সর্ব প্রকার দোষ ও গুনাহর কাজ থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। যাবতীয় সুন্দর গুণাবলী ও অভিজাত কর্মাবলি তাঁর প্রকৃতিতে প্রথিত করে দেয়া হয়েছিল। বরং তাঁর এ উন্নত আখলাক, সততা, চরিত্র মাধুরী ও মনোহারী ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে লোকেরা তাঁর নাম দিয়েছিল আল-আমীন। আর এ নামেই তিনি ছিলেন সকলের নিকট সমধিক পরিচিত। তাঁর বিচার-ফয়সালা সকলেই বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিত, তাঁর মতামত সমর্থন করে নিজেদের দাবি-দাওয়া থেকে সরে আসত। হাজরে আসওয়াদ স্বস্থানে পূন:স্থাপনকে কেন্দ্র করে যে বিশৃঙ্খলার দানা বেধে উঠেছিল সে সময় তাঁর যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বিষয়টিকে সুরাহা করে দেয়। কাবা শরীফ পুনঃনির্মাণকালে হাজরে আসওয়াদ স্বস্থানে কে রাখবে এ নিয়ে তাদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। এক পর্যায়ে সংঘাতের আশঙ্কা সৃষ্টি হয় এবং অশান্তির আগুন জ্বলে উঠার উপক্রম হয়, তখন সকলে তাঁকে এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্যে বিচারক নির্বাচন করে। তিনি যে সিদ্ধান্ত দেবেন সকলে মেনে নেবে বলে একমত হয়। উক্ত সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি একটি বড় চাদর বিছিয়ে হাজরে আসওয়াদ তাতে রেখে দিলেন এবং প্রত্যেক গোত্রের লোকদের চাদরের

চারিদিক থেকে ধরতে বললেন। এরপর পাথরটি নিজ হাতে নির্ধারিত জায়গায় স্থাপন করে দিলেন। তাঁর এ অভিনব সিদ্ধান্ত দেখে সকলে বিস্ময়াভিভূত হল এবং সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিল এবং একটি বিরাট সংঘর্ষ থেকে সকলে নিষ্কৃতি পেল।

গৃহ অভ্যন্তর

আমাদেরকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছে, এখন আমরা মুসলিম উম্মাহর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাড়ীর ভিতর অবস্থান নিয়েছি, ভাল করে সব কিছু অবলোকন করার জন্য।

এখন আমাদের সামনে সাহাবায়ে কিরাম তাঁর বাড়ীর বিছানা, আসবাব পত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র সম্পর্কে অবহিত করবেন।

আমরা সাধারণত জানি যে, কারো ঘর ও কক্ষের দিকে তাকানো বাঞ্ছনীয় নয়, তবে আদর্শ শিক্ষার জন্য এ সম্মানিত ঘরের কিছু আমরা অবলোকন করব। এ ঘর যার ভিত্তি তো বিনয় এবং মূলধন হল ঈমান, আপনি কি দেখছেন না যে, এ ঘরের দেয়ালে কোন প্রকার জীবের ছবি নেই, যা আজকের দিনে অনেক লোক ঝুলিয়ে রাখে।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন:

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

"যে বাড়ীতে কোন প্রকার জীবের ছবি ও কুকুর থাকে সে বাড়ীতে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।"[১৩]

এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কিছু বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন:

أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَدَحَ خَشَبٍ غَلِيظٍ مُضَبَّبٍ بِحَدِيدٍ، فَقَالَ: يَا ثَابِتُ، هَذَا قَدَحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"একদা আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের সামনে লোহার পাত দিয়ে বাঁধাই করা কাঠের তৈরি এক পাত্র নিয়ে উপস্থিত হয়ে বললেন: হে

---

[১৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৩২২৬

সাবেত! এ হল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যবহৃত পাত্র। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ পাত্রে পানি, খেজুর সরবত, মধু ও দুধ পান করতেন।"[১৪]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا

"রাসূলুল্লাহ ﷺ পান করার সময় পাত্রের বাইরে তিনবার শ্বাস ফেলতেন"।[১৫]
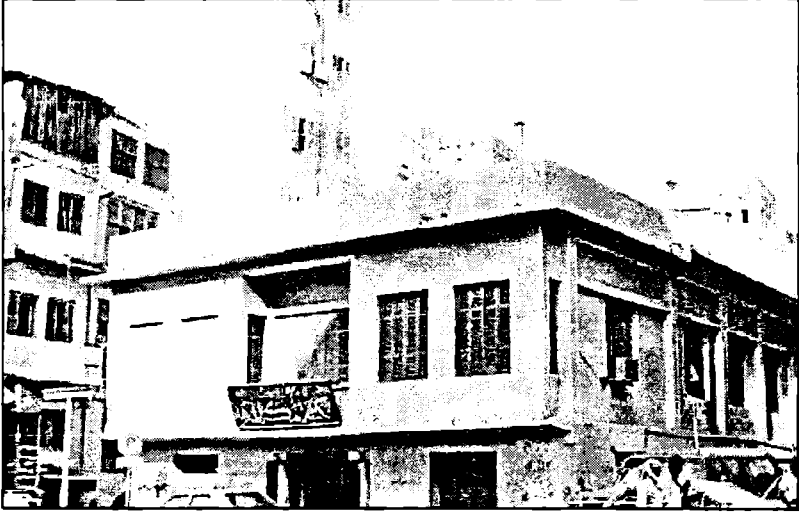
চিত্র : যেখানে রাসূল সা. জন্মেছিলেন

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ

"রাসূল ﷺ পান করার সময় পাত্রের ভেতর শ্বাস ফেলতে ও ফুঁ দিতে নিষেধ করেন।"[১৬]

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যে লৌহ-বর্মটি জিহাদের ময়দানে, যুদ্ধাভিযান ও অন্যান্য কঠিন মূহুর্তে ব্যবহার করতেন তা হয়তো বর্তমানে তার ঘরে নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন 'সা' জবের বিনিময় এক ইয়াহুদীর নিকট সেটি বন্ধক

---

[১৪] শরহে সুন্নাহ, হাদীস নং : ৩০৩৩

[১৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২০২৮/১২৩

[১৬] সুনানে আবি দাউদ, হাদীস নং : ৩৭২৮

রেখেছিলেন। যেমন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তার লৌহ-বর্মটি ইয়াহুদীর নিকট বন্দক ছিল।

উজ্জ্বল দৃষ্টি ও উদার হৃদয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ হাদিসটি অনুধাবন করুন। তিনি বলেন,

طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الإِسْلَامِ. وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ

"সৌভাগ্য তো ইসলামের পথে হিদায়েত প্রাপ্তদের জন্য, এ অবস্থায় তার জীবনোপকরণও যথেষ্ট ও তুষ্টিপূর্ণ।"[১৭]

আরও একটি মহান হাদিসের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, যাতে তিনি বলেন:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ امِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

"যে ব্যক্তি স্বীয় গোত্রে নিরাপদে বসবাস করেছে, শারীরিকভাবেও সে সুস্থ এবং তার নিকট রয়েছে সে দিনটির পরিপূর্ণ খাবার, তাহলে লোকটি এমন যেন, সারা দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও তার মুঠোই রয়েছে।"[১৮]

আত্মীয়-স্বজন

নবী ﷺ আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিলেন। এমন কি মক্কার কাফের কুরাইশরা পর্যন্ত তাঁর প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং নবুয়তের পূর্বে তাঁকে মহা সত্যবাদী ও আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছিল। আর তাঁর স্ত্রী খাদীজা তাকে এ কথাগুলো বলে প্রবোধ দেন যে,

إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ. وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ

"আপনি তো আত্মীয়তা অটুট রাখেন ও সর্বদায় সত্য কথা বলেন...।"[১৯]

এতো সেই ব্যক্তি যিনি শ্রেষ্ঠ অধিকার ও সর্ব বৃহৎ দায়িত্বসমূহ পালন করেন.. রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাত বছর বয়সে ইন্তেকাল করা মাতার কবর যিয়ারত করেন।

---

[১৭] তিরমিযী, হাদীস নং : ২৩৪৯

[১৮] তিরমিযী, হাদীস নং : ২৩৪৬

[১৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৪৯৫৩

আবু হুরাইরা " বলেন:

زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

"নবী করীম ﷺ তাঁর মাতার কবর যিয়ারতকালে কান্না করেন ও তার কান্নায় উপস্থিত সকলেই কাঁদেন। এরপর তিনি বলেন: "আমি স্বীয় প্রভুর নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চেয়েছিলাম কিন্তু তিনি অনুমতি দেননি, পরে আমি তাঁর সমীপে তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দেন। অতএব, হে আমার উম্মত! তোমরা কবর যিয়ারত করো, কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"[২০]

লক্ষ্য করুন: রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক স্বীয় আত্মীয় স্বজনদের প্রতি ভালবাসা ও সৎ পথের দাওয়াত দেয়ার আগ্রহ ও তাদের হিদায়েত প্রাপ্তি ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল কত প্রবল। আর এ পথে তিনি কত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরা " হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ، فَقَالَ: «يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّةَ بنِ كَعْبٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ، أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا

---

[২০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৯৭৬/১০৮

"যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো: "وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ" অর্থাৎ "আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করুন।"[সূরা শুয়ারা: ২১৪] তখন রাসূল ﷺ কুরাইশদের সকল স্তরের লোকদেরকে আহ্বান করে একত্রিত করে বলেন: "হে বনী আবদে শামস, হে বনী কা'ব বিন লুয়াই! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। হে বনী আবদে মানাফ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। হে বনী আব্দুল মুত্তালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো। হে ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো। কেননা, কিয়ামত দিবসে আমি আল্লাহর কাছে তোমাদের কোনো উপকার করতে পারব না। তবে আমি এ ধরাতে তোমাদের সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক ঠিক রাখবো।"[২১]

তিনি সেই প্রিয়নবী, যিনি তাঁর চাচা আবু তালিবকে দাওয়াত দিতে কোন বিরক্ত হননি ও কোন প্রকার ত্রুটি করেননি, বিভিন্ন পন্থায় তাকে একের পর এক দাওয়াত দিয়েছেন। এমনকি তিনি তার মৃত্যুর সময়ে তার নিকট এসেছেন:

لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ، دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ: «أَيْ عَمِّ، قُلْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ» فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَلَمْ يَزَالاَ يُكَلِّمَانِهِ، حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ: عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ» فَنَزَلَتْ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجَحِيمِ}. وَنَزَلَتْ: {إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}

"যখন আবু তালিব মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে উপনীত হন তখন তার নিকট রাসূল ﷺ প্রবেশ করেন, সে মুহূর্তে তার নিকট উপস্থিত ছিল আবু জাহল, আব্দুল্লাহ বিন আবি উমাইয়া। রাসূল ﷺ বলেন: হে আমার চাচা! আপনি "লা ইলাহা

[২১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৩৪৮/২০৪

ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মাবূদ নেই' কালিমাটি পাঠ করুন, যাতে করে কিয়ামত দিবসে আমি আল্লাহর কাছে প্রমাণ পেশ করে সুপারিশ করতে পারি। এ সময় আবু জাহল ও আব্দুল্লাহ বিন আবি উমাইয়া বলল: ওহে আবু তালেব! শেষ পর্যন্ত কি তুমি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মকে বিসর্জন দিতে যাচ্ছ? তারা বারবার এ কথাটি আবৃত্তি করতে লাগল, অবশেষে আবু তালিব সর্বশেষ যে কথাটি বলল, তা হলো "আমি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরেই।" অতঃপর নবী করীম ﷺ বলেন: "আমাকে যতক্ষণ পর্যন্ত নিষেধ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেই থাকব। পরে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ

"নবী ও অন্যান্য মু'মিনদের জন্য বৈধ নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যদিও তারা আত্মীয় হয়, একথা প্রকাশ হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামের অধিবাসী। (সূরা তাওবা, ৯ : ১১৩)

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

"হে নবী ﷺ আপনি যাকে চাইবেন তাকেই হিদায়েত করতে পারবেন না।" (সূরা কাসাস, ২৮ : ৫৬)"[২২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু তালিবের জীবদ্দশায় তাকে অনেক বার ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন এমনকি তার জীবনের শেষ মূহুর্তগুলোতেও। অত:পর তার মৃত্যুর পর নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার প্রতি সদ্ব্যবহার ও দয়া পরবশ হয়ে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। তারপর তিনি আল্লাহর নির্দেশ শ্রবণ ও অনুসরণের নিমিত্তে নিকটাত্মীয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হতে বিরত থাকেন। এ হল তাঁর উম্মতের প্রতি দয়ার চিত্রের মধ্য হতে কতিপয় মহৎ চিত্র। অত:পর পরিশেষে এ মহান দ্বীনে মিত্রতার ও কাফের-মুশরিকদের সাথে বৈরিতার চিত্রও প্রকাশিত হয়েছে যদিও তারা নিকটাত্মীয়ও হয়।

نَبِيٌّ أَتَانَا بَعْدَ يَأْسٍ وَفَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، وَالأَوْثَانُ فِي الأَرْضِ تَعْبُدُ
فَأَمْسَى سِرَاجاً مُسْتَنِيراً وَهَادِياً يَلُوحُ كَمَا لَاحَ الصَّقِيلُ الْمُهَنَّدُ

---

[২২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৩৮৮৪

وَأَنْذَرَنَا نَاراً، وَبَشَّرَ جَنَّةً وَعَلَّمَنَا الإِسْلاَمَ فَلِلَّهِ نَحْمَدُ

আরবি কবি বলেন:

নবী-রাসূলদের আগমনের সাময়িক ধারা বিচ্ছিন্নতা উপেক্ষা ও সকল নিরাশা ভেদ করে আমাদের নিকট আগমন করেন একজন নবী যখন বিশ্বজগতে চলত ব্যাপক মূর্তিপূজা।

অত:পর তিনি আলোকময় উজ্জ্বল প্রদীপ ও দিশারীতে পরিণত হন এবং তিনি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেন যেমন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সেই বিখ্যাত হিন্দুস্তানি চকচকে তরবারি।

তিনি আমাদেরকে জাহান্নাম হতে ভীতি প্রদর্শন করেন ও জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন এবং আমাদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা দেন। সুতরাং আমরা আল্লাহরই প্রশংসা করি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাসস্থান

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘর যেন প্রকৃতই সমস্ত আদর্শের প্রাণ কেন্দ্র। যেখান থেকে প্রকাশিত হয় উত্তম আদর্শ, পরিপূর্ণ আদব-শিষ্টাচার, মনোরম সমাজের স্বচ্ছ উপাদান। আর তা ছিল চার দেয়ালের অভ্যন্তর কক্ষে যা অন্যান্য মানুষের কেউ তা অবলোকন করেনি। তিনি তাঁর খাদেম ও স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ ও অতি বিনয়মূলক ব্যবহার করতেন। যার মধ্যে থাকত না কোন কৃত্রিমতা তিনি এ উম্মতের রাসূল, পথ নির্দেশক ও মহত্ত্ব-পূর্ণ মান-মর্যাদা ও শানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর বাসগৃহে কেমন ছিলেন কি তাঁর অবস্থা ছিল একটু চিন্তা করে দেখি আমরা!

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেসা করা হয়েছিল: রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে কি কি কাজ করতেন? তিনি উত্তর দেন:

كان بشرًا من البشر كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِي ثَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ

"তিনি তো [রক্ত, মাংস ও চামড়ার] একজন মানুষই ছিলেন, তিনি তাঁর কাপড় সেলাই করতেন, ছাগলের দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করতেন।"[২৩]

---

[২৩] তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং : ৫৮২২

তিনিই ছিলেন বিনয়ের মূর্ত প্রতীক যার ভিতর ছিল না কোন প্রকার অহংকার, যিনি কাউকে দিতেন না কষ্ট। তিনি ছিলেন প্রতিটি কাজে অংশ গ্রহণকারী মহান ব্যক্তিত্ব এবং সাহায্যকারীর অগ্রনায়ক। মানব জাতির সর্ব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হয়েও তিনি নিজে আঞ্জাম দিতেন। তিনি এ মুবারক ঘরে বাস করতেন যেখান থেকে এ হিদায়াতের আলোক বর্তিকা উদ্ভাসিত হয়ে ছড়িয়ে চতুর্দিকে পড়েছে, অথচ সে মহান ঘরে এমন খাবার পর্যন্ত জুটত না যা দিয়ে তাঁর পেট পূর্ণ হবে।

নুমান ইবনু বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থা বর্ণনা করত: বলেন:

لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ، مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ

"আমি তোমাদের নবী ﷺ-কে এমনও দেখেছি যে, তিনি নিম্নমানের খেজুরও পেতেন না যা দ্বারা তাঁর পেট পূর্ণ হবে।"[২৪]

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

إِنْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ، إِنْ هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ

"মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারে আমরা এক মাস ব্যাপী কোনো প্রকার চুলা জ্বালাতাম না, তবে আমরা শুধু খেজুর ও পানি দ্বারাই জীবন ধারণ করতাম।"[২৫]

এর পরেও নবী ﷺ আল্লাহর ইবাদাত ও তার অনুসরণ হতে কখনো বিরত হতেন না..। যখনই তিনি মসজিদ হতে আযান ধ্বনি শুনতে পেতেন সে আহ্বানের সাড়া দিয়ে, তখনই তিনি সর্ব প্রকার কাজ ছেড়ে মসজিদ পানে ছুটে যেতেন।

আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ বলেন:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ خَرَجَ

"আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেসা করলাম যে, নবী ﷺ বাড়ীতে কি কি ধরনের কাজ করতেন? উত্তরে তিনি বলেন: "তিনি তার পরিবারের সর্ব

---

[২৪] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৯৭৭/৩৪, তিরমিযী, হাদীস নং : ২৩৭২
[২৫] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৯৭২/২৬, তিরমিযী, হাদীস নং : ২৪৭১

প্রকার কাজে নিয়োজিত থাকতেন, তবে আযান শুনার সাথে, সাথেই বাড়ী হতে বের হয়ে যেতেন"।[২৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়ীতে ফরয সালাত আদায় করেছেন এমন কোন প্রমাণ নেই, তবে তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে যখন রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং মসজিদে যেতে অপারগ হয়েছিলেন তখন তিনি বাড়ীতে আদায় করেছেন।

উম্মতের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এত মেহেরবানী ও দয়া থাকার পরও যারা জামাতে উপস্থিত না হয়েছে তাদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন, তিনি বলেন:

وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ

"আমার ইচ্ছা হয় যে আমি কাউকে নামাযের ইমামতি করার আদেশ দেই আর আমি কাঠসহ কিছু লোককে সাথে নিয়ে ঐ সকল লোকদের বাড়ীতে যাই যারা জামাতের সাথে সালাত পড়ার জন্য উপস্থিত হয়নি। অত:পর তারাসহ তাদের বাড়ী-ঘরকে জ্বালিয়ে দেই।"[২৭]

এ সব তো জামাতের সাথে সালাত আদায়ের গুরুত্ব প্রমাণই বহন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

"শরয়ী ওযর ব্যতীত যে ব্যক্তি আযান শুনার পর জামাতের সাথে সালাত আদায় করল না, তার সালাত কবূল হবে না।"[২৮]

আর ওযর বলতে: শত্রুর ভয় অথবা রোগকে বুঝায়।

হায়রে কোথায় আজ নামাযীরা তারা তো মসজিদ ছেড়ে দিয়ে পার্থিব কাজকেই প্রাধান্য দিয়ে যাচ্ছে!! কোথায় সেই রোগ বা ভয়ের ওযর!!

---

[২৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৫৩৬৩
[২৭] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ৬৫১/২৫২
[২৮] তিরমিযী, হাদীস নং : ২১৭

বিবাহ

পঁচিশ বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চেয়ে প্রায় পনের বছরের বড় চল্লিশ বছর বয়সী খাদিজার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের ইতিবৃত্ত হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদিজার হয়ে তারই গোলাম মাইসারাকে নিয়ে সিরিয়ায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে গমন করেন। পূর্ণ সফরে মাইসারা খুব কাছ থেকে তাঁর মহৎ গুণাবলি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করে, ফলে তাঁর সততা, আমানতদারী, নিষ্ঠা, কর্মতৎপরতা, বিচক্ষণতা ও চারিত্রিক মাধুর্য দেখে অভিভূত হয়ে যায়। সফর শেষে নিজ মালকীন খাদিজাকে সব খুলে বললে তিনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং বান্ধবীর মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠান। মহানবী ﷺ স্বীয় চাচা আবু তালিবের সাথে পরামর্শের পর প্রস্তাব গ্রহণ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান।

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা হিজরতের তিন বছর পূর্বে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স ছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর। এরই মাঝে তিনি নবীজীর সাথে পঁচিশ বছরের সাংসারিক জীবন অতিবাহিত করেন, তিনি জীবিত থাকাবস্থায় নবীজী আর কোন নারীকে বিবাহ করেননি।

তাঁর ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ বহু হিকমত ও নানাবিধ মহৎ উদ্দেশ্যে একাধিক নারীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বৈবাহিক জীবনের এ প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে জানার পর একজন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ বলতে বাধ্য হবেন যে, বিভিন্ন প্রাচ্যবিদরা তাঁর সম্পর্কে যে অশালীন মন্তব্য করেছে -যেমন তিনি একজন কামবাদী ও নারী লোভী মানুষ ছিলেন- তাদের এসকল কথা সর্বৈব মিথ্যা ও অসৎ উদ্দেশ্যে প্রচারিত। তাদের কথা সত্য কি করে হয়!? পঁচিশ বছর বয়সের একজন পরিপূর্ণ যুবক তার থেকে পনের বছরের বড় একজন প্রৌঢ়া নারীকে বিবাহ করে দীর্ঘ পঁচিশ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন, তার মৃত্যু অবধি অন্য কাউকে বিবাহ করেননি।

পরে যখন যৌবন শেষ হল এবং কাম তাড়না বিদায় নিল তখন গিয়ে বিবাহ করলেন। তাহলে এ দীর্ঘ সময়ে তাঁর তাড়না ও চাহিদা কি নির্বাপিত ও নিস্তব্ধ ছিল(!) অতঃপর পঞ্চাশ বছর বয়সে হঠাৎ একসাথে সব জেগে উঠল(!)? কোন ন্যূনতম বিবেক সম্পন্ন মানুষ এসব কথা মুখেও আনতে পারে না।

মজার ব্যাপার হচ্ছে অনেক পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী ও গবেষকরাও এসব অসার কথা পরিহাস ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে।

ইটালীয় গবেষক ড. লূরা ফিশিয়া ফ্যাগলীরী বলেন:

মুহাম্মাদ দীর্ঘ যৌবনে- যখন জৈবিক চাহিদা ও কাম তাড়না বিদ্যমান থাকে শক্তিশালী আকারে, ওপরন্তু তিনি বসবাস করতেন এমন একটি সমাজে যেখানে বিবাহ-শাদী, নীতি-নৈতিকতাসম্পন্ন সামাজিক কর্ম হিসাবে ছিল প্রায় বিলুপ্ত, আর একাধিক স্ত্রী থাকা ছিল একটি সর্ব-স্বীকৃত নিয়ম, তালাক বিচ্ছেদ ছিল সবচেয়ে সহজ কাজ এ সময় একজনমাত্র নারী ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করেননি। যাকে বিবাহ করেন তিনিও ছিলেন যুবক মুহাম্মাদ থেকে বয়সে অনেক বড়। দীর্ঘ পঁচিশটি বছর একমাত্র তার স্বামী হিসেবেই কাটিয়ে দিয়েছেন, এর মাঝে আর কাউকে বিবাহ করেননি। বিবাহ করেছেন খাদিজার ইন্তেকালের পর যখন বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করেছিল।

তিনি একাধিক বিবাহ করেছেন ঠিকই, কিন্তু প্রত্যেকটি বিবাহের পেছনেই সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণ ছিল।

যেমন, তিনি যাদেরকেই বিবাহ করেছেন তাঁদের অনেকেই ছিলেন স্বতন্ত্রভাবে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত। মুহাম্মাদ ﷺ অন্য সকল নারীদের মধ্য হতে বিবাহের জন্যে তাদের নির্বাচিত করার মাধ্যমে এটিই প্রমাণিত হয় যে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাকওয়া সংশ্লিষ্ট নারীদের সম্মানিত করা। অথবা বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, যাতে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে নতুন পথ বের করা যায়।

এছাড়া কেবলমাত্র আয়েশা-রাদিয়াল্লাহু আনহা- ব্যতীত যত নারী মুহাম্মাদ বিবাহ করেছেন কেউই কুমারী ছিলেন না এবং যুবতীও না। এর নামই কি কামুকতা ছিল? এর নাম কি নারী লিপ্সা?

তিনি ছিলেন (রক্ত মাংসে গড়া) মানুষ। ছেলে সন্তানের প্রতি আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। খাদিজার গর্ভে জন্ম-নেয়া তাঁর সকল ছেলে শিশু বয়সে মারা যায়। তাই ছেলে-সন্তানের প্রতি মোহই তাঁকে নতুন ভাবে বিবাহ করতে আগ্রহী করে থাকতে পারে।

এছাড়াও অনেক কারণ থাকতে পারে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃহৎ একটি পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এতদসত্ত্বেও তাঁদের মাঝে পূর্ণাঙ্গ সমতা বজায় রেখেছিলেন সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে। তাদের কারো প্রতিই তিনি চুল পরিমাণ পার্থক্য করেননি কখনো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণীবৃন্দ

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকালের পর তিনি আরো দশজন মহীয়সী নারীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সর্ব প্রথম সাওদা বিনতে যামআহ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিবাহ করেন, এর পর আয়েশা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহাকে, তিনি ব্যতীত আর কোন কুমারী নারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে আসেনি। অতঃপর হাফসা বিনতে উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে, এরপর যয়নব বিনতে খুযাইমা বিন হারেছকে, এরপর উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে আবী উমাইয়াকে, অতঃপর যয়নব বিনতে জাহশ, জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেছ এবং উম্মে হাবীবাকে, খায়বর বিজয়ের পর পর বিয়ে করেন সাফিয়্যাহ বিনতে হুরাইয়কে, সর্বশেষ মায়মূনা বিনতে হারেছকে আর তিনিই হচ্ছেন বিবাহের দিক থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বশেষ সহধর্মিণী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একাধিক বিবাহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এগারজন মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন, তাদেরকে মু'মীন জননী বলা হয়..। তিনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন নয়জন স্ত্রী জীবিত ছিলেন। তারা মহা সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বয়স্কা, বৃদ্ধা, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা ও দুর্বল মহিলাদের বিবাহ করেছিলেন, শুধু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাই ছিলেন কুমারী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল স্ত্রীর সাথে ইনসাফ আচরণ করেন। তিনি ছিলেন ইনসাফ ও তাদের হক বন্টনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا،

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর করার ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন সব স্ত্রীর নামে লটারি করতেন, যার নাম উঠত তাকেই তিনি সফর সঙ্গী করতেন, আর প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য পালা ক্রমে দিন-রাত বন্টন করতেন।"[২৯]

---

[২৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ২৫৯৩

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনসাফের এক বাস্তব নমুনা বর্ণনা করতে গিয়ে আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ، لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ. فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ، فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ، فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নয় জন স্ত্রী ছিলেন, তিনি যখন তাদের মাঝে দিন বণ্টন করতেন তখনও তিনি নয়জনকেই সমান চোখে দেখতেন। প্রতি নিশিতে তারা পালাপ্রাপ্ত বাড়ীতে একত্রিত হতেন, এক রাত্রিতে আয়েশার বাড়ীর পালার দিনে যয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা উপস্থিত হওয়াতে তিনি তাঁর হাত বাড়ালেন, এ দেখে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: তিনি তো যয়নাব, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় হাত ঘুরিয়ে নিলেন।"[৩০]

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ওহী ও তাওফিক না থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ বাড়ী এত সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালিত হত না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কাজ ও কথার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করতেন। তিনি স্ত্রীদেরকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের দিকে উৎসাহ প্রদান করতেন এবং আল্লাহর হুকুম পালনার্থে তাতে তিনি সহযোগিতা করতেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

"আর তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও ও তাতে অবিচলিত থাক, আমি তোমার নিকট কোন রুযী কামনা করি না, আমিই তোমাকে রুযী দেই এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।"[৩১]

---

[৩০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৪৬২/৪৬

[৩১] আল কুরআন, সূরা ত্বহা, ২০ : ১৩২

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي

"রাসূলুল্লাহ ﷺ [রাতে উঠে তাহাজ্জুদের] সালাত পড়তেন। আর আমি তাঁর বিছানায় আড়াআরি শুয়ে থাকতাম, যখন তিনি বিতর "সালাত পড়তেন তখন আমাকে জাগাতেন।"[৩২]

তাহাজ্জুদ নামাযে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে সাহায্য করার ব্যাপারে নবী ﷺ উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং সুন্দর পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন, আর তা হল: স্বামী স্ত্রীর চোখে বা স্ত্রী স্বামীর চোখে পানি ছিটিয়ে জাগাবে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন:

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ

"আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির ওপর দয়া করুন যে রাতে উঠে তাহাজ্জুদের সালাত পড়ল এবং স্বীয় স্ত্রীকেও জাগাল, স্ত্রী যদি উঠতে অলসতা করে তবে তার মুখে পানি ছিটা দিল। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা সে মহিলার ওপর দয়া করুন, যে রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের সালাত পড়ল এবং স্বীয় স্বামীকেও জাগাল, সে উঠতে অলসতা করলে তার মুখে পানি ছিটা দিল।"[৩৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তর যেমন পবিত্র, তেমনি ভাবে তার শরীর ছিল পরিষ্কার ও সুগন্ধিময়, তিনি বেশী বেশী মিসওয়াক করতে ভালবাসতেন এবং এ কাজে তিনি উম্মতকে আদেশ দিয়ে বলেন:

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

---

[৩২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৫১২

[৩৩] সুনানে আবি দাউদ, হাদীস নং : ১৩০৮

"আমি যদি আমার উম্মতের ওপর কঠিন মনে না করতাম তবে প্রত্যেক নামাযের আগে তাদেরকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"[৩৪]

হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন, তখন তিনি মিসওয়াক দ্বারা স্বীয় মুখ মেজে নিতেন।"[৩৫]

শুরাইহ বিন হানী বলেন:

قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ

"আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করলাম: যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়ীতে প্রবেশ করতেন, তখন সর্বপ্রথম কোন কাজটি করতেন? উত্তরে বলেন: মিসওয়াক করতেন।"[৩৬]

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে পরিবারের অভ্যর্থনার প্রস্তুতি কতই না সুন্দর কাজ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নের দোয়াটি পাঠ করে, বাড়ীর লোকদের সালাম জানিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করতেন:

بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

"আল্লাহর নামে প্রবেশ করলাম এবং আল্লাহর নামেই বাহির হয়েছিলাম ও আমাদের প্রতিপালকের ওপরই ভরসা করি।"[৩৭]

হে মুসলিম ভাই! আপনিও পরিষ্কার হয়ে ও বাড়ীর লোকদের সালাম জানিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করুন। যারা এ সুন্দর প্রথার পরিবর্তে পরিবারের লোকদেরকে গালি-গালাজ করতে করতে বাড়ীতে প্রবেশ করে আপনি তাদের মত হবেন না!!

---

[৩৪] সুনানে আবি দাউদ, হাদীস নং : ৪৭
[৩৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ২৪৫
[৩৬] সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং : ৮
[৩৭] সুনানে আবি দাউদ, হাদীস নং : ৫০৯৬

দাম্পত্য জীবন ও স্ত্রীদের সাথে আচরণ

ছোট সংসারে স্ত্রী অনেক বাধ্যবাধকতার ভিতর খেজুর বৃক্ষের শাখার মত স্বামীর সাথে অতি নিকটে অবস্থান করে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন:

الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

"দুনিয়ার পূর্ণটাই সম্পদ [স্বরূপ] তবে দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ হল: সতী স্ত্রী"।[৩৮]

নবী ﷺ আচরণ ও তিনি মনোরম দাম্পত্য উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নামকে আদরাচ্ছলে সংক্ষিপ্ত করে আহ্বান করা এবং তাকে এমন খবর পরিবেশন করা যাতে তার হৃদয় যেন তাঁর দিকে উড়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا: يَا عَائِشَ، هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে বলেন: হে আয়েশ! [সংক্ষিপ্তাকারে] জিব্রাঈল [আলাইহিস সালাম] এ মাত্র তোমাকে সালাম দিয়ে গেল"।[৩৯]

মুসলিম উম্মতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিপূর্ণ চরিত্র, সর্বোত্তম আদর্শ ও সুমহান মর্যাদার অধিকারী। দাম্পত্য জীবনের সর্বোত্তম নমুনা এবং নরম প্রকৃতি স্ত্রীর প্রকৃত আবেগ, অনুভূতি ও চাহিদা সম্পর্কে সম্যক অভিহিত।

তিনি স্ত্রীদেরকে এমন অবস্থান প্রদান করেন যা প্রত্যেক নারীই পছন্দ করবে, যার ফলে স্বামীর নিকট সে তার অর্ধাঙ্গিনীতে পরিণত হতে পারে।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ

[৩৮] সুনানে সুগরা বায়হাকী, হাদীস নং : ২৩৫০

[৩৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৩৭৬৮

"আমি ঋতুস্রাবের অবস্থায় কিছু পান করে নবী ﷺ-কে দিতাম, আর তিনি আমার মুখ রাখার স্থানে মুখ রেখে পান করতেন এবং আমি হাড়ের মাংস খেয়ে শেষ করলে তিনি তা গ্রহণ করে আমার মুখ লাগানোর স্থানেই মুখ লাগাতেন"[৪০]

তিনি কোনো ক্রমেই তেমন ছিলেন না, যা মুনাফিকরা ধারণা পোষণ করে থাকে এবং প্রাচ্যবিদরা যে সমস্ত মিথ্যা, অলীক অপবাদ আরোপ করে থাকে। বরং তিনি দাম্পত্য জীবনে সর্বোত্তম ও সহজ-সরল পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

"নিশ্চয় নবী করীম ﷺ তার কোনো এক স্ত্রীকে চুমু দিয়ে ওযূ না করেই নামাযের জন্য মসজিদের দিকে বের হয়ে যেতেন"।[৪১]

রাসূল ﷺ নারীর সুমহান মর্যাদা ও সসম্মান অনেক ক্ষেত্রেই প্রকাশ করেছেন। এই যে দেখুন: রাসূল ﷺ হযরত আমর বিন আস "-এর এক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করত তাকে শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন: স্ত্রীর ভালোবাসা, জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ ও সম্মানিত ব্যক্তিকে কোনো ক্রমেই অপমানিত করবে না।

আমর বিন আস " হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন,

أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ

"আপনার নিকট কোন্ ব্যক্তি সব চেয়ে প্রিয়? তিনি উত্তরে বলেন: আয়েশা।"[৪২]

যে ব্যক্তি দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে চায় সে যেন মুমিন হযরত জননী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর এ হাদিসটি ভালো করে ভেবে দেখে: তাতে রয়েছে রাসূল ﷺ তার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

"আমি ও রাসূল ﷺ এক পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম।"[৪৩]

---

[৪০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৩০০/১৪
[৪১] তিরমিযী, হাদীস নং : ৮৬
[৪২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৩৬৬২
[৪৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ২৫০

এ মুসলিম জাতির মহানবী ﷺ এমন কোনো ঘটনা অতিবাহিত হতে দেননি যার মাধ্যমে তিনি বৈধপন্থায় তাঁর স্ত্রীর মধ্যে আনন্দ ও মজা জাগিয়ে তোলেননি। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَأَنَا جَارِيَةٌ لَمْ أَحْمِلِ اللَّحْمَ وَلَمْ أَبْدُنْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: "تَقَدَّمُوا" فَتَقَدَّمُوا، ثُمَّ قَالَ لِي: "تَعَالَيْ حَتَّى أُسَابِقَكِ" فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ، فَسَكَتَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا حَمَلْتُ اللَّحْمَ وَبَدُنْتُ وَنَسِيتُ، خَرَجْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: "تَقَدَّمُوا" فَتَقَدَّمُوا، ثُمَّ قَالَ: "تَعَالَيْ حَتَّى أُسَابِقَكِ" فَسَابَقْتُهُ، فَسَبَقَنِي، فَجَعَلَ يَضْحَكُ، وَهُوَ يَقُولُ: "هَذِهِ بِتِلْكَ"

"আমি রাসূল ﷺ-এর সাথে কোনো এক ভ্রমণে বের হলাম, সে সময় আমি অল্প বয়সী ও শারীরিক গঠনের দিক দিয়েও পাতলা ছিলাম, তখনো মোটা তাজা হইনি। তিনি সাহাবীদের বললেন: তোমরা সামনের দিকে অগ্রসর হও। তারা যখন সামনের দিকে অগ্রসর হলো, তখন তিনি আমাকে বললেন: "এসো আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করি, অতঃপর আমি তাঁর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলাম ও আমি তার উপর বিজয় লাভ করলাম। তিনি সে দিন আমাকে কিছুই বললেন না। যখন আমি শারীরিক দিক দিয়ে মোটা হলাম ও ভারী হলাম তখন তাঁর সাথে কোনো এক সফরে বের হলাম। তিনি সাহাবীদের বললেন: তোমরা সামনের দিকে অগ্রসর হও। তারা যখন সামনে অগ্রসর হল: তখন তিনি আমাকে বললেন: এসো আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করি, এবারের প্রতিযোগিতায় তিনি আমার আগে চলে গিয়ে হাসতে হাসতে বললেন: আজকের জয় সেই দিনের প্রতিশোধ।"[৪৪]

এ ছিল সুন্দর চিত্ত বিনোদন ও স্ত্রীর ব্যাপারে অসীম গুরুত্বারোপ এবং স্বামী-স্ত্রীতে পরিপূর্ণ রোমান্টিকতা। সাহাবিদের আগে পাঠিয়ে স্বীয় স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে তার হৃদয় আনন্দিত করা। তারপর পূর্বের বিনোদনের ইতিহাস টেনে আজকের বিজয়ের তুলনা করে বলেন: আজকের বিজয় পূর্বের প্রতিশোধ।

---

[৪৪] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং : ২৬২৭৭

আল্লাহর এই প্রশস্ত জমিনে আজ যারা ভ্রমণ করে এবং জাতির কর্ণধারের অবস্থার প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে; যাতে রাসূল ﷺ আচরণের দ্বারা আনন্দিত হয়। যিনি মহা সম্মানিত নবী, বিজয়ী নেতা, কুরাইশ ও বনি হাশেম সন্তান।

কোনো এক বিজয়ের দিন, তিনি বিজয়ী বেশে এক মহা সেনা অভিযানের নেতৃত্ব প্রদান করে প্রত্যাবর্তন করছেন। এ অবস্থায়তেও তিনি ছিলেন স্বীয় স্ত্রী মু'মিন জননীদের সাথে রোমান্টিক ও নমনীয়তার মূর্তপ্রতীক। অভিযানের নেতৃত্ব, দীর্ঘ সফর, যুদ্ধের মহা বিজয় তাঁকে ভুলিয়ে দেয়নি যে, তাঁর সাথে রয়েছে দুর্বল স্ত্রী জাতি, যাদের তাঁর সুকোমল পরশ ও আন্তরিক ফিসফিসানির অধিকারও প্রয়োজন রয়েছে। যা তাদের দীর্ঘ রাস্তার কষ্ট ও সফরের ক্লান্তি দূর করবে।

ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করেন: রাসূল ﷺ যখন খায়বারের যুদ্ধ শেষে ফিরছিলেন তখন সাফিয়া বিনতে হুয়াই রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিবাহ করেন, এবার যে উটের পিঠে সাফিয়া আরোহণ করবেন তার চার দিকে ঘিরে পর্দার জন্য কাপড় লাগানোর পর তিনি উটের পাশে বসে তাঁর হাঁটুকে খাড়া করে দিলেন। অতঃপর সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা স্বীয় পা প্রিয়নবী ﷺ-এর হাঁটুতে রেখে উটে আরোহণ করেন।

এ অভূতপূর্ব দৃশ্যটি রাসূল ﷺ-এর বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ।

অথচ রাসূল ﷺ ছিলেন বিজয়ী কমাণ্ডার, ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে দূত বা রাসূল, তিনি উম্মতকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, স্ত্রীকে সাহায্য করা, তার সাথে বিনয়ী হওয়া, তাদের কাজে সহায়তা এবং তাদেরকে সুখ ও মজা প্রদানে তাঁর সম্মান ও মর্যাদার কোনো কমতি হবে না।

আর রাসূল ﷺ উম্মতদেরকে যে সব অসীয়ত করেন তন্মধ্যে একটি হলো:

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

"ওহে আমার উম্মত! তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে"[৪৫]

স্ত্রীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বামীদেরকে স্ত্রীদের জন্য খরচ করতে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ.

[৪৫] তিরমিযী, হাদীস নং : ১১৬৩; সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৫১৮৬

"আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তুমি যে কোনো ব্যয় করবে, তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে। এমনকি খাবারের যে লোকমাটি স্ত্রীর মুখে উঠিয়ে দেবে তার সওয়াবও তুমি পাবে।"[৪৬]

অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিবারের জন্য ব্যয় করাকে সর্বোত্তম ব্যয় বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন,

أَفْضَلُ دِينَارٍ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ.

"সর্বোত্তম অর্থ তা-ই, যা ব্যক্তি তার পরিবারের জন্য খরচ করে।"[৪৭]

তিনি আরো বলেন,

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ مِنَ الْمَاءِ أُجِرَ.

কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে পানি পান করালেও সে সওয়াব প্রাপ্ত হবে।[৪৮]

এ হাদীস শুনে ইরবাজ বিন সারিয়া রা. সাথে সাথে তার স্ত্রীকে পানি পান করান এবং তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ হাদীস শোনান।

এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবাদের নারীর প্রতি সদাচার, নম্রতাপূর্ণ আচরণ, তাদের প্রতি স্নেহশীল হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। আরো শিক্ষা দিয়েছেন ভালো জিনিসগুলো তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া ও সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করার।

তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, একজন পুরুষ ভাল মানুষ ও সৎ চরিত্রবান হিসেবে বিবেচিত হবার বড় প্রমাণ হলো নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার।

وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ

"তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা নিজ স্ত্রীদের কাছে উত্তম।"[৪৯]

তিনি স্বামীদেরকে নিজ স্ত্রীদের ঘৃণা ও তাদের প্রতি রাগান্বিত হতে নিষেধ করেছেন।

তিনি বলেন,

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً أَي لا يبغضها إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ.

---

[৪৬] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ৫৬

[৪৭] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ৯৯৪/৩৮

[৪৮] মুসনাদে আহমদ, ১৭১৫৫

[৪৯] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং : ৭৪০২

কোন মু'মিন পুরুষ মু'মিন নারীকে দূর করে দেবে না- তাকে ঘৃণা করবে না- তার একটি স্বভাব অপছন্দ হলে, আরেকটি পছন্দ হবে।[৫০]

এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে বিরাজিত ইতিবাচক ও ভালো স্বভাবগুলোর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে এবং নেতিবাচক দিকগুলোকে গুরুত্ব না দিতে। কারণ, নেতিবাচক দিকগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিলে তা নারী-পুরুষের মাঝে বৈরিতা ও বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর দাঁড় করাবে। ভেঙে যাবে সুন্দর সংসার।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের প্রহার করতেও নিষেধ করেছেন।

তিনি বলেন,

لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ.

তোমরা আল্লাহর বাঁদিদের প্রহার কর না।[৫১]

যারা নারীদের কষ্ট দেয় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন, বলেছেন, হে আল্লাহ! আমি দুর্বল জাতির অধিকারগুলোকে খুব জটিল মনে করি এখানে রাসূল ﷺ দুর্বল বলতে নারী ও ইয়াতীম এ দুই শ্রেণীর মানুষকে বুঝিয়েছেন। যারা তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার ও জুলুম করবে, আল্লাহর দরবারে তারা ছাড় পাবে না। বরং দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতেই তারা শাস্তি ও সংকীর্ণতার সম্মুখীন হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নারী-পুরুষ উভয়কে পরস্পরের গোপন খবর বাইরে প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত হবে ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে শয্যা গ্রহণ করল এবং যে স্ত্রী স্বামীর সাথে শয্যা গ্রহণ করল, অতঃপর গোপন বিষয়াদি বাইরে প্রকাশ করে দিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের সম্মান করতেন এর আরেকটি প্রমাণ হল, তিনি স্ত্রীদের ব্যাপারে স্বামীদেরকে খারাপ ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন এবং তাদের ভুল-ক্রটি অন্বেষণ করতে বারণ করেছেন। জাবের রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের খেয়ানতকারী জ্ঞান করে কিংবা তাদের বিচ্যুতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে পুরুষদেরকে রাতের বেলায় অকস্মাৎ ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। নারীদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যবহার ছিল আরো অমায়িক,

---

[৫০] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৪৬৯/৬১
[৫১] সুনানে আবি দাউদ, হাদীস নং : ২১৪৬

আরো বন্ধুত্বপূর্ণ। তাদের ক্ষেত্রে নম্রতা ও স্নেহশীলতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি।

আসওয়াদ রা. বলেন, আমি আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞাসা করেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বাড়িতে কোন কাজ করতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা স্ত্রীদের কাজে সহযোগিতা করতেন। সালাতের সময় হয়ে গেলে সালাতের জন্য উঠে পড়তেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় স্ত্রীদেরকে মিষ্টি কথা আর কৌতুকের মাধ্যমে প্রফুল্ল রাখতেন। তিনি একদিন আয়েশাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি সব বুঝতে পারি। আয়েশা বললেন, আল্লাহর রাসূল! আপনি কীভাবে তা বুঝতে পারেন? তিনি বললেন, তুমি যখন সন্তুষ্ট থাক তখন বল, হ্যাঁ, এমনই, মুহাম্মদের রবের শপথ। আর যখন অসন্তুষ্ট থাক তখন বল, না, ইবরাহিমের রবের শপথ। আয়েশা বললেন, আল্লাহর রাসূল আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে, আমি শুধু আপনার নামটিই বাদ দেই। আমার অন্তরে আপনি ঠিকই বিদ্যমান থাকেন, এতে কোনো পরিবর্তন আসে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রী খাদিজাকে কখনো ভোলেননি, এমনকি মৃত্যুর পরও না। আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কোনো উপহার সামগ্রী আসলে তিনি বলতেন এগুলো অমুকের কাছে নিয়ে যাও, সে খাদিজার বান্ধবী ছিল। এ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নারীর প্রতি ভালোবাসা ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কিছু নিদর্শন।

হে নারী স্বাধীনতার দাবিদার ব্যক্তিবর্গ, তোমাদের মাঝে এর কোন কোনটি বিদ্যমান আছে! একটু ভেবে দেখবে কি?

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যাগণ

জাহেলিয়াতের যুগে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করা ছিল পিতা-মাতার জীবনের এক কাল অধ্যায়। আর এ কাল অধ্যায়ের গ্লানি পরিবার ও বংশের সবার ওপর ছেয়ে যেত। পরিশেষে উক্ত সমাজের অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হল যে, লজ্জা ও গ্লানির ভয়ে জীবিত শিশু কন্যাকে কবরস্থ করতে দ্বিধাবোধ করত না। তাদেরকে এমন কদাকার নিষ্ঠুরতার সাথে কবরস্থ করা হতো যাতে না ছিল দয়ার কোন লেশ না ছিল ভালোবাসার কোন স্থান। আর এ কাজটি বিভিন্ন পন্থায় আঞ্জাম দিত। তন্মধ্যে একটি চিত্র ছিল এই যে, কারো কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে ছয় বছর বয়স পর্যন্ত পালন করার পর, স্ত্রীকে বলত: তাকে ভাল করে সাজিয়ে দাও আমি তাকে নিয়ে তার চাচার বাড়ীতে যাব। তার পূর্বেই মরুভূমিতে গর্ত খনন

করে রাখত, গর্তের নিকট গিয়ে কন্যাকে বলত: এ গর্তের দিকে তাকাও, কন্যা গর্তের নিকট যাওয়ার সাথে সাথে ধাক্কা দিয়ে তাতে ফেলে নির্দয় ও নির্মমভাবে তার ওপর মাটি চাপা দিত।

এ জাহেলী সমাজের মাঝেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এ মহান দ্বীন নিয়ে এসে নারীকে মা, স্ত্রী, মেয়ে, বোন ও চাচী-ফুফুর মর্যাদায় স্থান দেন। কন্যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালবাসায় ধন্য হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাড়ীতে যখন তাঁর মেয়ে ফাতেমা প্রবেশ করত তখন তিনি তার হাত ধরে চুমা খেয়ে স্বীয় পার্শে বসাতেন এবং তিনি যখন তাঁর বাড়ীতে প্রবেশ করতেন, তিনিও তাঁর হাত ধরে চুমু খেয়ে স্বস্থানে বসাতেন।

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

"আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক।"[৫২]

আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াতি কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে এবং এ বলে হুমকি দেয় যে, বিরত না হলে তার মেয়েদ্বয়কে তালাক দেয়া হবে এবং তিনি তার দাওয়াতি কাজে অবিচল থাকায় তারা তাঁর কলিজার টুকরা যাদের প্রতি এত ভালবাসা ও সম্মান থাকা স্বত্বেও আবু লাহাবের দুই ছেলে উতবা ও উতায়বা কর্তৃক তাঁর দুইজন মেয়ে উম্মে কুলসুম ও রুকাইয়ার তালাককেও ধৈর্যের সাথে মেনে নিয়েছিলেন। এ দ্বীনের দাওয়াত হতে তিনি এতটুকুও সরে দাড়াননি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক তাঁর মেয়েকে অভ্যর্থনা জানানো ও হাসিমুখে তাকে বরণ করার চিত্র আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করে বলেন:

كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ. لَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً. فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي. مَا تُخْطِئُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا. فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا. فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِابْنَتِي» ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ

"নিশ্চয়ই আমরা রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীরা তাঁর নিকট বসে থাকতাম, এমন সময় ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হেঁটে আগমন করত, তার চলন ছিল রাসূল ﷺ-

---

[৫২] সূরা লাহাব, ১১১ : ১

এর চলার মতই। তিনি তাকে দেখামাত্রই এই বলে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলতেন "স্বাগত আমার মেয়েকে" অতঃপর তিনি তাকে তার ডানে কিংবা বামে বসাতেন।"[৫৩]

কন্যাদের দেখতে যাওয়া ও তাদের সমস্যা দূর করাও প্রমাণ করে তাদের প্রতি তার অফুরন্ত দয়া ও ভালবাসা। একদা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমীপে কাজ করতে করতে তার হাতে ফোস্কা পড়ার অভিযোগ করে একজন খাদেমের আবেদন করতে এসে তাকে না পেয়ে, আবেদনটি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জানালেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমকে আবেদনটি সম্পর্কে অবহিত করলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আমরা শুয়ে পড়েছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ আমাদের কাছে প্রবেশ করলেন, আমরা তাঁকে দেখে দাঁড়াতে গেলাম, তিনি বললেন: مكانكما তোমরা স্বীয় স্থানেই থাক। রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে আমাদের দুইজনের মাঝখানে বসলেন, তার পায়ের ঠাণ্ডা আমার সিনায় অনুধাবন করতে পারলাম। অত:পর তিনি বললেন:

أَلَا أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَا، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، أَنْ تُكَبِّرَا اللهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَتُسَبِّحَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ

"আমি কি তোমাদেরকে এমন পন্থা শিখবো? যা তোমাদের জন্য একজন খাদেমের চেয়েও উত্তম হবে? আর তা হলঃ যখন তোমরা বিছানায় শুইতে যাবে, তখন ৩৪ বার আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদু লিল্লাহ পাঠ করবে, এগুলো পাঠ করা একজন খাদেম পাওয়া অপেক্ষা শ্রেয়।"[৫৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ধৈর্যধারণ ও বিপদে অধৈর্য না হওয়ার ব্যাপারে আমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় ফাতেমা ব্যতীত সকল কন্যাগণ মৃত্যুবরণ করেন এর পরেও তিনি কখনও তিনি তাযিয়া বা শোকের কোন প্রকার অনুষ্ঠান করেননি। বরং তিনি সওয়াবের প্রত্যাশায় ও আল্লাহ কর্তৃক তাকদীরকে মেনে নিয়ে ধৈর্যধারণ করেছেন।

বিপদ ও মুসিবত বিচলিত না হয়ে ধৈর্যধারণ করতে ও নিচের দুআ পড়তে :

---

[৫৩] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৪৫০/৯৮

[৫৪] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৭২৭/৮০

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।"[৫৫]

اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

"হে আল্লাহ আপনি এ বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করুন এবং এর চেয়ে উত্তম বস্তু আমাকে দান করুন।"[৫৬]

আল্লাহ তা'আলা কষ্টে পতিত ব্যক্তির আশ্রয় স্থল। তিনি ধৈর্য ধারণকারীদের মহা সওয়াব প্রদানকারী এবং তিনি তাদেরকে প্রতিদানের সুসংবাদ দিয়ে বলেন:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"ধৈর্য ধারণকারীদের প্রতিদান দেয়া হবে হিসাব ছাড়া।"[৫৭]

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ ﷺ

ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের বুলি : ইসলাম নারীর ওপর জুলুম করেছে, তাদেরকে শোষণের পাত্র বানিয়েছে, অধিকার বঞ্চিত করেছে। সর্বোপরি তাদেরকে পুরুষদের সেবক ও ভোগের পণ্যে পরিণত করেছে।

বস্তুত নারীর মর্যাদা, সম্মান ও নারীর মতামতের গুরুত্ব, তার সাথে ভদ্রোচিত ব্যবহার, সর্বক্ষেত্রে তার ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করণ ও যথাযথ প্রাপ্য প্রদান করার যে সকল নির্দেশ ও উপদেশ বাণী রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে তা সমালোচকদের মিথ্যাচারকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ [রে।

জাহিলী যুগে আরবরা স্বভাবগতভাবেই মেয়েদের অপছন্দ করত, তাদেরকে অপমান ও লজ্জার বিষয় বলে গণ্য করত। কোথাও কোথাও মেয়েদের জীবিত দাফন করার ঘটনাও ঘটেছে। পবিত্র কুরআন যার চিত্র তুলে ধরেছে এভাবে:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

---

[৫৫] আল কুরআন, সূরা বাকারা, ২ : ১৫৬

[৫৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৯১৮/৩

[৫৭] আল কুরআন, সূরা যুমার, ৩৯ : ১০

"তাদের কাউকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেয়া হলে মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে, সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কতই না নিকৃষ্ট।"[৫৮]

সে যুগে স্বামী মারা গেলে সন্তান ও নিকট আত্মীয়রা স্ত্রীদের উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক বনে যেত। তাদের ইচ্ছা হলে অন্য কারো সাথে বিয়ে দিত, তা না হলে মৃত্যু পর্যন্ত এভাবেই আটকে রাখত। ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ইনসাফপূর্ণ বিধান প্রণয়ন করে এ সকল কুসংস্কার থেকে মানব সমাজকে পরিশুদ্ধ করেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নারীরা পুরুষের সহোদরা, তাদের ভগ্নিসদৃশ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইসলামে নারী-পুরুষের মাঝে কোন বৈষম্য নেই। ইসলামের দুশমনরা যেমনটি তুলে ধরতে সদা তৎপর। বরং ইসলামে আছে নারী পুরুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও একে অন্যকে পূর্ণতাদানের সম্পর্ক।

পবিত্র কুরআন ঈমান, আমল ও প্রতিদানের ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমভাবে বিধান রচনা করে দিয়েছে।

তিনি ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও সিয়ামপালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ

[৫৮] সূরা নাহল, ৫৯

ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী- এদের জন্যে আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। (আহযাব, ৩৫)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ.

কেউ মন্দ আমল করলে সে শুধু তার আমলের অনুরূপ শাস্তি পাবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মুমিন হয়ে সৎ আমল করবে তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তারা অসংখ্য রিযিক পাবে।[৫৯]

এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীর প্রতি তাঁর মহব্বতপূর্ণ মনোবৃত্তির কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন :

তোমাদের এ পার্থিব জগৎ হতে আমার নিকট নারী ও সুগন্ধি প্রিয় করে দেয়া হয়েছে। আর সালাতের মধ্যে আমার চোখের শীতলতা রেখে দেয়া হয়েছে। নারীর প্রতি এ মহব্বত ও ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয় যিনি বহন করেছেন, তাঁর পক্ষে কখনো সম্ভব নয় নারীর প্রতি জুলুম করা, তাকে অবজ্ঞা-অবহেলা করা, তাদের শোষণ-জ্বালাতনের পাত্রে পরিণত করা।

মহানবী ﷺ নারীদের অপছন্দ করা ও তাদের জীবিত দাফন করার কুপ্রথা শুধু রহিতই করেননি, এর বিপরীতে বরং মেয়েদের যথার্থভাবে লালন-পালন, শিক্ষাদান এবং তাদের সাথে মমতাপূর্ণ আচরণ ও সদ্ব্যবহার প্রতি তাগিদ করেছেন। তিনি বলেছেন:

যে ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত দুই জন মেয়ের লালন পালনের দায়িত্ব পালন করবে কিয়ামতের দিন সে এবং আমি এভাবে উত্থিত হব- তিনি হাতের আঙুলগুলো জড়ো করে দেখালেন।

অর্থাৎ সে ব্যক্তির মর্যাদা খুব উর্ধ্বে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অতি নিকটবর্তী। যার কারণ, মেয়েদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা এবং সাবালক ও নিজের পায়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত তাদের লালন-পালন করা।

---

[৫৯] সূরা গাফের, ৪০

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন :

যার তিনজন মেয়ে বা তিনজন বোন রয়েছে অথবা দুজন মেয়ে বা দুজন বোন রয়েছে আর সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করল এবং তাদের অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করল, তার জন্যে রয়েছে জান্নাত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের শিক্ষা-দীক্ষা, তালীম- তরবিয়তের ব্যাপারেও সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। তিনি সপ্তাহে একদিন নির্ধারণ করে রেখেছিলেন শুধু তাদের জন্য। তিনি সে দিন তাদের কাছে আসতেন, তাদের আল্লাহর বাণী ও তাঁর আদেশ-নিষেধসমূহ শিক্ষা দিতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের ঘরের চার দেয়ালের ভেতর আবদ্ধ করেও রাখেননি, যেমনটি সাধারণত ধারণা করা হয়। বরং তিনি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বাইরে বের হওয়ার বৈধতা ঘোষণা করেছেন। যেমন মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ, অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যাওয়া ইত্যাদি। এমনকি শালীনতা বজায় রেখে ইসলামী পর্দার অনুকূলে থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মুআমালাকেও নারীর জন্য জায়েয করেছেন। তাদের জন্য মসজিদে গমনাগমন বৈধ রেখেছেন, তারা মসজিদে যেতে চাইলে বারণ করতে নিষেধ করেছেন।

তিনি বলেন,

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ.

"তোমরা তোমাদের নারীদের মসজিদ হতে বারণ করো না।"[৬০]

নারীদের ব্যাপারে তিনি আরো বলেছেন:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

"তোমরা নারীদের ক্ষেত্রে কল্যাণকামী হও।"[৬১]

এ হাদীসের দাবি হচ্ছে, নারীদের সাথে বন্ধুপ্রতিম আচরণ নিশ্চিত করা, তাদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, তাদের মন-মানসিকতা ও চাওয়া-পাওয়ার মূল্য দেয়া এবং তাদের কোন রূপ কষ্ট না দেয়া।

[৬০] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং : ৫০২১

[৬১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৩৩৩১

অধ্যায়-২ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তী যুগ

রাসূল ﷺ-এর নবুওয়তপ্রাপ্তি

এবং স্বগোত্রকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান

রাসূলুল্লাহ ﷺ চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়ত প্রাপ্ত হন। এটা মানুষের জ্ঞান-অভিজ্ঞতায় পূর্ণতা প্রাপ্তির বয়স। রমযান মাসের একুশ তারিখ সোমবার দিন তিনি যখন হেরা গুহায় তখন ফেরেশতা তার নিকট অবতীর্ণ হন।

ফেরেশতা এসে বললেন, আপনি পড়ুন, তিনি বললেন, আমি পড়তে পারি না। ফেরেশতা তাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন- তাতে তার খুব কষ্ট হল। ফেরেশতা আবার বললেন, পড়ুন, তিনি বললেন, আমি পড়তে পারি না। এভাবে তিনবার হল। অতঃপর ফেরেশতা বললেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

"পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে। পড় আর তোমার রব মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন- তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।"[৬২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁপতে কাঁপতে খাদিজার নিকট ফিরে এলেন। যা দেখলেন তাকে জানালেন। খাদিজা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : এটা আপনার জন্য শুভ সংবাদ। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ, আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখেন। সত্য কথা বলেন। বিধবাদের অন্নের ব্যবস্থা করেন। অসহায়দের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করেন। মেহমানদারী করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য করেন।

অতঃপর খাদিজা রাসূলকে নিয়ে চাচাতো ভাই ওরাকা বিন নওফেল এর নিকট গেলেন। তিনি জাহেলী যুগে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হিব্রু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং তা লিখতে পারতেন। ইঞ্জিলের বিশেষ কিছু অংশ তিনি আরবিতে অনুবাদ করেছিলেন। তখন তিনি বয়োবৃদ্ধ হয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদিজা তাকে বললেন : ভাই, আপনার এ ভাইয়ের ছেলের ঘটনাটি শোনেন। ওরাকা তাকে বললেন, ভাতিজা! কি দেখছ তুমি, রাসূলুল্লাহ #

---

[৬২] সূরা আলাক: ১-৫

ঘটনাটি বিস্তারিত বললেন। ওরাকা শুনে বললেন : এ তো সে নামুস যা আল্লাহ তাআলা নবী মুসা আ. এর প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন। আফসোস! আমি যদি সে সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতাম, যখন আপনার জাতি আপনাকে দেশ হতে বের করে দেবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারা কি আমাকে দেশ হতে বের করে দেবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আপনার মতো দায়িত্ব নিয়ে যে কেউই এসেছে, তার সাথে শত্রুতা করা হয়েছে। যদি আপনার সেদিনটি আমার জীবদ্দশায় আসে, আমি আপনাকে সাহায্য করব। এরপর ওরাকা আর বেশি দিন বাঁচেননি।

এরপর বেশ কিছু দিন ওহী বন্ধ ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক দিন অপেক্ষা করেছেন, কোন কিছুই দেখতে পাননি। এ জন্য রাসূল খুব চিন্তিত হলেন। অধীর আগ্রহে ওহীর প্রতীক্ষায় রইলেন।

এরপর একদিন আসমান-জমিনের মাঝখানে একটি চেয়ারের ওপর ফেরেশতা দৃশ্যমান হলেন। তাকে সান্ত্বনা দিলেন ও শুভ সংবাদ শোনালেন- আপনি সত্যিকারার্থেই আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখে ভয় পেলেন। খাদিজার কাছে আবার গেলেন এবং বললেন, আমাকে কম্বলাবৃত কর, আমাকে কম্বলাবৃত কর।

এ সময় আল্লাহ তার ওপর নাযিল করলেন :

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

“হে কম্বল আচ্ছাদিত! ওঠ, সতর্ক কর এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর। তোমার কাপড় পবিত্র কর।”[৬৩]

এ আয়াতগুলোর ভেতর আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বীয় জাতিকে সতর্ককরণ, আল্লাহর প্রতি আহ্বান এবং তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন। স্বয়ং রাসূল ﷺ-কেও বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য কোমর বেঁধে লেগে গেলেন- পূর্ণ ইয়াকীনের সাথে জেনে নিলেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর আনুগত্য পূর্ণভাবে আদায়ে সচেষ্ট হলেন। ছোট-বড়, আযাদ- গোলাম, পুরুষ-মহিলা, সাদা-কালো সকলকেই তিনি আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাতে লাগলেন। আল্লাহর তাওফীকে প্রত্যেক গোত্র হতেই কতক লোক-যাদের ভাগ্যে আল্লাহ

---

[৬৩] সূরা মুদ্দাস্সির, আয়াত নং : ১-৪

তাআলা দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী রেখেছিলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ডাকে সাড়া দিলেন। ইসলামের আলোয় আলোকিত হলেন। মক্কার কতিপয় জাহেল লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মু'মিনদেরকে কেন্দ্র করে কষ্ট-নির্যাতন আরম্ভ করল। চাচা আবু তালেবের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে হেফাযত করলেন। তিনি ছিলেন ভদ্র, অনুকরণীয় ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তার বর্তমানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে সাহস পেত না। কারণ, তারা জানত মুহাম্মাদ তার নিকট খুবই প্রিয়। আবার সে তাদের ধর্মের একজনও বটে। এ জন্যই তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেনি তার সাথে প্রকাশ্যে শত্রুতাও পোষণ করেনি।

ইবনে জাওযি রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন বছর যাবত গোপনে গোপনে দাওয়াত কার্য পরিচালনা করেন। অতঃপর আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী নাযিল হল :

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

"অতএব, তুমি যে বিষয় আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদেরকে এড়িয়ে চল।"[৬৪]

এর পর যখন আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী নাযিল হল :

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

"তোমার নিকটজনদের ভীতি প্রদর্শন কর।"[৬৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘর থেকে বের হয়ে সাফা পাহাড়ে আরোহণ করেন। অতঃপর উচ্চস্বরে ইয়া সাবাহাহ! বলে আওয়াজ দিলেন। তারা সকলে বলাবলি করল : কে ডাকছে? তাদের পক্ষ হতেই উত্তর আসল : মুহাম্মাদ! সকলে তার নিকট গিয়ে উপস্থিত হল। তিনি বললেন, হে অমুকের বংশধরগণ, হে আবদে মানাফের বংশধরগণ, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ, অতঃপর সকলেই তাঁর নিকট জমায়েত হল। তিনি বললেন, আমি যদি তোমাদের বলি, এ পাহাড়ের পাদদেশে শত্রু পক্ষের একটি বড় ঘোড়ার বহর অপেক্ষা করছে, তবে কি তোমরা আমাকে সত্য বলে জানবে? তারা সমস্বরে বলল : আমরা কখনো তোমাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে এক কঠিন শাস্তি হতে সতর্ক করছি। এ কথা শোনা মাত্রই চাচা আবু লাহাব বলে উঠল :

---

[৬৪] সূরা হিজর, আয়াত নং : ৯৪

[৬৫] সূরা শুআরা, আয়াত নং : ২১৪

ধ্বংস হোক তোমার! এজন্যই কি তুমি আমাদের জমায়েত করেছ? এ বলে সে উঠে গেল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন :

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ . مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ . سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ . وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ . فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ .

"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন উপকারে আসেনি। অচিরেই সে লেলিহান শিখাময় জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহনকারী, তার গলদেশে শক্ত পাকানো রশি রয়েছে।"[৬৬]

নিপীড়ন-নির্যাতনের বিপরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ধৈর্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ দাওয়াতের জটিল ও কঠিন ময়দানে প্রবেশ করেছেন। উপদেশ প্রদানের সকল পথে গমন করেছেন। দিক নির্দেশনার সমস্ত প্রান্তরে পা রেখেছেন। তিনি আহ্বান জানিয়েছেন এক আল্লাহর প্রতি, পূর্ব পুরুষদের অনুসৃত সকল উপাস্যদের উপাসনা পরিত্যাগ করার প্রতি, আরো আহ্বান জানিয়েছেন শিরক, কুফর, মূর্তি পূজা ও মূর্তিপূজকদের ত্যাগ করার প্রতি। অশ্লীলতা ও নিষিদ্ধ কর্ম হতে বারণ করেছেন। কিন্তু খুব কম মানুষই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, বেশির ভাগ লোকই তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

আল্লাহ প্রদত্ত নিরাপত্তা ও চাচা আবু তালেবের তত্ত্বাবধান সত্ত্বেও রাসূলকে কষ্ট দেয়া হয়েছে অনেক। অবরুদ্ধ করা হয়েছে। সংকুচিত করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তার জীবন। নবুওয়তের সপ্তম বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচা আবু তালেব, বনু হাশেম ও আবদুল মুত্তালিব বংশীয় মুসলমান ও কাফির সকল ব্যক্তি, শিয়াবে আবু তালেবে প্রবেশ করেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল আবু লাহাব। এদিকে কাফিররা তাদের সাথে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিল। তাদেরকে সর্বতভাবে বয়কট করল। কখনো সন্ধি চুক্তিতে আসবে না বলে ঘোষণা দিল। বাজারের রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হল। খাদ্য-সামগ্রী পৌঁছানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল। যতক্ষণ না তারা রাসূলকে হত্যার জন্য তাদের হাতে সোপর্দ করে দেয়। এ সব জুলুম অন্যায়ের অঙ্গীকার নামা লিপিবদ্ধ করে কাবা ঘরের দেয়ালে তারা ঝুলিয়ে দিল। এদিকে কাফিরদের নির্যাতনের তীব্রতা লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথিদের ইথিওপিয়ায়

---

[৬৬] সূরা মাসাদ, আয়াত নং : ১-৫

(হাবশা) হিজরতের নির্দেশ দিলেন। এটা ছিল দ্বিতীয় হিজরত। এ যাত্রায় ৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮ জন মহিলা রওয়ানা করলেন। তাদের সাথে রওনা করলেন ইয়েমেনের মুসলমানগণও।

যুলম-নির্যাতন এবং ক্ষুধা ক্লিষ্ট হয়ে দীর্ঘ তিন বছর শিয়াবে আবি তালিবে অতিবাহিত করলেন তিনি ও তাঁর সাথিরা। কোন কিছুই তাদের নিকট পৌঁছত না, যৎসামান্য যাও যেত, অত্যন্ত গোপনে। এক পর্যায়ে তাদের বৃক্ষের পাতা পর্যন্ত চিবাতে হয়েছে। নবুওয়তের দশম বর্ষ পর্যন্ত মুসলমানগণ এ দুর্বিষহ জীবন যাপন করেন। এক সময় কুরাইশের কতক লোক প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ঘোষণা দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথিদের নিয়ে বন্দিদশা থেকে বের হয়ে আসলেন।

এ বছরই ইন্তেকাল করলেন স্ত্রী খাদিজা রা.। এর প্রায় দুই মাস পর মারা গেলেন চাচা আবু তালেব। তিনি মারা যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর কুরাইশদের নির্যাতন, বাড়াবাড়ি ও গোঁড়ামি বেড়ে গেল। যা আবু তালেবের জীবিত অবস্থায় তারা করতে পারেনি।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এক ঘটনায় এসেছে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবাঘরের সামনে সালাত আদায় করছিলেন। আবু জাহেল তার সাথিদের নিয়ে পাশেই বসা ছিল। কিছু দূরেই গতকালের জবাই করা একটি উটের পচা ভুঁড়ি পড়েছিল। আবু জাহেল বলল, তোমাদের মধ্যে কে পারবে, অমুকদের জবাই করা উটের ভুঁড়িটি এনে মুহাম্মাদ যখন সেজদায় যাবে তার পিঠের ওপর রেখে দিতে? তাদের মধ্যে এক হতভাগা উঠে গিয়ে তা নিয়ে আসল এবং রাসূল সিজদায় যাওয়ার পর তার কাঁধের ওপর রেখে দিল। এ দৃশ্য দেখে তারা খিলখিল করে হাসতে লাগল। একে অপরের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছিল। মেয়ে ফাতেমা দৌড়ে আসলেন এবং পিতার কাঁধ হতে ভুঁড়ি সরিয়ে তাদের গাল-মন্দ করতে লাগলেন। সালাত শেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চস্বরে তাদের জন্য বদ-দোয়া করলেন। তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদের বিচার কর। দোয়ার আওয়াজ শোনার সাথে সাথে তাদের হাসি চলে গেল। তার বদ-দুআকে তারা ভয় করতে লাগল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন :

হে আল্লাহ! তুমি আবু জাহেল, উত্‌বা, শাইবা, ওলীদ, উমাইয়া ও উকবার বিচার কর।

ইবনে মাসউদ রা. বলেন : যে আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তার শপথ করে বলছি, যাদের নাম ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বদ-

দুআ করেছিলেন আমি তাদের সকলকেই বদর যুদ্ধে নিহত হতে দেখেছি। অতঃপর তাদের সকলকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীর এক জায়গায় এসেছে, একদিন উকবা বিন আবি মুআইত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাঁধ ধরে গ্রীবায় কাপড় পেঁচাল এবং নিশ্বাস বন্ধ করে দেওয়ার জন্য প্রচণ্ডভাবে চাপ দিল। ইত্যবসরে আবু বকর রা. দৌড়ে এলেন এবং তাকে মুক্ত করে বললেন, তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও এ অপরাধে যে, তিনি বলেন আমার রব আল্লাহ?

কাফিরদের নির্যাতন যখন দিন দিন বেড়েই চলল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। সেখানকার ছাকীফ গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তাদের কাছ থেকে শত্রুতা, উপহাস ও কষ্ট ছাড়া কিছুই পেলেন না। তারা তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করে পায়ের উভয় টাখনু রক্তাক্ত করে দিল। তিনি পুনরায় মক্কায় ফিরে আসতে মনস্থির করলেন। কারনুস সাআলিব নামক স্থানে এসে রাসূল উপরের দিকে তাকিয়ে দেখেন একটি মেঘমালা ছায়া করে আছে। ভালো করে দৃষ্টি দিয়ে দেখেন, জিবরাঈল সেখানে উপস্থিত। তিনি উচ্চ আওয়াজে বললেন : আপনার গোত্রীয় লোকজন কি করেছে এবং তারা কি উত্তর দিয়েছে, মহান আল্লাহ সবই প্রত্যক্ষ করেছেন। তাদের ব্যাপারে আপনার নির্দেশ শোনার জন্য তিনি পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদের প্রেরণ করেছেন। পাহাড়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা তাকে ডাক দিয়ে সালাম করলেন। অতঃপর বললেন : মুহাম্মাদ! আপনার গোত্র আপনাকে কি বলেছে, আল্লাহ শুনেছেন। আমি পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা। আপনার রব আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন। তাদের ব্যাপারে আপনার যা ইচ্ছে হয়, নির্দেশ করুন। আপনার মর্জি হলে আমি মক্কার দুটি পাহাড় এক সাথে মিশিয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন :

بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

"বরং আমি আশা করছি, তাদের বংশ হতে এমন লোক বের হয়ে আসবে, যারা আল্লাহর ইবাদত করবে। তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না।"[৬৭]

---

[৬৭] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ৩২৩১

আল্লাহর হেফাযতে নবী ﷺ

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ.

হে রাসূল! আপনার রব আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, আপনি তা পৌঁছে দিন। যদি তা না করেন, তবে আপনি আল্লাহর রেসালাত-ই আদায় করলেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষ হতে হেফাজত করবেন।[৬৮]

ইবনে কাছীর রহ. বলেন, অর্থাৎ আপনি আমার রেসালত পৌঁছাতে থাকুন, আমি আপনাকে হেফাজত করব এবং আপনার শত্রুদের মুকাবিলায় আপনাকে শক্তিশালী করব। আমি আপনাকে তাদের ওপর জয়ী করব, আপনি ভয় করবেন না, চিন্তাও করবেন না। কু-বাসনা নিয়ে আপনার পর্যন্ত কেউ পৌঁছতে পারবে না। এ আয়াত নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করা হত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ হেফাযত করেছেন এর একটি উদাহরণ : আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনা: আবু জাহেল একদিন বলল, তোমাদের সামনে কি মুহাম্মদ মাটিতে কপাল ধূলায়িত করে? উত্তরে বলা হল, হ্যাঁ। সে বলল : লাত, উজ্জার শপথ! আমি যদি এমনটি করতে দেখি, তার গরদান পা দিয়ে মাড়িয়ে দেব-কর্দমাক্ত করে দেব তার চেহারা। এরপর একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করছিলেন। আবু জাহলের। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গরদান মাড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলে। উপস্থিত সকলে উৎসাহ দিল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছতে না পৌঁছতেই পিছু হটতে লাগল। আর দুই হাত দিয়ে নিজেকে হেফাযত করার চেষ্টা করতে দেখা গেল। লোকেরা জিজ্ঞেস করল : কি হয়েছে? সে বলল, আমার ও তার মাঝখানে আগুনের গর্ত দেখতে পাচ্ছি, ভয়াবহ অবস্থা ও বিরাট সৈন্যবাহিনী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি সে আমার দিকে এগিয়ে আসত, ফেরেশতারা একটি একটি করে তার অঙ্গসমূহ ছিঁড়ে নিয়ে যেত।

ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, আবু জাহেল বলেছে, আমি যদি মুহাম্মদকে কাবার পাশে সালাত আদায় করতে দেখি, তার ঘাড় মাড়িয়ে দেব। রাসূলুল্লাহ

---

[৬৮] সূরা মায়িদা, আয়াত নং : ৬৭

ﷺ এ কথা শুনে বললেন, যদি সে এমনটি করতে আসে, ফেরেশতারা তাকে পাকড়াও করবে। বুখারী।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খাসফা নামক গোত্রের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। সুযোগ বুঝে তাদের এক যোদ্ধা, গাউরাস বিন হারেস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একেবারে নিকটে চলে আসে। সামনে দাঁড়িয়ে বলে, তোমাকে আমার কবজা থেকে কে রক্ষা করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ। এ কথা শুনে তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তলোয়ার উঠিয়ে বললেন, এবার তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? সে বলল, উদারতার পরিচয় দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি সাক্ষ্য দাও আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি তাঁর রাসূল। সে বলল, না। এ সাক্ষ্য আমি দিতে পারব না। তবে, আমি আপনার সাথে অঙ্গীকার করছি। আপনার বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করব না এবং তাদের সাথেও থাকব না যারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মুক্ত করে দিলেন। ফিরে গিয়ে সে বলল, আমি সর্বোত্তম মানুষের নিকট হতে এসেছি।

আনাস রা. বলেন, জনৈক খৃস্টান ইসলাম গ্রহণ করল। সে সূরা বাকারা ও আলে ইমরান পড়তে পারত। পরবর্তীতে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাতেব হিসেবে কাজ করত। কিছুদিন পর আবার খ্রিস্টান হয়ে গেল এবং মানুষের কাছে বলে বেড়াতে লাগল, আমি যা লিখে দিয়েছি এর বেশি মুহাম্মদ কিছুই জানে না। তার মৃত্যু হলে লোকজন দাফন করে আসে, কিন্তু সকাল বেলা দেখতে পায় মাটি তাকে উপরে নিক্ষেপ করে রেখেছে। তারা বলাবলি করতে লাগল : এটা মুহাম্মদ এবং তার সাহাবীদের কাজ। আমরা চলে যাবার পর তারা তাকে মাটি খুঁড়ে বের করে উপরে নিক্ষেপ করেছে। দ্বিতীয় দিন খুব গভীর করে মাটিতে পুঁতে রেখে আসল, দ্বিতীয় দিনও মাটি তাকে বাইরে নিক্ষেপ করে। তখনও তারা আগের মতো কথা বলল। তৃতীয় দিন আরো গভীর করে দাফন করল, তৃতীয় দিনও মাটি তাকে বাইরে নিক্ষেপ করল, তাদের বুঝতে বাকি রইল না যে এটা মানুষের কাজ নয়। অতঃপর এভাবেই তাকে ফেলে দিল।

আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হেফাজত করার আরেকটি উদাহরণ :

কুরাইশরা সম্মিলিতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার চক্রান্ত করল। তারা একমত হল যে, সব গোত্র হতে একজন করে শক্তিশালী যুবক একত্রিত করে তাদের হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার দেয়া হবে। তারা সকলে একযোগে মুহাম্মাদের ওপর হামলা করে হত্যা করবে। ফলে সব গোত্রই সমানভাবে দোষী সাব্যস্ত

হবে। আর এভাবে আবদু মানাফের বংশধররা সকল আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার সাহস করবে না। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশ নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করেন এবং কাফিরদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করেন। সে রাতে তাঁকে নিজ বিছানায় ঘুমাতে বারণ করেন। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ আপনাকে হিজরত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আরো একটি উদাহরণ : হিজরতের পথে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সুরাকা ইবনে মালেক হতে হেফাজত করেছেন।

আরেকটি উদাহরণ : সাওর গুহায় কাফিরদের থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রক্ষা করা। আবু বকর সিদ্দিক রা. বলেছিলেন: হে আল্লাহর রাসূল! তাদের কেউ নিজের পায়ের দিকে তাকালেই আমাদের দেখে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আবু বকর! যে দুইজনের তৃতীয়জন হচ্ছেন আল্লাহ, তাদের ব্যাপারে তোমার কি ধারণা?

এত শত্রুতা, দুশমনি এবং রাতদিন ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা সীমালঙ্ঘনকারী, জালেম ও অত্যাচারী মক্কাবাসী হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হেফাজত করেছেন। এর জন্য আল্লাহ তাআলা সময়ে সময়ে বিভিন্ন মাধ্যম ও সাহায্যকারী তৈরি করে দিয়েছেন। যেমন নবুওয়তের শুরুতে চাচা আবু তালেবের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হেফাজত করা হয়েছে। আবু তালেব রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুব ভালোবাসতেন -মনের টানে, ধর্মের টানে নয়- তার মহব্বতের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কেউ কিছু বলতে সাহস পেত না। কারণ, আবু তালেব ছিলেন কুরাইশদের সকলের নিকট সম্মানিত ও অনুকরণীয় ব্যক্তি, আবার তাদের ধর্মের লোক। এ মিলের জন্য আবু তালেবকে তারা সমীহ ও সম্মান করত। অন্যথায় তিনি মুসলমান হলে তার ওপরও তারা চড়াও হত।

আবু তালেবের মৃত্যুর পর মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহকে অল্প হলেও কষ্ট দিতে পেরেছে। এরই মাঝে আল্লাহ তাআলা আনসারদের অন্তরে তার মহব্বত সৃষ্টি করে দেন। তারা তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন এবং তাকে মদীনায় নিয়ে যাওয়ার শপথ করেন। মদীনায় আল্লাহ তাআলা কালো-সাদা সকল প্রকার শত্রু হতে তাঁকে হেফাজত করেন। যখনই মুশরিক কিংবা আহলে কিতাবের কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, আল্লাহ সে ষড়যন্ত্র উল্টো তাদের জন্য কাল বানিয়ে দিয়েছেন।

ইসলাম প্রসারের সূচনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফে উপহাস, বিদ্রুপ আর অবজ্ঞার শিকার হয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। মুতইম ইবনে আদীর আশ্রয়ে মক্কায় অবস্থান করেন।

বয়কট, মিথ্যা ও কঠোরতায় ভরপুর পরিবেশে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লৌহকঠিন প্রত্যয়ে দৃঢ় করতে চাইলেন। তাই তাঁকে ইসরা ও মিরাজের মর্যাদায় ভূষিত করলেন। প্রত্যক্ষ করালেন বড় বড় নিদর্শন। অবগত করালেন স্বীয় ক্ষমতা ও কুদরতের বিশাল ব্যাপ্তি। যাতে তিনি কুফর ও কাফিরদের মুকাবিলায় আরো বেশি মনোবল অর্জনে সক্ষম হন।

ইসরা, রাতে মক্কার মসজিদুল হারাম থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদুল আকসা পর্যন্ত সফর এবং সে রাতেই ফিরে আসা।

মিরাজ, উর্ধ্বজগতে আরোহণ, নবীদের সাথে সাক্ষাৎ, অদৃশ্য জগৎ প্রত্যক্ষকরণ ইত্যাদি। এ সফরেই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হয়।

এ বিস্ময়কর ঘটনাটি মুসলমানদের ঈমান পরীক্ষার একটি উপলক্ষ্যে পরিণত হয়। এ ঘটনা শোনার পর কেউ কেউ ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। আবার কতিপয় লোক আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট গিয়ে বলে, আপনার সঙ্গী দাবি করছেন, আজ রাতে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফর করে আবার ফিরে এসেছেন। আবু বকর বললেন, তিনি কি এরূপ বলেছেন? তারা বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই বলেছেন। আবু বকর বললেন, তিনি যদি এমন বলে থাকেন, তবে সত্যই বলেছেন। তারা বলল, আপনি কি বিশ্বাস করেন, তিনি এক রাতে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গিয়ে ভোর হওয়ার আগেই ফিরে এসেছেন?

আবু বকর বললেন, হ্যাঁ, আমি তো (তাঁর ব্যাপারে) এর চেয়েও দূরের বিষয়ে বিশ্বাস করি। সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর দেয়া আসমানী সংবাদাদি বিশ্বাস করি।

আবু বকর রা. কে এজন্যই সিদ্দীক, তথা অধিক বিশ্বাসকারী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

কুরাইশদের পক্ষ হতে বিরুদ্ধাচরণ ও দাওয়াত প্রচার কার্যক্রমে বাঁধা প্রদানের কারণে তিনি অন্যান্য গোত্রাভিমুখী হলেন। তায়েফ থেকে ফিরে এসে বিভিন্ন মেলাতে নিজেকে পেশ করতে শুরু করলেন এবং নিপুণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে লোকদেরকে ইসলাম সম্বন্ধে বুঝাতে লাগলেন। ইসলাম ও আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর স্বার্থে তাদের নিকট আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করেন।

কেউ কেউ খুব ঘৃণা ও নিষ্ঠুরভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফিরিয়ে দিত। কেউ আবার সুন্দর ও শালীনভাবে না করে দিত। সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার করেছে, বনু হানীফা গোত্র- মিথ্যা নবুওয়তের দাবিদার মুসাইলামার দল।

যাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেকে পেশ করেছেন, তাদের মধ্যে ইয়াসরিবের আউস বংশীয় একটি দলও ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে কথা বললেন, তারা তাঁকে চিনতে পারল। এবং বুঝে গেল যে, তিনিই সেই নবী, ইহুদীরা যার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে থাকে। তারা নিজেদের মাঝে বলাবলি করল, আল্লাহর শপথ! এ নবীর আগমনের কথা-ই ইহুদীরা আমাদের বলে আসছে। আমরা তাদেরকে কোন মতেই আগে ঈমান গ্রহণ করার সুযোগ দেব না। তাদের ছয়জন তখনই ঈমান কবুল করল, আর এটি ছিল মদীনায় ইসলাম প্রচারের শুভ সূচনা। তাঁরা হলেন,

১. আসআদ বিন জুরারা

২. আউফ ইবনে হারেস

৩. রাফে বিন মালেক

৪. কুতবা বিন আমের বিন হাদীদা

৫. উকবা বিন আমের

৬. সাদ বিন রবি।

তাদের সকলেই পরবর্তী বছর পুনরায় আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বদেশ ফিরে গেলেন।

পরবর্তী বছর অর্থাৎ নবুওয়তের দ্বাদশতম বছর প্রথম আকাবার বায়আত অনুষ্ঠিত হয়। এতে বারোজন মদীনাবাসী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। আউস বংশের দশজন আর খাযরাজ বংশের দুইজন। এদের মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের ছয় জনের পাঁচজন বিদ্যমান ছিলেন। তারা সকলেই ঈমান গ্রহণ করলেন। শপথ করলেন, ঈমান ও সত্যবাদিতার জন্য উৎসর্গিত হবেন, শিরক ও অবাধ্যতা পরিত্যাগ করবেন, কল্যাণমূলক কাজ করবেন এবং কখনো মিথ্যা বলবেন না। এরপর সকলেই মদীনায় ফিরে গেলেন। আর এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার সর্বত্র ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিলেন। একটি ঘরও এমন ছিল না যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আলোচনা চর্চিত হয়নি।

প্রথম আকাবার পরের বছর, অর্থাৎ নবুওয়তের ত্রয়োদশতম বছর দ্বিতীয় আকাবার বায়আত অনুষ্ঠিত হয়। এ বায়আতে সত্তরজন পুরুষ ও দুই জন নারী

অংশ নেন এবং সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এ বলে বায়আত গ্রহণ করেন যে, উদ্যমতা ও আলস্য, উভয় অবস্থায় আনুগত্য করবেন, স্বচ্ছলতা ও দারিদ্র উভয় অবস্থায় আল্লাহর পথে খরচ করবেন, সৎ কাজের আদেশ দেবেন, অসৎ কাজ হতে বিরত রাখবেন, আল্লাহর ব্যাপারে ধিক্কার, নিন্দা ও কোনো ভয়-ভীতির পরওয়া করবেন না, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাহায্য করবেন, তার বিরুদ্ধে পরিচালিত যে কোন অনিষ্ট প্রতিহত করবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নিজেদের মধ্য হতে আমির হওয়ার যোগ্য বারজন লোককে নির্বাচিত করে দিতে বললেন। এরা সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা নিজ নিজ প্রভাব বলয়ে প্রচার করবে। তারা খাযরাজ থেকে নয়জন এবং আউস থেকে তিনজন নকিব মনোনীত করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, তোমরা নিজ নিজ গোত্রের জিম্মাদার, যেমন জিম্মাদার ছিলেন ঈসা ইবনে মারইয়ামের হাওয়ারীবৃন্দ। আর আমি আমার বংশের জিম্মাদার। তারা সকলেই মদীনাভিমুখে রওয়ানা হলেন। ইসলাম প্রসার লাভ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন।

এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের প্রাথমিক ভূমিকা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বত

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বত ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে মুসলমান তার মাধ্যমে হেদায়েতের আলো ও ঈমানের সন্ধান পেয়েছে, কুফর থেকে বের হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে, সে মুসলমান কিভাবে তাকে মহব্বত না করে পারে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার সন্তান, পিতা-মাতা এবং সকল মানুষ হতে অধিক প্রিয় হব।

বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বত তো নিজ সত্তার মহব্বতকেও অতিক্রম করে যেতে হবে। একদিন ওমর রা. রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন , ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি আমার নিকট আমি ব্যতীত, সব থেকে বেশি প্রিয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, ওমর, আমার প্রাণের মালিক আল্লাহর শপথ, আমার প্রতি তোমার মহব্বত তোমার নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি হতে হবে। ওমর বললেন : হ্যাঁ, এখন আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এখন হয়েছে, ওমর। অর্থাৎ এখন তুমি বুঝতে পেরেছ, অতঃপর যা ওয়াজিব তাই উচ্চারণ করেছ।

সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বতের দাবি করে। বেদআতি, প্রবৃত্তি পূজারি, কবর পূজারি, জাদুকর, ভেলকিবাজ ও জ্যোতিষীরা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বতের দাবি করে। গুনাহ্‌গার ও ফাসেক ব্যক্তিরাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বতের দাবিদার। তবে শুধু দাবিতেই সব কিছু হয় না, প্রমাণ দিতে হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বতের প্রমাণ হল. তার নির্দেশিত পথে চলা, নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার করা এবং শুধু তার দেখানো পদ্ধতি ও নিয়ম অনুসারে আল্লাহর ইবাদত করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কেবল অস্বীকারকারী ব্যতীত, লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, অস্বীকারকারী কে? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল। আর যে অবাধ্য হল, সে অস্বীকার করল।

ঈদে মিলাদুন্নবী, তাজিয়া, মর্সিয়া, তাঁর প্রশংসায় কবিতা রচনা ও এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বত প্রকাশ পায় না। বরং তার মহব্বত প্রকাশ পায় সুন্নতের ওপর আমল, তার আনীত শরীয়তের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, তার আদর্শ জীবিতকরণ, তার ওপর ও তার সুন্নতের ওপর উত্থাপিত অপবাদ প্রতিহত করণ, তাঁর দেয়া সংবাদকে সত্য জ্ঞানকরণ, তাঁর ব্যাপারে কথা বলার সময় অন্তরে শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা, তাঁর নাম শোনার সাথে সাথে দরূদ পড়া, তাঁর শরীয়তে নতুন কোন বিষয়ের প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করা অর্থাৎ যাবতীয় বেদআত প্রত্যাখ্যান করা, তাঁর সাহাবীদের মহব্বত করা ও তাদের পক্ষ নেয়া, তাদের ফযীলত সম্পর্কে অবগত হওয়া, তার সুন্নতের বিরুদ্ধাচরণকারী, তার শরীয়তের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী এবং যারা তাঁর দ্বীনকে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন, তাদের অবমাননাকারীকে ঘৃণা করা। এসব কিছুই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বতের অন্তর্ভুক্ত। যে এর বিরোধিতা করবে বিরোধিতা অনুপাতে দীন থেকে দূরে সরে যাবে।

উদাহরণত : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে আমার এ দ্বীনে ভিন্ন কিছুর আবিষ্কার করবে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে।

তিনি আরো বলেছেন, সাবধান! তোমরা দ্বীনে নতুন আবিষ্কৃত বিষয় হতে দূরে থাক। কারণ, প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত বস্তুই বিদআত।

বেদআতের ব্যাপারে এতো কঠোর বাণী সত্ত্বেও অনেকেই আছে, যারা আল্লাহর দ্বীনে নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করে- যা ধর্ম বলে স্বীকৃত নয়- বরং এসবকে তারা খুব ভাল ও উপকারী মনে করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বতের বস্তু হিসেবে জ্ঞান করে। অনেক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর মিথ্যা হাদীস তৈরি

করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামের সাথে যুক্ত করে দেয়। আর বলে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বার্থে মিথ্যা বলেছি, তাঁর বিরুদ্ধে নয়। এটা তাদের সবচেয়ে বড় গোমরাহী, বিচ্যুতি ও ভ্রষ্টতা। কারণ, আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ, তাদের মনগড়া মিথ্যাচারের মুখাপেক্ষী নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বতের আরো একটি আলামত হলঃ তার সাহাবাদের গালমন্দ না করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালমন্দ কর না। তোমাদের কেউ উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ সদকা করলেও তাদের খরচকৃত এক অঞ্জলি কিংবা তার অর্ধেকেরও সমান হবে না।

তা সত্ত্বেও এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাদের গালমন্দ করে। আবু বকর, ওমরকে অভিসম্পাত করে। পবিত্র কুরআনে আয়েশা রা. কে সতী-সাধ্বী ও নিষ্কলুষ ঘোষণা করার পরও তারা অপবাদ দেয়। আর এসব ক্ষেত্রেও তাদের হাস্যকর দাবি, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বত এবং আহলে বাইতের মহব্বতের কারণেই এমনটি করি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বতের আরেকটি আলামত : তাঁর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি না করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আমার প্রশংসায় সীমা ছাড়িয়ে যেয়ো না, যেমন খ্রিস্টান সম্প্রদায় মারয়াম পুত্র ঈসার ব্যাপারে করেছে। আমি আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে তাঁর রাসূল এবং বান্দাই বল।

এতদসত্ত্বেও এমন অনেক লোকের আগমন ঘটেছে, যারা ইহুদি খ্রিস্টানদের অনুসরণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন এমন গুণে গুণান্বিত করে, যা কেবল আল্লাহর সাথেই সামঞ্জস্যশীল।

উদাহরণস্বরূপঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট রিযিক চায়, তাঁর নিকট অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতা কামনা করে, আপদ-বিপদ ও ধ্বংস হতে মুক্তি চায়, আরো এমন কিছু প্রার্থনা করে, যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট প্রার্থনা করা যায় না। এরপরও তাদের ধারণা এগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বতের প্রমাণ। বাস্তবতা হচ্ছে, এগুলো মূর্খতা, শিরক ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরোধিতার আলামত।

নুবওয়তের বড় বড় আলামত

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়তের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, আল কুরআনুল কারিম। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত সকল আরব, অনারবদের সাথে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন যে, কারো সাধ্য থাকলে এর মত দ্বিতীয় আরেকটি পেশ করে দেখাও।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

আমি আমার বান্দার ওপর যে কিতাব নাযিল করেছি, তোমরা যদি এ ব্যাপারে সন্দিহান হও, তাহলে এর মতো একটি সূরা বানিয়ে পেশ করে দেখাও এবং এর জন্য আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সহযোগীদের একত্রিত করে চেষ্টা কর, যদি তোমরা নিজেদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকো।[৬৯]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন :

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

তারা কি এরূপ বলে যে, এটা সে নিজে তৈরি করে নিয়েছে? তুমি বলে দাও, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা এনে দেখাও এবং আল্লাহ ব্যতীত যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমরা স্বীয় দাবিতে সত্যবাদী হও।[৭০]

ইবনে জাওযি রহ. বলেন, আল কুরআনুল কারিম বহু কারণে অলৌকিক ও অসাধারণ। যেমন,

এক. সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তারিত বর্ণনা উভয় ক্ষেত্রেই ফাসাহাত-বালাগাতের (সাহিত্য ও অলংকরণ) সুন্দরতম ব্যঞ্জনা ও মনোজ্ঞতা। একই ঘটনা একবার বিস্তারিত, অন্যবার সংক্ষেপে বর্ণনার পরও উভয়ের ভাব ও উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে কোনো ব্যত্যয় ঘটে না।

দুই. আল কুরআন পদ্যও নয়, গদ্যও নয়, বরং এতে অনুসৃত হয়েছে সম্পূর্ণ এক ভিন্নতর পদ্ধতি। আর এ দুটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই পুরো আরব জাতির সাথে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। তারা অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে, অপারগতা প্রকাশ করেছে এবং কুরআনের অলৌকিকতার স্বীকৃতিও দিয়েছে।

ওলীদ ইবনে মুগিরা বলেছে, আল্লাহর শপথ! কুরআনের রয়েছে নিশ্চিত স্বাদ, এবং এর রয়েছে নিশ্চিত লাবণ্য।

---

[৬৯] সূরা বাকারা, আয়াত নং : ২৩
[৭০] সূরা ইউনুস, আয়াত নং : ৩৮

তিন. পূর্বেকার উম্মতদের সংবাদ এবং নবীদের ঘটনার উল্লেখ রয়েছে পবিত্র কুরআনে। যা আহলে কিতাবগণ জানত। অথচ যিনি এ কুরআন নিয়ে এসেছেন তিনি নিরক্ষর। লিখতেও জানতেন না, পড়তেও পারতেন না। জ্যোতির্বিদ্যাও তার জানা ছিল না।

আরবদের মধ্যে যারা পড়া লেখা জানত, শিক্ষিত লোকদের সাথে বসত, আল কুরআনের এ শিক্ষা তাদেরও আয়ত্বের বাইরে ছিল।

চার. অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংবাদ প্রদান, যা হুবহু সেভাবেই বাস্তবায়িত হয়েছে যেভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আর এটিই তার সত্যতাকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে। উদাহরণত: ইহুদীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে:

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

"যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে মৃত্যু কামনা কর।"[৭১]

এরপর বলা হয়েছে,

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا.

"তারা কক্ষনো মৃত্যু কামনা করবে না।"[৭২]

আরো ইরশাদ হয়েছে,

فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ

"তোমরা এর মতো একটি সূরা এনে দেখাও।"[৭৩]

এর পর বলা হয়েছে,

وَلَنْ تَفْعَلُوا.

"তারা এটা করে দেখাতে পারবে না।"[৭৪]

আর বাস্তবেও তারা করে দেখাতে পারেনি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ.

---

[৭১] সূরা বাকারা, আয়াত নং : ৯৪
[৭২] সূরা বাকারা, আয়াত নং : ৯৫
[৭৩] সূরা বাকারা, আয়াত নং : ২৩
[৭৪] সূরা বাকারা, আয়াত নং : ২৪

তুমি কাফিরদের বলে দাও, তোমরা অবশ্যই পরাস্ত হবে। আর বাস্তবেও তারা পরাস্ত হয়েছে।[৭৫]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায়, তোমরা নিরাপদে মসজিদুল হারামে অবশ্যই প্রবেশ করবে।

আবু লাহাবের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, অনতিবিলম্বে সে লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে, লাকড়ি বহনকারী তার স্ত্রীও। তার গলায় থাকবে পাকানো রশি। এর অর্থ তারা উভয়ে কাফির অবস্থায় মারা যাবে, আর সে অবস্থাতেই তারা মারা গিয়েছিল।

পাঁচ. আল কুরআন মতদ্বৈততা ও বৈপরীত্য হতে পবিত্র। আল্লাহ তাআলা বলেন, যদি এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তারা এতে অবশ্যই অনেক বৈপরীত্য পেত। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি, আমিই এর সংরক্ষণ করব।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ, وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيَّ, فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ القِيَامَةِ.

"আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক নবীকে এমন অনেক নিদের্শন প্রদান করা হয়েছে যা দেখে মানুষ তাদের ওপর ঈমান এনেছে। আর আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়েছেন, ওহী, যা আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছে। আমি আশাবাদী, কিয়ামতের দিন তাদের সকলের চেয়ে আমার অনুসারী বেশি হবে।"[৭৬]

ইবনে আকীল বলেছেন, আল- কুরআনের একটি মাত্র আয়াতের ব্যাপারেও এ পর্যন্ত কেউ এমন অভিযোগ আনতে পারেনি যে এটি অন্য কোনো গ্রন্থ হতে সংকলিত বা অন্য কারো রচিত। এটিও আল কুরআনের অলৌকিকত্বের একটি বিরাট প্রমাণ। কারণ, এক মানুষ অন্য মানুষ থেকে তথ্য নিয়ে লিখে থাকে।

---

[৭৫] সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং : ১২

[৭৬] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ৪৯৮১

যেমন, মুতানাব্বির ব্যাপারে কথিত যে তিনি বুহতারী থেকে তথ্য নিয়ে রচনা করেছেন।[৭৭]

ইবনে জাওযী রহ. বলেন : আমি দুটি অপূর্ব অর্থ বের করেছি।

এক : অন্য সকল নবীদের মোজেজা, তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে গিয়েছে। বর্তমান যুগে যদি কোনো নাস্তিক এ প্রশ্ন করে বসে : মুহাম্মদ ও মুসা যে সত্য নবী তার প্রমাণ কি?

তাকে যদি এর উত্তরে বলা হয় : মুহাম্মদের নবুওয়তের প্রমাণ চাঁদ দুই টুকরা করা, আর মুসার নবুওয়তের প্রমাণ সমুদ্র চিরে পথের সৃষ্টি করা। তখন তা অস্বীকার করতে পারে এটা অসম্ভব।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা এ কুরআনকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়তের প্রমাণ তথা মোজেজা বানিয়েছেন যা চিরকাল বিদ্যমান থাকবে। এ কুরআন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পরও তার সত্যতার ঘোষণা করবে। রাসূল হলেন, পূর্ববর্তী নবীদের সত্যায়নকারী ও তাদের নবুওয়তের দলিল। তিনি সকল নবীর নবুওয়ত স্বীকার করেছেন এবং তাদের সত্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

দুই : রাসূলুল্লাহ ﷺ আহলে কিতাব তথা ইহুদী খ্রিস্টানদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, তোমাদের নিকট রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিচয় বিদ্যমান আছে।

মদীনাভিমুখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরত

সাহাবাদের ওপর যখন কাফিরদের নিপীড়নের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, রাসূলুল্লাহ তাদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। তিনি দেখলেন এবং নিশ্চিত হলেন যে, ইসলামের দাওয়াত মদীনায় ব্যাপকতা লাভ করেছে। মুহাজিরদের অভ্যর্থনা ও আশ্রয়দানের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে এর মাটি ও মানুষ।

সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশে হিজরতের প্রস্তুতি নিলেন। একের পর এক দলে দলে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন।

বাকি থাকলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বকর ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। এবং আরো কিছু সাহাবি যাদেরকে কাফিররা জোরপূর্বক আটকে রেখেছিল।

এদিকে কুরাইশদের মধ্যেও জানাজানি হয়ে গেল, মুহাম্মাদ ﷺ একটি সুরক্ষিত এলাকায় হিজরত করতে যাচ্ছেন। এতে ইসলাম দুনিয়াব্যাপি ছড়িয়ে পড়ার

৭৭

সম্ভাবনায় তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। তাই, সকলে মিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার পরিকল্পনা করল।

রাতে মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যার পরিকল্পনা করল আর আল্লাহ তা স্বীয় রাসূলকে জানিয়ে দিলেন। এবং হিজরতের নির্দেশ দিলেন, আর সে রাতে নিজ বিছানায় ঘুমোতে বারণ করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর বিছানায় তাঁরই চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমাতে নির্দেশ দিলেন এবং তার কাছে রক্ষিত মানুষের আমানত ফেরত দিতে বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ মত আলী রা. ঘরের ভেতর ঘুমিয়ে রইলেন। আর দরজার বাইরে অনেকগুলো তলোয়ার উন্মুক্ত হয়ে থাকল।

হত্যার জন্য জড়ো হওয়া কাফিরদের ব্যূহ ভেদ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে গেলেন। আল্লাহ তাদের চক্ষু অন্ধ করে দিলেন, এভাবেই তারা লাঞ্ছিত হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মাথার ওপর একমুষ্টি মাটি নিক্ষেপ করে আবু বকর রা. এর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এবং রাতেই তারা খুব দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর রা. চলতে চলতে সাওর গুহায় এসে পৌঁছালেন। কাফিরদের অনুসন্ধানে ভাটা পড়ার আগ পর্যন্ত তাঁরা সেখানেই অবস্থান করেছেন।

এদিকে কুরাইশরা যখন তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে বলে নিশ্চিত হল, তাদের উত্তেজনা ও প্রতিশোধস্পৃহা বেড়ে গেল। তারা মক্কার চতুর্দিকে অনুসন্ধানকারীদের পাঠিয়ে দিল। পুরস্কার ঘোষণা করল, যে মুহাম্মদকে নিয়ে আসতে পারবে কিংবা তার সন্ধান দিতে পারবে, তাকে একশত উট পুরষ্কার দেয়া হবে। তার তালাশে তারা চারিদিক ছড়িয়ে পড়ল এবং তালাশ করতে করতে সাওর গুহার দ্বারপ্রান্তে চলে গেল। কিন্তু আল্লাহ তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। স্বীয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাদের ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা করলেন। আবু বকর বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা নিজ পায়ের দিকে তাকালেই আমাদের দেখে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, আবু বকর, সে দুইজন সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাদের তৃতীয়জন হচ্ছেন আল্লাহ ?

আগে থেকে ঠিক করে রাখা রাহবার তিন দিন পর তাদের কাছে আসল, অতঃপর সকলে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন।

রাস্তায় খোযায়ী বংশের উম্মে মাবাদ নামক এক নারীর তাঁবুর দেখা পেলেন। সে একটি বকরী দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বরকত লাভে ধন্য হয়েছে। ঘটনাটি

এমন, তার একটি বকরী ছিল, যাতে এক ফোঁটা দুধও অবশিষ্ট ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বকরীটি দোহন করার অনুমতি নিলেন, সাথে সাথে তার স্তন দুধে ভরে গেল। সে দুধ রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাকে পান করালেন এবং তার সাথে যারা ছিল তারাও পান করল। সবশেষে তিনি নিজে পান করলেন। এরপর আবারো দোহন করে পাত্র পূর্ণ করে পথ চলা শুরু করলেন।

এদিকে সুরাকা বিন মালেক জানতে পারল, রাসূলুল্লাহ ﷺ সমুদ্র পথ ধরে মদীনার দিকে রওয়ানা হয়েছেন। কুরাইশ কর্তৃক ঘোষিত পুরস্কারের প্রতি তার খুব লোভ জন্মেছিল। সে তীর ধনুক নিয়ে গোড়ার পিঠে চড়ে তাদের সন্ধানে রওয়ানা করল। এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটবর্তী হয়ে গেল, নবীজী আল্লাহর নিকট দুআ করলেন ফলে তার ঘোড়ার সামনের পা দুটি মাটির নীচে দেবে গেল। সে বুঝে গেল এমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বদ দোয়ার কারণেই হয়েছে, রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রাপ্ত। সুতরাং তার কোনও ক্ষতি করা যাবে না। তাই সে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিল এবং এ মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল যে, আপনার অনুসন্ধানে আসা প্রতিটি দলকে আমি ফিরিয়ে দেব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন, ফলে তার ঘোড়ার পা মাটি থেকে বেরিয়ে আসল। ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্ধানে ধাবমান প্রতিটি দলকে সে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিল।

এদিকে আনসারগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের প্রতীক্ষায় প্রতিদিন মদীনার প্রবেশ পথে এসে জড়ো হতেন। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার পর গরম বেড়ে গেলে তারা বাড়ি ফিরে যেতেন।

নবুওয়তের তেরতম বছরের শুরুর দিকে রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখ, সোমবার দিন হঠাৎ একটি ধ্বনি ভেসে এল রাসূল আসছেন, রাসূল আসছেন। এরই সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন বার্তা ও আল্লাহু আকবার শব্দের ধ্বনি গুঞ্জরিত হতে লাগল। সকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইস্তিকবাল জানানোর জন্যে বের হয়ে পড়ল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কোবায় অবতরণ করলেন এবং সেখানে একটি মসজিদের ভিত্তি রাখলেন। এটাই ইসলামের প্রথম মসজিদ।

এখানে কয়েক দিন অবস্থান করে রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা হলেন। রাস্তায় জুমার সালাতের সময় হয়ে গেলে সাথে থাকা মুসলমানদের নিয়ে জুমার সালাত আদায় করলেন। এটাই ইসলামে সর্বপ্রথম জুমার সালাত। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দক্ষিণ দিক দিয়ে মদীনায় প্রবেশ করলেন আর তখন থেকেই তার নামকরণ হয়

মদীনাতুন্নাবী বা নবীর শহর। মদীনার বুকে বইতে শুরু করল প্রশান্তি ও আত্মতৃপ্তির সুবাতাস। ইসলামের সুরক্ষিত এক দুর্গে পরিণত হল আল-মদীনা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যসহ পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সব দিকেই ইসলামের দাওয়াত ও আল-কুরআনের বাণী ছড়িয়ে দেয়ার মানসে বেরিয়ে পড়ল খাঁটি ঈমানদার আল্লাহর অকুতোভয় সৈনিক, এক ঝাঁক দাওয়াত-কর্মী।

ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় প্রবেশ করলেন আর মদীনার অধিবাসীরা তাকে খুব আগ্রহ ও প্রফুল্ল চিত্তে বরণ করে নিলেন। যে কোন বাড়ি অতিক্রম করার সময় বাড়ির মালিক উটের লাগাম ধরে তার মেহমান হতে আবদার জানাতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অপারগতা প্রকাশ করে বলতেন, আমার উটের পথ ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর পক্ষ হতে আদিষ্ট। উট চলতে চলতে মসজিদের নিকট আসতেই পা গেড়ে বসে পড়ল। অতঃপর উঠে দাঁড়াল, একটু সামনে গিয়ে পুনরায় আগের জায়গায় এসে বসে পড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মামাদের -বনী নাজ্জারের- মেহমান হলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমার আত্মীয়ের মধ্যে কার বাড়ি অতি নিকটে? আবু আইয়ূব আনসারী রা. বললেন, আমার, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ ﷺ তার বাড়িতে মেহমান হলেন।

মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নিলেন। যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উট পা গেড়ে বসে পড়েছিল সেখানেই মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত হল। জায়গাটি ছিল মূলত: দুই ইয়াতিম কিশোরের। রাসূলুল্লাহ ﷺ জমিটি কিনে নিলেন। সকলের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও মসজিদ নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করলেন। অতঃপর মসজিদের পাশে উম্মুহাতুল মু'মিনীনদের জন্য ঘর নির্মাণ করলেন। নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে, আবু আইয়ূব রা. এর বাড়ি ছেড়ে এখানে চলে এলেন। সালাতের সময় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য আজানের অনুমোদন ও তার সূচনা করলেন।

অতঃপর মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করলেন। তাদের নব্বই জনের মাঝে এ সম্পর্ক কায়েম করলেন। (এর অর্ধেক ছিল আনসার, বাকি অর্ধেক মুহাজির) তারা একে অপরের যেমন ছিলেন সহযোগী, তেমনি ছিলেন হিতাকাঙ্ক্ষী। মৃত্যুর পরে নিকট আত্মীয়ের ন্যায় তাদের মধ্যেও উত্তরাধিকার বিধান চালু ছিল। বদর যুদ্ধ পর্যন্ত এ নীতি বলবৎ থাকে। যখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন :

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا.

"আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মু'মিন ও মুহাজিরদের চেয়ে যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরের নিকটতর, তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাও তাহলে করতে পার। এটি কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।"[৭৮]

তখন থেকে এ বিধান রহিত হয়ে যায়। আত্মীয়দের ভেতর-ই বণ্টন হতে থাকে উত্তরাধিকার-সূত্রে-প্রাপ্ত, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় বসবাসকারী ইহুদিদের সাথে সন্ধি স্থাপন করলেন। তাদের আলেম ও পণ্ডিত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম খুব দ্রুত এবং সর্বপ্রথম ইসলামে দীক্ষিত হন। বাকিরা কাফির অবস্থায় থেকে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় বসবাসরত মুহাজির, আনসার এবং ইহুদিদের মাঝে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার একটি সনদ তৈরি করলেন। যার গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কিছু ধারা কতিপয় সিরাত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। যার প্রধান প্রধান অংশ নিম্নে তুলে ধরা হল।

- অন্য সকল জাতি ও গোত্রের বিপরীতে মুহাজির ও আনসার মুসলমানগণ এক জাতি ও এক বংশের ন্যায়।
- মুসলমানরা নিজেদের ভেতর ঋণগ্রস্ত ও অধিক সন্তনাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্য করতে কার্পণ্য করবে না।
- মুসলমানগণ সকলে মিলে অত্যাচারী, অবাধ্য. দুষ্কৃতিপ্রবণ ও নিজেদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে প্রতিহত করবে। যদিও সে তাদের কারো সন্তান হয়।
- মুসলমান অপর মুসলমানকে কাফেরের পরিবর্তে হত্যা করবে না। মুসলমানের বিপরীতে কোন কাফিরকে সাহায্যও করবে না।

[৭৮] সূরা আহযাব : ৬

- আল্লাহর নিরাপত্তা সবার জন্য সমান। একজন নিম্নস্তরের মুসলমানও যে কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারবে। মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই।
- ইহুদীদের যে আমাদের অনুসরণ করবে, আমরা তাকে সাহায্য করব, তার জন্য উদারতা দেখাব। তার ওপর জুলুম করব না, তার বিপরীতে অন্য কাউকে সাহায্যও করব না।
- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সময় কোন মুসলমান এককভাবে কাউকে নিরাপত্তা দেবে না। যাকে নিরাপত্তা দেয়া প্রয়োজন সম্মিলিতভাবে ইনসাফের ভিত্তিতে দেয়া হবে।
- মুসলমানদের ভেতর কোন মতবিরোধের সৃষ্টি হলে, তার ফয়সালা একমাত্র আল্লাহ এবং তার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর সোপর্দ করা হবে।
- আউফ বংশের ইহুদিরা মুসলমানদের স্বজাতি। তারা তাদের ধর্ম পালন করবে, মুসলমানগণ নিজেদের ধর্ম পালন করবে। তাদের এবং তাদের গোলামের ব্যাপারে একই নীতি প্রযোজ্য। তবে, যে নিজের ওপর অবিচার করবে, অবাধ্য হবে, সে নিজকে এবং নিজ পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।
- ইহুদিদের যারা বন্ধু, তারাও তাদের মত। তাদের কাউকে মুহাম্মাদের অনুমতি ব্যতীত মদীনা হতে বহিষ্কার করা যাবে না।
- প্রতিবেশীও নিজের মত। কেউ কারো ওপর জুলুম করবে না। কেউ কারো অবাধ্য কিংবা ক্ষতির কারণ হবে না।
- অনুমতি ব্যতীত কারো সংরক্ষিত অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

এ ধরনের আরো কিছু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। যার দ্বারা তিনি মদীনায় বসবাসরত বিভিন্ন বংশ ও গোত্রের মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন। মুসলমান ও ইসলামি রাষ্ট্র তথা মদীনাকে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মাহর ভেতর ঐক্যের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বিচার ফয়সালা ও বিধানের ক্ষেত্রে সকলকে রুজু করতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট। বিশেষ করে যখন কোন ঝগড়া কিংবা বিরোধের সৃষ্টি হয়।

এ সনদে প্রতিটি মানুষের আকীদা, ইবাদত ও নিরাপত্তার অধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। নিশ্চিত করা হয়েছে সকল মানুষের মৌলিক অধিকারে সাম্যতাও।

একজন চিন্তাশীল গবেষক মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক প্রাথমিক মূলনীতিই এতে খুঁজে পাবেন। যারা সাধারণত: মানবাধিকার বিষয়ে সোচ্চার কণ্ঠ তারা অবশ্যই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই মানবাধিকারের গোড়াপত্তন করেছেন এবং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী তা ঢেলে সাজিয়েছেন। বরং মদীনার এ সনদই ইনসাফপূর্ণ মানবাধিকার ও প্রতারণামূলক মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্যের মানদণ্ড।

বদর যুদ্ধ

হিজরতের দ্বিতীয় বছর রমযান মাসে সংঘটিত হয় বদর যুদ্ধ। এর কারণ, সিরিয়া হতে কুরাইশের বিশাল এক বণিক দল বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র এবং রসদ নিয়ে মক্কায় আসছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের পথ রুদ্ধ করতে বের হলেন। তাঁর সাথে ছিল তিন শত তেরো জনের একটি দল। কুরাইশ দলের নেতৃত্বে ছিল আবু সুফিয়ান। সে খুব সজাগ ও সতর্কতার সাথে পথ চলছিল। যার সাথেই দেখা হত, মুসলমানদের গতিবিধি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত। এক সময় মুসলমানদের বের হওয়ার সংবাদও জেনে গেল। তখন সে বদরের খুব নিকটবর্তী জায়গায় ছিল। সংবাদ পেয়ে সাথে সাথে দিক পরিবর্তন করে ফেলল, পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে সমুদ্রের তীর ধরে চলতে লাগল। আর বদরের সংকটপূর্ণ রাস্তা ত্যাগ করল। অতঃপর এ সংবাদ দিয়ে এক ব্যক্তিকে মক্কায় প্রেরণ করল যে, তোমাদের সম্পদ হুমকির মুখে, মুসলমানরা আক্রমণের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পিছু পিছু ধাওয়া করছে।

এ সংবাদ মক্কায় ছড়িয়ে পড়লে সকলেই আবু সুফিয়ানকে সাহায্যের জন্য বিপুল উৎসাহে এগিয়ে আসল। আবু লাহাব ছাড়া মক্কার নেতৃবর্গের কেউ বাকি ছিল না। আশ পাশের সকল গোত্রের লোকজনকে তারা সাথে নিয়ে নিল, শুধু আদি বংশের লোক ছাড়া কুরাইশ অঞ্চলের সকলেই তাতে অংশগ্রহণ করল।

তারা জুহফা নামক স্থানে পৌঁছে জানতে পারল, আবু সুফিয়ান নিরাপদ অবস্থানে চলে গিয়েছে এবং তাদের মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য বলেছে।

সকলে মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিল, কিন্তু বাধ সাধল আবু জাহল। সে সবাইকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করল। বনু জুহরা আবু জাহলের ডাকে সাড়া না দিয়ে চলে গেল, তাদের সংখ্যা ছিল তিন শত। বাকিরা সামনে অগ্রসর হতে লাগল, তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। অবশেষে বদর প্রান্তরকে বেষ্টিত করে-রাখা পাহাড়ের পিছনে বদরের বাইরে প্রশস্ত ময়দানে তারা অবস্থান নিল।

াসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। তাদের মধ্যে যুদ্ধ এবং াল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গিত হওয়ার বিপুল আগ্রহ ও দৃঢ়তা লক্ষ্য করলেন তিনি। াদের এ ভূমিকা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুব খুশি করল। তিনি তাদেরকে বললেন, তামরা অগ্রসর হও, এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ তাআলা আমাকে দুটি লের যে কোন একটির ওপর জয়ী করার ওয়াদা করেছেন। আল্লাহর শপথ! ামার মনে হচ্ছে, আমি তাদের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করছি।

াসূলুল্লাহ ﷺ সামনে অগ্রসর হয়ে মদীনার নিকটবর্তী বদর প্রান্তরে অবতরণ রলেন। হুবাব ইবনে মুনজির রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আরো অগ্রসর হয়ে শত্রু ক্ষের অতি নিকটে পানির স্থানে অবস্থান নেয়ার জন্য পরামর্শ দিল। উদ্দেশ্য সলমানগণ নিজ নিজ পাত্রে পানি জমা করে রাখবে এবং কূপের অবশিষ্ট পানি ষ্ট করে দেবে। ফলে শত্রু পক্ষ পানিবিহীন রয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হুবাব ান মুনজিরের পরামর্শ অনুসারে কাজ করলেন।

চিত্র : বদর যুদ্ধের সৈন্যবিন্যাস

রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের সতের তারিখ জুমা রাতে তথা বদরের রাতে সালাতে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহকে ডাকলেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার সাহায্য প্রার্থনার করলেন, আর এভাবেই তিনি সারা রাত পার করলেন।

মুসনাদে আলী ইবনে আবী তালেব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি লক্ষ্য করলাম, আমরা সকলেই ঘুমিয়ে আছি, শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি একটি গাছের নিচে সালাত আদায় করে কেঁদে কেঁদে রাত পার করলেন।

মুসনাদে আরো আছে, তিনি বলেছেন : বদরের রাতের বৃষ্টিতে আমাদেরকে কাঁপুনিতে পেয়ে বসল। আমরা সকলে বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য গাছের নীচে এবং তাঁবুতে আশ্রয় নিলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত কাটালেন আল্লাহকে ডেকে ডেকে। তিনি বলছিলেন, আল্লাহ! তুমি যদি এ জামাতকে ধ্বংস করে দাও, তবে এ যমীনে তোমার আর ইবাদত করা হবে না। সকাল হলে, তিনি সবাইকে ডেকে তুললেন : সালাত, হে আল্লাহর বান্দারা। সবাই গাছের নিচ এবং তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসল, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে সালাত আদায় করলেন এবং সকলকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী এবং মু'মিনদেরকে নুসরত ও সৈন্য দিয়ে সহযোগিতা করলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

"যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট ফরিয়াদ করছিলে, তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন- আমি তোমাদেরকে পর পর এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করব। আল্লাহর এমনটি করার উদ্দেশ্য, তোমাদেরকে সুসংবাদ দান করা এবং এর দ্বারা যাতে তোমাদের অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে। সাহায্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ হতেই। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৭৯]

মহান আল্লাহ তাআলা আরো বলেন :

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

[৭৯] সূরা আনফাল:৯-১০

"তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বদরে অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল, সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর, আশা করি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।"[৮০]

তিনি আরো বলেন :

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"তোমরা তাদেরকে হত্যা করোনি, বরং আল্লাহ তাদের হত্যা করেছেন। যখন তুমি নিক্ষেপ করেছ, তখন তুমি নিক্ষেপ করনি, নিক্ষেপ করেছেন আল্লাহ এবং যাতে আল্লাহ মু'মিনদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে উত্তমরূপে পরীক্ষা করার জন্য। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"[৮১]

মল্ল যুদ্ধের মাধ্যমে কিতাল শুরু হল। হামজা রা. হত্যা করলেন শাইবা বিন রাবীআকে, আলী রা. হত্যা করলেন ওলীদ বিন উতবাকে। আর কাফিরদের উতবা বিন রাবীআ এবং মুসলমানদের উবাইদা বিন হারিস আহত হলেন।

অতঃপর মূল যুদ্ধ শুরু হল এবং ক্রমেই প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের দিয়ে মুসলমানদের সাহায্য করলেন। তারা মুসলমানদের হয়ে যুদ্ধ করল এবং তাদের অন্তরে সাহস জোগাল। সামান্য সময়ের ব্যবধানে কাফিররা পরাস্ত হয়ে গেল এবং পিঠ ফিরে পালাতে লাগল। মুসলমানগণ তাদের হত্যা আর বন্দী করার উদ্দেশ্যে ধাওয়া করল।

সত্তরজন কাফির নিহত হল। যাদের মধ্যে উতবা, শাইবা, ওলীদ বিন উতবা, উমাইয়া বিন খালফ, তার ছেলে আলী, হানযালা বিন আবু সুফিয়ান এবং আবু জাহলও ছিল এবং আরো সত্তরজন গ্রেফতার হল।

বদর যুদ্ধের ফলাফল : মুসলমানদের মনোবল এবং শক্তি বৃদ্ধি পেল। তারা মদীনা ও তার আশ পাশে ভীতি সঞ্চারক দলে পরিণত হল। আল্লাহর ওপর তাদের আস্থা আরো বৃদ্ধি পেল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, আল্লাহ তাআলা তার মু'মিন বান্দাদের সাহায্য করেন, যদিও তারা সংখ্যায় কম থাকে। এর দ্বারা মুসলমানদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও অর্জিত হল। তারা জেনে গেল, কীভাবে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়, কীভাবে তাদের ঘেরাও করতে হয়, কীভাবে তাদেরকে যুদ্ধের সহায়ক বস্তু হতে বঞ্চিত করা যায় এবং কীভাবে তাদের মুকাবিলায় টিকে থেকে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা যায়।

---

[৮০] সূরা আলে ইমরান-১২৩

[৮১] সূরা আনফাল, আয়াত নং : ১৭

উহুদ যুদ্ধ

হিজরতের তৃতীয় বছর শাওয়াল মাসে উহুদ যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। যেহেতু বদর যুদ্ধে কুরাইশদের বড় বড় নেতৃবৃন্দ নিহত হয়েছে এবং তারা এমনভাবে পরাভূত হয়েছে, যেমনটি এর পূর্বে আর কখনো ঘটেনি, তাই তারা প্রতিশোধ নেয়ার সংকল্প করল এবং হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে চাইল।

আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করে বিরাট এক বাহিনী তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলল। সে কুরাইশ এবং পার্শ্ববর্তী শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে প্রায় তিন হাজারের এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করল। তারা নিজ স্ত্রীদেরও সাথে নিয়ে নিল, যাতে যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করতে না পারে এবং কমপক্ষে তাদের স্ত্রীদের রক্ষার্থে ময়দানে টিকে থাকে। অতঃপর তাদের নিয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হল এবং মদীনার নিকটবর্তী উহুদ পাহাড়ের নিকট অবস্থান নিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করলেন। মদীনায়ই অবস্থান নেবেন, না তাদের মোকাবেলায় বেরিয়ে যাবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনা থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা ছিল না। তাঁর ইচ্ছা ছিল মদীনায় থেকে রক্ষণাত্মক ভূমিকায় যুদ্ধ করা। অর্থাৎ শত্রুরা মদীনা আক্রমণ করলে প্রতিরোধ করা হবে। কিন্তু বেশ কয়েকজন বড় বড় সাহাবি বের হয়ে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাজার সাহাবির একটি দল নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। দিবসটি ছিল শুক্রবার। যখন মদীনা ও উহুদের মাঝামাঝি পৌঁছলেন, আব্দুল্লাহ বিন উবাই-মুনাফিক- এক তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে ফিরে গেল, এবং বলল, আপনি আমার বিরোধিতা করেন এবং অন্যের কথা শোনেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম বের হয়ে উহুদের এক উপত্যকায় অবতরণ করলেন। উহুদকে তিনি পেছনে রেখে লোকদের তাঁর আদেশ পাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ হতে বিরত থাকতে বললেন। শনিবার সকালে সাত শত সৈন্য নিয়ে তিনি কিতালের সিদ্ধান্ত নিলেন যাদের মাত্র পঞ্চাশ জন ছিল অশ্বারোহী।

চিত্র : উহুদ যুদ্ধের সৈন্যবিন্যাস

াহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে তীরন্দাজদের যোর সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ ামীর নিযুক্ত করে আদেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন নিজ অবস্থানে দৃঢ় থাকে ত্রুরা মুসলিম সৈন্যদের উঠিয়ে নিয়ে যেতে দেখলেও যেন কেউ নিজ স্থা ্যাগ না করে। তারা ছিল সৈন্যবাহিনীর পেছন দিকে তাই তিনি তাদেরবে ত্রুর প্রতি তীর নিক্ষেপ করে তাদের প্রতিহত করার নির্দেশও দিয়েছিলেন যাতে ত্রুপক্ষ পেছন দিয়ে মুসলমানদের আঘাত করতে না পারে।

দ্ধ শুরু হল, দিনের প্রথমাংশেই মুসলমানদের বিজয় সাধিত হয়ে গেল। আ শরিকরা পরাজিত হয়ে তাদের নারীদের সাথে গিয়ে মিলিত হল। তীরন্দাজ

সৈন্যবাহিনী শত্রুপক্ষের পরাজয় দেখে, রাসূলুল্লাহ তাদের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা ভুলে গিয়ে সেখান থেকে চলে আসলেন। তারা বলল, হে আমাদের কওম! গনীমত। দলনেতা তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা সেদিকে কর্তপাত করেনি। তারা ভাবল, মুশরিকদের আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। তাই তারা গনীমত সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে নেমে এল। ফলে গিরিপথ অরক্ষিত হয়ে পড়ল। এদিকে মুশরিকদের অশ্বারোহী দল আবার ফিরে এসে দেখল তীরন্দাজরা তাদের অবস্থানে নেই এবং গিরিপথ ফাঁকা। তখন তারা সে দিক দিয়ে আগে বাড়ল। তাদের পেছনের সৈন্যরা এসে তাদের সাথে মিলিত হলে তারা আরো শক্তিশালী হল। এরপর মুসলমানদের ঘেরাও করে তীব্র আক্রমণ চালাল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শহীদের মর্যাদা দান করলেন। সাহাবাগণ ময়দান ছেড়ে পেছনে হটে গেলেন। এ সুযোগে মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অতি নিকটে পৌঁছে গেল এবং তাঁর পবিত্র চেহারা আহত করে দিল। তাঁর ডান চোয়ালের দাঁত ভেঙে ফেলল। মাথার হেলমেট ভেঙে চুরমার করল। একটি পাথর দিয়ে আঘাত করে তাঁর শরীরের এক পাশে প্রচণ্ড ক্ষতের সৃষ্টি করল। আবু আমের নামক জনৈক পাপিষ্ঠ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য খনন করা একটি গর্তে তিনি পড়ে গেলেন। আলী রা. এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ধরলেন আর তালহা বিন উবায়দুল্লাহ রাসূলকে কোলে তুলে নিলেন। মুসআব বিন উমায়ের তার সামনে শহীদ হয়ে গেলেন। এ সময় যুদ্ধের ঝাণ্ডা আলী বিন আবু তালেবের হাতে তুলে দেয়া হল। অন্যদিকে শিরস্ত্রাণের দুটি আংটা তাঁর চেহারায় বিদ্ধ হয়ে গেল। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ আংটাদ্বয় টেনে বের করলেন এবং আবু সাঈদ খুদরী রা. এর পিতা মালেক বিন সিনান তার গণ্ডদেশ থেকে রক্ত চুষে নিলেন।

আবু দুজানা রা. স্বীয় পিঠ ঢাল বানিয়ে রাসূল স.-কে হেফাযত করলেন। বিরামহীনভাবে তীর তার দেহে বিদ্ধ হতে থাকল, আর তিনি নিজ স্থানে স্থির দাঁড়িয়ে থাকলেন। সেদিন কাতাদা বিন নোমান চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাকে নবী করিম ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসা হলে নবীজী তার চোখের ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন। তার চক্ষুদ্বয় আগের থেকেও সুস্থ ও সুন্দর চোখে পরিণত হয়ে গেল।

এদিকে শয়তান চিৎকার করে ঘোষণা করল, মুহাম্মদ নিহত হয়ে গিয়েছেন। এতে অনেক মুসলমানের মনোবল ভেঙে গেল। অনেকে যুদ্ধ ছেড়ে চলে গেলেন। আল্লাহর সিদ্ধান্ত যা ছিল তাই হলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁকে হেলমেটের নিচে প্রথমে চিনতে পারেন কাব বিন মালেক। তাঁকে দেখে তিনি চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, হে মুসলমানবৃন্দ! সুসংবাদ গ্রহণ কর, এই তো রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি ইশারা করে তাকে চুপ থাকতে বললেন। মুসলমানেরা তার পাশে এসে জমায়েত হলেন এবং তাঁর সাথে একই গিরিপথে অবতরণ করলেন। তাদের মধ্যে আবু বকর, ওমর, আলী, হারেছ বিন ছাম্মাহসহ আরো অনেকে ছিলেন। অতঃপর তারা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলে উবাই বিন খালফ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেল। সে নবী ﷺ-কে হত্যার উদ্দেশ্যে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এদিকে আসছিল। রাসূলুল্লাহ তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করলেন। বর্শা তার কণ্ঠাস্থিতে আঘাত করল, ফলে সে পরাজিত হয়ে নিজ কওমের দিকে পালিয়ে গেল এবং মক্কায় ফেরার পথে মারা গেল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ পবিত্র চেহারা থেকে রক্ত ধুয়ে ফেললেন। যখমের কারণে বসে সালাত আদায় করলেন। হানযালাহ রা. এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তিনি স্ত্রী সহবাসের কারণে অপবিত্র অবস্থায় ছিলেন। যুদ্ধের ঘোষণা শুনে গোসলের পূর্বেই যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তাঁকে ফেরেশ্‌তারা গোসল দিয়েছেন। মুসলমানরা মুশরিকদের পতাকাবাহীকে হত্যা করেছিল। উম্মে ইমারা-নাসাবিয়্যা বিনতে কাব আল মাযিনিয়্যা কঠিন যুদ্ধ করেছিলেন। তাকে আঘাত করেছিল আমর বিন কামিআহ। তিনি খুবই মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন।

মুসলমানদের মধ্যে যারা শহীদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল সত্তর জন। আর মুশরিকদের মধ্যে নিহত হয়েছিল তেইশ জন। কুরাইশরা মুসলমানদের লাশ মারাত্মকভাবে বিকৃত করেছিল।

শাহাদাত বরণকারী মুসলমানদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন।

উহুদ যুদ্ধের শিক্ষা

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. যাদুল মাআদ গ্রন্থে উহুদ যুদ্ধ থেকে শিক্ষণীয় অনেকগুলো চমৎকার বিষয় উল্লেখ করেছেন। পাঠকবৃন্দের জ্ঞাতার্থে আমরা তার সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরছি।

প্রথমত: মু'মিনদেরকে অবাধ্যতা, বিবাদ ও নেতার আনুগত্য না করার মন্দ পরিণতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া, তাদের ওপর যে বিপদ ও মুসীবত আপতিত হয়েছে তার একমাত্র কারণ পারস্পরিক মতভেদ ও অবাধ্যতা।

এ বিষয়টিই পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ.

"আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, এমনকি তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা পছন্দ কর তা তোমাদেরকে দেখাবার পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কতক ইহকাল কামনা করছিল এবং কতক পরকাল। অতঃপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে তাদের হতে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। আর আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।"[৮২]

যখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবাধ্যতা, তার সাথে মতবিরোধ ও ব্যর্থতার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করলেন, তখন থেকে তাঁরা অধিক সতর্ক ও চৈতন্যসম্পন্ন হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয়তঃ রাসূলগণ ও তাঁদের অনুসারীগণের ব্যাপারে আল্লাহর হিকমত ও রীতি এই চলে এসেছে যে, তাদেরকে একবার বিজয় দেবেন তো আরেকবার মাহরূম করবেন, তবে শেষ পরিণতি তাদের পক্ষেই যাবে। কেননা, তারা যদি সর্বদা বিজয় লাভ করতে থাকে, তবে তাদের সাথে মুসলিম ও অমুসলিম একসাথে মিশে যাবে। অতঃপর সত্যবাদীকে অসত্যবাদী থেকে আলাদা করা দুষ্কর হবে।

তৃতীয়তঃ সত্যিকার মু'মিন, মিথ্যাবাদী মুনাফিক থেকে পৃথক হয়ে যাবে। কেননা, মুসলমানদেরকে বদর দিবসে যখন বিজয় দান করা হল, প্রকৃত অর্থে যারা ইসলামে প্রবেশ করেনি, তারাও তাদের সাথে বাহ্যিকভাবে মিশে গেল। তাই আল্লাহর হিকমত এই ছিল যে, তার বান্দাদেরকে কষ্ট-যাতনা ভোগ করাবেন, যা মু'মিন থেকে মুনাফিককে পৃথক করে দেবে। মুনাফিকরা উহুদ যুদ্ধে তাদের মাথা উঁচু করেছিল এবং যা তারা গোপন করত তা বলে ফেলেছিল। মু'মিনরা বুঝতে পারলেন তাদের নিজের ঘরেই শত্রু রয়েছে। অতঃপর তারা তাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হলেন এবং তাদের বিষয়ে সতর্ক হয়ে গেলেন।

---

[৮২] সূরা আলে ইমরান: ১৫২

চতুর্থত: যারা আল্লাহর বন্ধু ও তাঁর বাহিনীভুক্ত তাদের দাসত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা। সুখে ও দুঃখে, পছন্দে ও অপছন্দে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সফলতা অর্জনে ও শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হওয়া তথা সর্বাবস্থায় তাদের দাসত্ব বজায় থাকে কি-না তা পরখ করে নেওয়া। সুতরাং পছন্দ ও অপছন্দ সর্ব অবস্থায় যদি মুমিনরা আনুগত্য ও দাসত্বের ওপর দৃঢ় থাকতে পারে তবেই তারা প্রকৃত অর্থে আল্লাহর বান্দা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে।

পঞ্চমত: যদি আল্লাহ তাআলা সর্বদা তাদের সাহায্য করেন এবং সর্বস্থানে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে তাদেরকে বিজয় দান করেন এবং সব সময় শত্রুদের বিপক্ষে তাদের প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা দান করেন তাহলে তাদের অন্তর অবাধ্যতা ও অহংকারে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। সুতরাং বান্দাদের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখতে তাদের সুখ-দুঃখ, স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা ইত্যাদি দিয়ে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

ষষ্ঠত: যখন আল্লাহ তাআলা তাদের জয়-পরাজয় ও বিপর্যয় দিয়ে পরীক্ষা করবেন তখন তারা দীনতা-হীনতা ও বশ্যতা স্বীকার করে অনুগত হয়ে থাকবে এবং তার নিকট সাহায্য ও ইজ্জত প্রার্থনা করবে।

সপ্তমত: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর মু'মিন বান্দাদের জন্য অনেক মর্যাদার স্তর প্রস্তুত করে রেখেছেন। যেখানে তারা বিপদ-আপদ ও পরীক্ষায় আপতিত হওয়া ব্যতীত শুধুমাত্র তাদের আমল দিয়ে পৌঁছতে সক্ষম হয় না। ফলে তিনি তাদেরকে বিপদ-আপদ ও পরীক্ষায় নিপতিত করেন এবং সেগুলো তাকে সেই মর্যাদার স্তরে পৌঁছে দেয়।

অষ্টমত: সুস্থতা, স্বচ্ছলতা, মদদপুষ্টতা ও পরমুখাপেক্ষিতা মুক্ত থাকার কারণে মানবাত্মা ক্রমান্বয়ে অবাধ্য ও দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। আর এটি এমন এক রোগ যা মানুষকে তার প্রতিপালক আল্লাহ ও পরকালের দিকে পৌঁছানোর লক্ষ্যে আমল ও চেষ্টা-সাধনা করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যদি মানুষকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে চান তিনি তাকে নানাবিধ বিপদ ও পরীক্ষায় পতিত করেন যেটি তার সেই রোগের ঔষধ হিসেবে কাজ করে। তখন সেই বিপদ ও পরীক্ষাটি তার জন্যে সেই ডাক্তারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় যে অসুস্থ ব্যক্তিকে তিক্ত ঔষধ সেবন করায় এবং কষ্টদায়ক ধমনিসমূহ কেটে দেয়। উদ্দেশ্য রোগের উৎসগুলো বের করে সুস্থ করে তোলা। আল্লাহ তাআলা যদি মানুষকে তার নিজ অবস্থার ওপর ছেড়ে দেন তাহলে তার প্রবৃত্তি তার ওপর বিজয়ী হবে এবং শেষ পর্যন্ত তাতেই তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে।

নবমত: শাহাদাত বরণ আল্লাহ্ তাআলার নিকট তাঁর ওলীদেরকে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দেয়। শাহাদাতবরণকারী তাঁর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। সিদ্দীকিয়্যতের স্তরের পরই শাহাদাতের স্থান। আর শত্রু চাপিয়ে দিয়ে বিপদ আরোপিত করা ব্যতীত ঐ স্তরে পৌঁছার আর কোন রাস্তা নেই।

দশমত: আল্লাহ্ যখন তাঁর শত্রুদের ধ্বংস করতে চান তখন তিনি তাদের দিয়ে এমনসব কাজ সম্পাদন করান যা তাদের ধ্বংসকে অনিবার্য করে তোলে। কুফরির পর ধ্বংসের মারাত্মক কারণসমূহ: যেমন- অবাধ্যতা, সীমালঙ্ঘন, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের কষ্ট প্রদান, তাদের সাথে যুদ্ধ করা ও তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার ইত্যাদি। এর মাধ্যমে তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত ওলী-আউলিয়ারা তাদের গুনাহ্ ক্ষমা করিয়ে পরিশোধিত হয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় আর শত্রুরা তাদের ধ্বংসের উপকরণ আরো বৃদ্ধি করে নেয়।

আহযাব যুদ্ধ/খন্দক যুদ্ধ

বিশুদ্ধ মতানুসারে পরিখার যুদ্ধ নামে পরিচিত আহযাব যুদ্ধ, হিজরী পঞ্চম বছরের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়।

যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে বলা হয়, হিজরী চতুর্থ বছরে নবী করিম ﷺ তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করার অপরাধে বনী নাযীরের ইহুদীদের মদীনা থেকে দেশান্তরিত করে দেন। তখন তাদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক মক্কায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে কুরাইশদের যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে জড় করতে থাকে এবং যুদ্ধে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। প্ররোচণার এক পর্যায়ে কুরাইশরা তাদের ডাকে সাড়া দেয় এবং সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করার ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছে। এরপর তারা গাতফান ও বনী সুলাইমের নিকট যায়, তারাও তাদের ডাকে সাড়া দেয়। এক এক করে আরবের বিভিন্ন গোত্রের নিকট গিয়ে নবীজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান জানাতে থাকে।

অবশেষে কুরাইশরা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে বের হয়। যোদ্ধা সংখ্যা ছিল চার হাজার। সাথে ছিল তিন শত ঘোড়া ও এক হাজার পাঁচ শত উট।

মাররুয্ যাহরান নামক স্থানে বনু সুলাইম থেকে সাত শত লোকের একটি বিশাল কাফেলা তাদের সাথে মিলিত হয়। তাদের দেখাদেখি আসাদ গোত্রের লোকেরাও বের হয়ে আসে। ফাযারাহ গোত্র থেকে এক হাজার, আশজা গোত্র থেকে চার শত, ও বনু মুররাহ থেকে আরো চার শত লোক তাদের সাথে যোগ দেয়। পরিশেষে বিভিন্ন গোত্র থেকে মোট দশ হাজার লোকের এক বিশাল দল

পরিখার দ্বার প্রান্তে এসে একত্রিত হয়। আর এরাই হল আহযাব তথা বিভিন্ন দল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাদের জড় হবার সংবাদ পৌঁছলে তিনি মদীনাবাসীকে পরামর্শের জন্য আহ্বান করলেন। সালমান ফার্সী রা. পরিখা খনন করার পরামর্শ দিলেন। যার মাধ্যমে শত্রুবাহিনী ও মদীনার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। নবী করিম ﷺ তার পরামর্শ মোতাবেক পরিখা খনন করার আদেশ দিলেন। মুসলমানরা বিলম্ব না করে খনন কাজ শুরু করে দিল। নবী করিম ﷺ নিজেও খননে অংশ নিলেন। পরিখা সালআ পাহাড়ের সামনের দিকে খনন করা হয়েছিল। এমনভাবে যে, পাহাড়টি ছিল মুসলমানদের পেছনে আর পরিখাটি তাদের ও কাফিরদের সামনে।
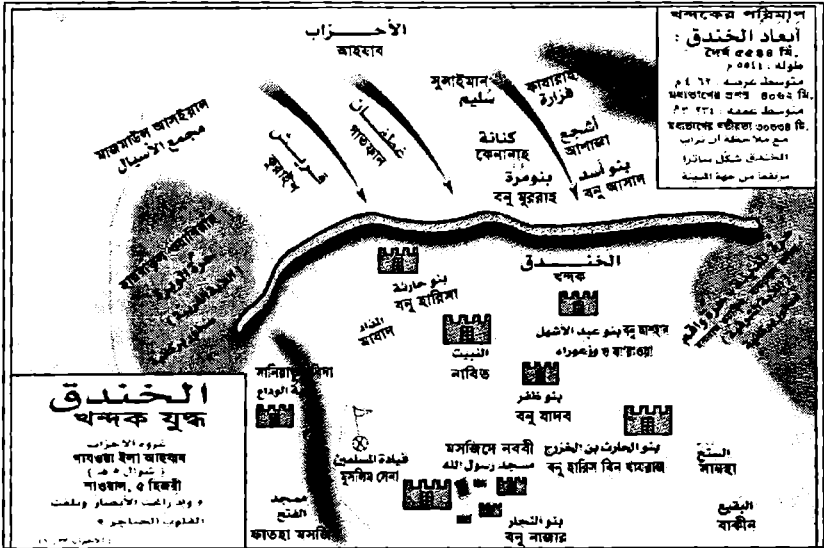
চিত্র : আহযাব যুদ্ধ/খন্দক যুদ্ধ

ছয় দিনে খনন কাজ শেষ হল। অতঃপর নবী করিম # তিন হাজার মুসলমানের বিশাল কাফেলা নিয়ে পেছনের পাহাড় ও সামনের পরিখার মাধ্যমে নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন।

নবীজী মহিলা ও শিশু বাচ্চাদের নিরাপদ আশ্রয়ে রাখার নির্দেশ করলেন। সে মতে তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা হল।

হুয়াই বিন আখতাব বনী কুরাইযার নিকট গেল, তাদের সাথে নবী করিম ﷺ-এর সন্ধি ছিল। এ দুষ্ট লোকটি তাদেরকে সন্ধি ভাঙ্গতে প্ররোচিত করতে

থাকল। এক পর্যায় তারা সন্ধি ভঙ্গ করে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কাফিরদের সাথে মিলে গেল। যার কারণে মুসলমানদের বিপদ আরো বেড়ে গেল এবং তাদের নিফাকি প্রকাশ পেয়ে গেল। এ দিকে বনী হারেসার কিছু লোক মদীনায় ফিরে যেতে নবী করিম ﷺ-এর নিকট অনুমতি চেয়ে বলল :

إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا .

"আমাদের ঘর-বাড়ি খালি। অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা।"[৮৩]

বনী সালামাও পলায়নের ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা উভয় দলকেই দৃঢ়তা দান করেন।

বারা বিন আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাদেরকে পরিখা খনন করার নির্দেশ দিলেন, একটি গর্তে প্রকাণ্ড ও শক্ত একটি পাথর আমরা দেখতে পেলাম। অনেকগুলো কুড়ালও তাকে কিছু করতে পারছিল না। তখন আমরা নবীজীকে বিষয়টি জানালাম। নবীজী আসলেন এবং পাথরটি দেখে তাঁর কাপড় পাথরের ওপর রাখলেন। এরপর কুড়াল নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে পাথরে একটি আঘাত করে এক তৃতীয়াংশ ভেঙে ফেললেন আর বললেন, আল্লাহু আকবার, আমাকে শামের চাবি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় আমি এ মুহূর্তে শামের লাল অট্টালিকাগুলো দেখতে পাচ্ছি।

এরপর দ্বিতীয় আঘাত করলেন এবং আরেক তৃতীয়াংশ ভেঙে ফেললেন। আর বললেন, আল্লাহু আকবার, আমাকে পারস্যের চাবিগুলো দেয়া হয়েছে, আল্লাহর শপথ নিশ্চয় আমি মাদায়েনের সাদা অট্টালিকাগুলো দেখতে পাচ্ছি। অত:পর তৃতীয় আঘাত করলেন এবং বললেন, বিসমিল্লাহ, ফলে পাথরের অবশিষ্ট অংশটিও ভেঙে গেল। এরপর বললেন, আল্লাহু আকবার, আমাকে ইয়েমেনের চাবিগুলো দেয়া হয়েছে, আল্লাহর শপথ, আমি এ মুহূর্তে এখান থেকে সানআর ফটকগুলো দেখতে পাচ্ছি।

মুশরিকরা রাসূলুল্লাহকে এক মাস পযন্ত অবরোধ করে রেখেছিল, তবে আল্লাহ তাআলা তাদের ও মুসলমানদের মাঝে পরিখার মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেয়ার কারণে কোন যুদ্ধ-লড়াই হয়নি।

---

[৮৩] সূরা আহযাব, আয়াত নং : ১৩

ইতিহাসবেত্তারা বলেন : খন্দকের দিন ভীতি খুব মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল, লোকজন ভীত হয়ে পড়েছিল, সন্তান-সন্তুতি ও ধন-সম্পদের ওপর আশঙ্কা হচ্ছিল। আর মুশরিকরা তাদের ঘোড়া প্রবেশ করানোর জন্যে গিরিপথ খুঁজছিল। বরং তাদের একটি দল পরিখা পাড়িও দিয়ে দিয়েছিল। তাদের মাঝে আমর বিন ওদ্দ নামক ব্যক্তিও ছিল। সে এসে মল্লযুদ্ধের জন্যে ডাকাডাকি করতে লাগল। তার বয়স ছিল সত্তর বছর। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মুকাবিলা করলেন এবং পরাভূত করে হত্যা করলেন।

সকাল হল, মুসলমানগণ একটি বিশাল ব্যাটেলিয়ান প্রস্তুত করলেন যাদের মাঝে খালেদ বিন ওয়ালীদও ছিলেন, তারা রাত অবধি যুদ্ধ করলেন। এদিকে নবীজী যোহর ও আসর সালাত আদায় করতে পারেননি। তিনি বললেন, তারা আমাদেরকে আসর সালাত হতে বিরত রেখেছে, আল্লাহ তাআলা তাদের ঘর ও কবরগুলো আগুন দ্বারা ভর্তি করে দেবেন।

অত:পর আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে একটি কাজের মাধ্যমে শত্রুদের অপমানিত করলেন এবং তাদের সংঘবদ্ধতাকে বিক্ষিপ্ত করে দিলেন। এটি এভাবে সম্ভব হয়েছে যে, নুয়াইম ইবনে মাসউদ মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু ইহুদী ও মুশরিকদের কেউ বিষয়টি জানতে পারেনি। তিনি তাদের এ অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদের মাঝে ঢুকে গেলেন এবং কুরাইশ ও কুরাইযার মাঝে ভয় সৃষ্টি করে দিলেন।

অত:পর প্রচণ্ড বাতাস বইতে লাগল। আবু সুফিয়ান তার সাথিদের বলল, তোমরা নিজ দেশে নেই, উটের পায়ের তলা ও ক্ষুর ধ্বংস হতে চলেছে, কুরাইযা বিরোধিতা করছে এবং কেমন বাতাস বয়ে যাচ্ছে তাতো দেখতেই পাচ্ছ। চল ফিরে যাই, আমি চললাম।

সেই যুদ্ধে মুশরিকদের তিনজন এবং মুসলমানদের ছয় জন নিহত হয়েছে।

ইসলামে যুদ্ধকে বৈধ করা হল কেন?

রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষদেরকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে ইসলামে প্রবেশ করানোর জন্য সাথে তলোয়ার নিয়ে চলতেন না। বরং আল-কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় এ নীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ.

দ্বীনের ব্যাপারে কোন বাধ্য-বাধকতা নেই।[৮৪]

অন্য জায়গায় বলেছেন :

তুমি কি মানুষদের বাধ্য করবে, যাতে তারা মু'মিন হয়ে যায়?

অন্যত্র বলেছেন :

তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অভ্যন্তরীণ কিংবা বহিরাগত আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রের মুকাবিলায় হাত গুটিয়ে বসে থাকবে ইসলাম কোনো পদক্ষেপ নিবে না। বরং আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অনুমতি দিয়েছেন, তারা নিজেদের ওপর যে কোনো হামলা প্রতিহত করবে এবং তাদের ওপর আরোপিত যুলম-নির্যাতনের প্রতিশোধ নিবে, তবে এক্ষেত্রে কোন রূপ অন্যায় ও বাড়াবাড়ি করা যাবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন : **যে তোমাদের ওপর অন্যায়ভাবে যুলম করবে, তোমরাও তার থেকে বদলা নাও, যে পরিমাণ সে তোমাদের ওপর যুলম করেছে।**

আল্লাহ আরো বলেছেন : **যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের সাথে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। তবে তোমরা সীমা ছাড়িয়ে যাবে না।**

অন্যত্র বলেছেন : **তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ করো।**

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে যুদ্ধ বৈধ করার মূল দিক হল আত্মরক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ প্রতিহত করা। মুসলিম জাতিকে শত্রুপক্ষের যুলম, নির্যাতন ও অত্যাচার হতে হেফাযত করা। আমরা ইসলামী যুদ্ধের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিলে এ সত্যটি ভালো করে বুঝতে পারব। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর যখন মক্কার কুরাইশদের নির্যাতন-নিপীড়ন সীমা ছাড়িয়ে গেল, এমনকি তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত বাকি থাকল না, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিরুপায় হয়ে হিজরত করেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুলমের সূচনা তাদের পক্ষ থেকেই শুরু হয়েছে। তারা অন্যায়ভাবে মুসলমানদেরকে নিজ বাড়ি-ঘর ছাড়তে বাধ্য করেছে। তাই হিজরতের পর আল্লাহ তাআলা মুসলমান মুহাজিরদেরকে মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করেন।

---

[৮৪] সূরা বাকারা, আয়াত নং : ২৫৬

আল্লাহ তাআলা বলেন : (যুদ্ধের) অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ, তাদের প্রতি যুলম করা হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদের অন্যায়ভাবে স্বীয় ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। তাদের অপরাধ, তারা বলে : আমাদের রব আল্লাহ।

আর এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার কুরাইশ ব্যতীত আরবের অন্য কারো সাথে যুদ্ধে জড়িত হননি।

যখন মক্কার কুরাইশদের সাথে আরবের অন্যান্য মুশরিকরাও শরিক হল এবং সকলে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল, তখন আল্লাহ তাআলা সকল মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন। ইরশাদ হয়েছে :

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً.

"আর তোমরা সকল মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যেমন তারা সকলে মিলে তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে লড়াই করে।"[৮৫]

তখন থেকেই আহলে কিতাব ছাড়া সকল মুশরিকদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে জিহাদের হুকুম নাযিল হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু না বলা অবধি, আমাকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর যদি তারা এ বাক্য পড়ে নেয়, তাহলে স্বীয় রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ করে নিল। তবে আল্লাহর বিধান অনুসারে কোনো কিছু জরুরি হলে ভিন্ন কথা। আর তাদের হিসাব আল্লাহর ওপর।

যখন মুসলমানগণ ইহুদীদের পক্ষ হতে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি ও সন্ধির ব্যাপারে খিয়ানত দেখতে পেলেন, যেমন তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার কাফিরদের সাহায্য করেছে তখন, আল্লাহ তাআলা তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, তুমি যদি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে খিয়ানতের (বিশ্বাস ভঙ্গ) আশঙ্কা কর তবে তোমার চুক্তিকেও সমানভাবে তাদের সামনে নিক্ষেপ করবে (বাতিল করবে) নিশ্চয় আল্লাহ খিয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সত্য ধর্ম গ্রহণ না করবে কিংবা অবনত হয়ে জিযিয়া কর দিতে সম্মত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। যাতে মুসলমানরা তাদের দিক হতে নিরাপদ হয়ে যায়।

---

[৮৫] সূরা তাওবা, আয়াত নং : ৩৬

অনুরূপভাবে নাসারাদের বিরুদ্ধেও রাসূলুল্লাহ ﷺ আগ-বেড়ে যুদ্ধ শুরু করেননি। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন : হোদায়বিয়ার সন্ধির আগ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি। হোদায়বিয়ার সন্ধির পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর নিকট পত্র প্রেরণ করেন। কায়সার, কিসরা, মুকাওকিস ও নাজ্জাশীসহ সিরিয়া ও প্রাচ্যের আরব বাদশাহদের সকলের নিকটই পত্র প্রেরণ করেন।

খ্রিস্টান ও অন্যান্য জাতি হতে অনেক ভাগ্যবান লোক ইসলামে দীক্ষিত হল। সিরিয়ায় নাসারারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয় এবং তারই ধারাবাহিকতায় তাদের নেতৃবর্গের মধ্য হতে ইসলাম গ্রহণকারী কতিপয় মুসলমানকে মাআন নামক স্থানে নিয়ে হত্যা করে।

সুতরাং খ্রিস্টানরাই প্রথমে মুসলমানদের ওপর চড়াও হয় এবং তাদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দূতদের মানুষদেরকে আহ্বান করার জন্য পাঠিয়েছেন, যাতে তারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। কোনরূপ বল প্রয়োগের জন্য নয়। আর তারাও ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে একজন ব্যক্তিকেও বাধ্য করেননি।

উপরিউক্ত বর্ণনার আলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুদ্ধগুলো নিম্নের কয়েকটি ধারায় বিভক্ত ছিল :

১. মক্কার কুরাইশদের আক্রমকারী হিসাবে চিহ্নিত করণ। কেননা, তারাই সর্বপ্রথম মুসলমানদের ওপর সীমা লঙ্ঘন করে। ফলে মুসলমানদের জন্যও যুদ্ধ বৈধ ঘোষণা করা হয়।

২. মুসলমানগণ ইহুদীদের খিয়ানত ও মক্কার কাফিরদের সাথে তাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি দেখে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়।

৩. আরবের কোনো গোত্র মুসলমানদের ওপর হামলা করলে কিংবা মক্কার কাফিরদের সাহায্য করলে, কেবল তখনই মুসলমানরা ইসলাম গ্রহণ করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন।

৪. খ্রিস্টানসহ অন্যান্য কিতাবী সম্প্রদায়ের যারাই শত্রুতার সূচনা করেছে তাদের সাথেই যুদ্ধ করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে কিংবা জিযিয়া দিতে সম্মত হয়েছে।

৫. যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করবে, তার জীবন ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যাবে। তবে ইসলামের বিধান মতে হলে ভিন্ন কথা। ইসলাম তার পূর্বের সব অপরাধ মুছে দেবে।

হুদাইবিয়ার সন্ধি

হিজরতের ষষ্ঠ বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ উমরার জন্য সকল সাহাবিকে প্রস্তুত হতে বললেন। তারা খুব দ্রুত প্রস্তুতি নিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাজার চার শত সাহাবিসহ রওয়ানা করলেন। সাথে ছিল মুসাফিরের ন্যায় সামান্য হাতিয়ার, অর্থাৎ কোষ বন্ধ তলোয়ার। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার সাথিরা হাদি (উমরার পশু) সাথে নিয়ে নিয়েছিলেন। কুরাইশরা এ ব্যাপারে অবগত হলে, হারাম শরীফ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গতিরোধ করার জন্য বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতুল খাওফ আদায় করলেন। অতঃপর মক্কার নিকটবর্তী হলেন। রাসূলকে নিয়ে তাঁর উট বসে পড়ল। মুসলমানরা বলতে লাগলেন : কাসওয়া চলতে চাচ্ছে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কাসওয়া বসে পড়েনি, বরং তাকে আটকে রেখেছেন সে সত্তা যিনি হস্তীবাহিনীকে আটকে দিয়েছিলেন। আজকে তারা আমার কাছে যে চুক্তিই করতে চাইবে, আমি তাদের সে চুক্তিতেই সই করব, যদি তাতে বাইতুল্লাহর সম্মান ও মর্যাদা বিদ্যমান থাকে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উট হাঁকালেন. উট উঠে দাঁড়াল এবং হুদাইবিয়ার নিকট সামান্য পানি বিশিষ্ট একটি কূপের নিকট অবতরণ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি তীর বের করে, তার ভেতর গেড়ে দিলেন, সাথে সাথে পানি বের হতে লাগল। সকলে কূপ থেকে হাতের আজলা ভরে পানি পান করলেন।

চিত্র : হুদায়বিদায় প্রান্তর

বুদাইল ফিরে গিয়ে কুরাইশদের সংবাদ দিলে তারা উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফীকে প্রেরণ করল। তার সাথেও বুদাইলের ন্যায় কথাবার্তা হল। সাহাবায়ে কেরাম তাকে এমন কিছু আচরণ দেখাল, যার দ্বারা সে বুঝতে পারে যে, মুসলমানগণ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কেমন মহব্বত করে এবং কীভাবে তার অনুসরণ ও আদেশ পালন করতে প্রস্তুত আছে। সে ফিরে গিয়ে মক্কার কাফিরদের এ সম্পর্কে বর্ণনা দিল। অতঃপর তারা কেনানা বংশের জনৈক হুলাইছ বিন আলকামাকে পাঠাল, তারপর মিকরাজ ইবনে হাফসকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথে কথা বলছিলেন। এমতাবস্থায় সুহাইল ইবনে আমর আসলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখে বললেন, তোমাদের জন্যে তোমাদের ব্যাপারটি সহজ করা হয়েছে।

অতঃপর দু পক্ষের মাঝে সন্ধি চুক্তি সম্পন্ন হল। অথচ সেদিন যদি মুসলমানগণ শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন তাহলে তারাই জয়ী হতেন। কিন্তু তারা বাইতুল্লাহর সম্মান যথাযথভাবে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

সন্ধি চুক্তি ছিল নিম্নরূপ :

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বছর ফিরে যাবেন, তবে শর্ত হচ্ছে, আগামী বছর মক্কায় আসতে পারবে এবং সেখানে তিন দিন অবস্থান করতে পারবে।

২. উভয় পক্ষের মাঝে দশ বছর পর্যন্ত কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে না।

৩. মুসলমানদের কাছে তাদের কেউ আসলে তারা তাকে ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকবে, যদিও সে মুসলমান হয়। কিন্তু তাদের কাছে কোনো মুসলমান ফিরে গেলে, তারা তাকে ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকবে না।

৪. কুরাইশ ব্যতীত অন্য যে কেউ মুহাম্মাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে চাইলে, হতে পারবে। তদ্রুপ মক্কার কুরাইশদের সাথে কেউ চুক্তিবদ্ধ হতে চাইলে, তারাও তা পারবে।

হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলাফল

সন্ধির সময় মুসলমানদের অনেকেই এ চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। তাদের মনে হয়েছিল, এ সন্ধিচুক্তি একপেশে এবং চুক্তির ধারাগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে। কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মুসলমানগণ এর উত্তম ফলাফল পেতে শুরু করেছিলেন। নিম্নে তা করা হল,

১. কুরাইশদের পক্ষ হতে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। কারণ, দুপক্ষ এক সমান না হলে চুক্তি হয় না। এ স্বীকৃতির একটি বিরাট প্রভাব অন্যান্য গোত্রের মধ্যেও পড়েছে।

২. মুশরিক ও মুনাফিকদের অন্তরে ভীতির সঞ্চারণ। তাদের অনেকেই ইসলামের বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। মক্কার কতিপয় নেতৃবর্গের খুব দ্রুত ইসলাম গ্রহণের কারণে বিষয়টি তাদের নিকট আরো স্পষ্ট হয়। যেমন খালেদ বিন ওলীদ ও আমর ইবনুল আস রা.।

৩. যুদ্ধবিরতি ইসলামের প্রচার-প্রসার ও লোকদের এ সম্পর্কে অবহিত করার একটি বিরাট সুযোগ এনে দেয়, যা অনেক লোক ও গোত্রকে ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্র তৈরি করে।

৪. মুসলমানগণ কুরাইশদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হল। ফলে ইহুদীসহ ইসলামের অন্যান্য শত্রুদের ব্যাপারে পূর্ণ মনোযোগ দেয়া সহজ হয়ে গেল। আর খায়বর যুদ্ধ হুদায়বিয়ার সন্ধির পরই সংঘটিত হয়েছে।

৫. সন্ধির আলাপ-আলোচনা কুরাইশের অনেক মিত্রদেরকে মুসলমানদের সম্পর্কে জানার এবং তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার আগ্রহ তৈরি করে দিয়েছে। উদাহরণতঃ হুলাইস বিন আলকামা যখন মুসলমানদের দেখল যে, তারা তালবিয়া পড়ছে, সে নিজ সাথীদের কাছে গিয়ে বলল: আমি তাদের অনেক হাদী দেখেছি, যাদের কালাদা পরানো হয়েছে এবং হজের আলামত দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, তাদেরকে বাইতুল্লাহ থেকে ফেরানো যাবে না।

৬. হুদাইবিয়ার সন্ধি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুতার যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। যা ছিল আরব উপদ্বীপের বাইরে ইসলামের দাওয়াত কার্য পরিচালনার নতুন পদক্ষেপ।

৭. এ সন্ধি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রোম, পারস্য ও কিবতী রাজন্যবর্গের নিকট ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে চিঠি-পত্র পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

৮. হুদাইবিয়ার এ সন্ধি ছিল মূলতঃ মক্কা বিজয়ের পটভূমিকা।

ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থান

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় এসে সেখানকার ইহুদীদের সাথে একটি শান্তিচুক্তি করেছিলেন। যে, কেউ কারো ওপর আক্রমণ করবে না, জুলুম করবে না। কিন্তু তারা অতি দ্রুতই সে চুক্তি ভঙ্গ করল এবং

তাদের পূর্ব খ্যাতি অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করে দিল।

বনী কায়নুকার ইহুদীদের একটি ষড়যন্ত্রের উদাহরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের নিয়ে বদর যুদ্ধে ব্যস্ত। এ সুযোগে তাদের এক লম্পট জনৈকা মুসলিম নারীকে উত্ত্যক্ত করল। বাজারে মানুষের সামনে তার কাপড় খুলে ফেলল। মহিলা চিৎকার করে উঠলেন। একজন মুসলমান তার সাহায্যে ছুটে এসে ইহুদীকে হত্যা করলেন। এরপর সকল ইহুদী মিলে তাকেও হত্যা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বদর থেকে ফিরে এসে তাদের ডাকলেন এবং সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। প্রতিউত্তরে তারা খুব কড়া ভাষা ব্যবহার করল। বাড়াবাড়ির এক পর্যায়ে চুক্তি পত্রটি ফেরত পাঠাল এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ঘেরাও করলেন। যখন তারা দেখল, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বাঁচার আর কোনো উপায় নেই, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরজি পেশ করে বলল: আমাদের ছেড়ে দিন। বিনিময়ে আমাদের সকল সম্পদ আপনাকে দিয়ে দেব। আর আমরা স্ত্রী সন্তানাদি নিয়ে এখান থেকে চলে যাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তাদেরকে মদীনা হতে তাড়িয়ে দিলেন। মুসলমানরা তাদের দুর্গ হতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও সম্পদ সংগ্রহ করল।

ইহুদী বনী নযীরও সম্পাদিত শান্তিচুক্তি ভঙ্গ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। হিজরতের চতুর্থ বছর একটি দিয়ত তথা রক্ত বিনিময় ব্যাপারে সাহায্যের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী নযীর গোত্রে গমন করেন। তিনি সেখানে গিয়ে একটি দেয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে বসলেন, আর এ সুযোগে তারা তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করল। এভাবে যে, আমর বিন জাহ্হাশ একটি চাক্কি নিয়ে দেয়ালের ওপর উঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর ছেড়ে দেবে।

এ দিকে আকাশ হতে আল্লাহর দূত এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাদের পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্রুত সরে পড়লেন এবং মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে শাস্তি স্বরূপ খায়বারে নির্বাসনে পাঠান। ছয় শত উট বোঝাই করে তারা অর্থ-সম্পদ নিয়ে যায় এবং নিজেদের ঘর বাড়ি নিজ হাতে ধ্বংস করে খায়বারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

আর ইহুদী বনী কুরাইযা! পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে তারাও চুক্তি ভংগ করেছিল। খন্দকের যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে যুক্ত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করার অঙ্গীকার করেছিল। আল্লাহ মুশরিকদের অপমানিত করলেন এবং তাদের ঐক্য ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলেন। অবশেষে তারা ব্যর্থ হয়ে মক্কায় ফিরে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন হাজার সৈন্য নিয়ে বনী কুরাইযার বিরুদ্ধে অভিযানে বের হলেন এবং অবরুদ্ধ করে সংকীর্ণ করে দিলেন তাদের জীবন। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রস্তাব পাঠাল যে, আমরা সাদ বিন মুয়াযের ফায়সালায় সম্মত আছি। সাদ বিন মুয়ায রা. ফয়সালা করলেন : যুদ্ধের ক্ষমতা সম্পন্ন পুরুষদের হত্যা করা হবে, নারী ও বাচ্চাদের গ্রেফতার করা হবে এবং তাদের সম্পদ বণ্টন করে দেয়া হবে। সে হিসেবে পুরুষদের হত্যা করা হয়েছে। তবে কতিপয় লোককে এ রায়ের বাহিরে রাখা হয়েছে।

এ রায়টি মূলত: তারা নিজেরাই বেছে নিয়েছিল। কারণ, তারা প্রার্থনা করেছিল যেন সাদ বিন মুয়ায তাদের ব্যাপারে ফায়সালা করেন। তাদের ধারণা ছিল, আউসের সাথে সম্পর্কের কারণে হয়তো সাদ তাদের প্রতি কিছুটা দয়াশীল হবেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় : ইহুদীরা তাদের বন্দীদের সাথে এর চেয়েও নির্মম ব্যবহার করেছে।

মহা বিজয়ের যুদ্ধ : মক্কা বিজয়

হোদায়বিয়ার সন্ধি মোতাবেক খুযাআ গোত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধীনে আর বকর গোত্র কুরাইশদের অধীনে সন্ধি চুক্তির আওতাভুক্ত হল। এর পরের ঘটনা, খুযাআ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি, বকর গোত্রের এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শানে ধৃষ্টতাপূর্ণ কবিতা আবৃত করতে দেখল। তাই তাকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিল। এ কারণে উভয় গোত্রের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল এবং বনী বকর বনী খুযাআর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা করল। বনী বকর তাদের মিত্র কুরাইশদের নিকট সাহায্য চাইলে তারা অস্ত্র এবং বাহন দিয়ে সহযোগিতা করল। কুরাইশদের অনেকে চুপিসারে যুদ্ধে ও অংশগ্রহণ করল। যেমন সফওয়ান ইবনে উমাইয়া, ইকরামা ইবনে আবু জাহাল এবং সুহাইল ইবনে আমর। বনী খোযাআ হারাম শরীফে আশ্রয় নিল কিন্তু বনী বকর হারামের সম্মান রক্ষা করেনি। তারা সেখানেই খুযাআর ওপর হামলা চালায় এবং বিশ জনেরও বেশি লোককে হত্যা করে।

এর মাধ্যমে কুরাইশরা তাদের ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করল। কারণ, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধীনে চুক্তিতে আবদ্ধ বনী খোযাআর বিরুদ্ধে বনী বকরকে সাহায্য করেছে। তারা এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ

ﷺ-কে অবহিত করল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি আমার নিজেকে যেভাবে হেফাযত করি, তোমাদেরকেও ঠিক সেভাবেই হেফাযত করব।

অতঃপর কুরাইশরা অনুশোচনা করল এবং আবু সুফিয়ানকে চুক্তি নবায়ণ এবং চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করার আবদার জানিয়ে পাঠাল। তাদের এ অনুশোচনা কোনো কাজে আসেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কোনো উত্তর করেননি বরং উপেক্ষা করেছেন। তখন সে বড় বড় সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তার মাঝে মধ্যস্থতা করার অনুরোধ জানিয়ে তাদের সহযোগিতা চাইল, সকলেই তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল। অবশেষে সে ব্যর্থ হয়ে মক্কায় ফিরে এলো।

কুরাইশদের পক্ষ হতে মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করার বিপরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয় ও কাফিরদের উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার সংকল্প করলেন।

চিত্র ৪৪ : মক্কা বিজয়ের মানচিত্র
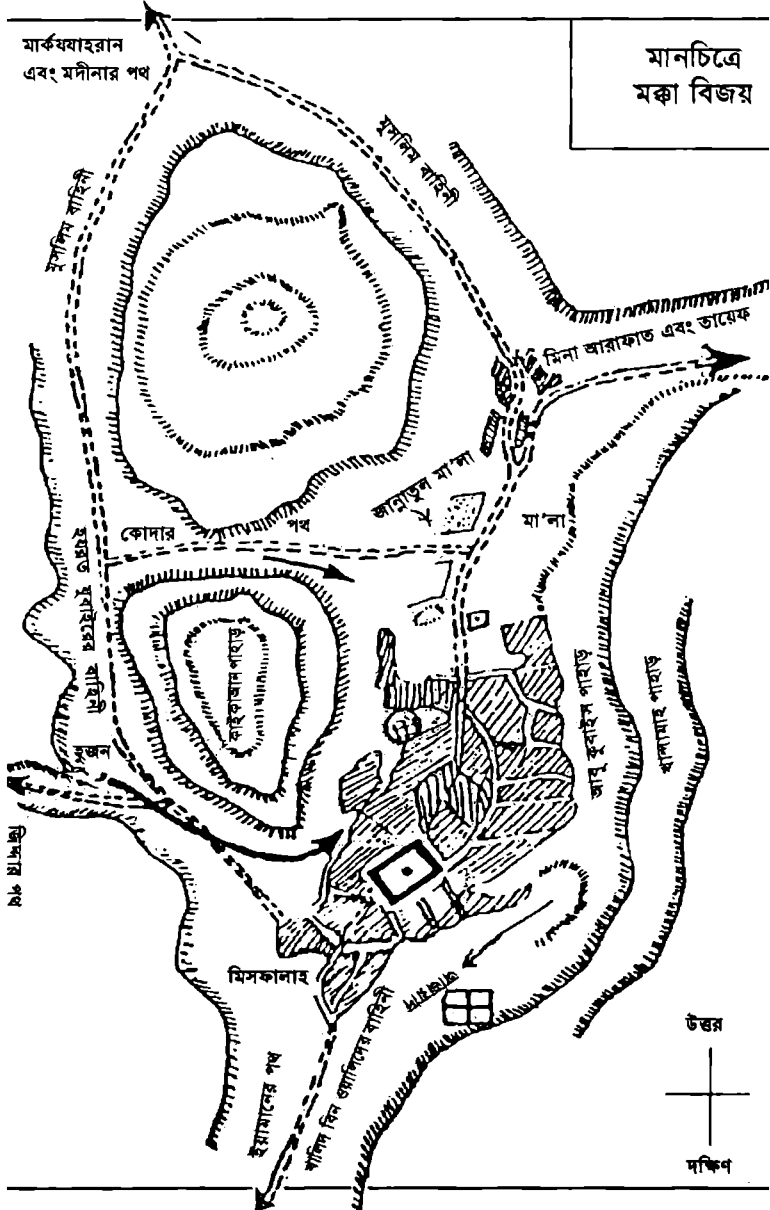
অত:পর রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিযানের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে বিষয়টি গোপন রাখলেন। কারণ, তার পরিকল্পনা ছিল হঠাৎ করেই মক্কায় ঢুকে পড়ে কুরাইশদের নিজ ঘরের মধ্যেই আটকে ফেলবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার আশপাশের আরব গোত্রের নিকট সংবাদ পাঠালেন। যেমন, আসলাম, গিফার, মুযাইনা, জুহাইনা, আসজা ও সুলাইম। এক পর্যায়ে মুসলমানদের সংখ্যা দশ হাজার পর্যন্ত পৌঁছে গেল। মদীনাতে আবু রুহ্‌ম আল-গিফারীকে প্রতিনিধি মনোনীত করে, রমজানের ১০ম তারিখ বুধবার দিন রওয়ানা করলেন। কাদীদ নামক স্থানে তিনি ঝাণ্ডা উত্তোলন করলেন।

বাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ অভিযানের সংবাদ তখনও মক্কায় পৌঁছেনি, তারা আবু সুফিয়ানকে সংবাদের সত্যতা যাচাই করার জন্য প্রেরণ করল। তাকে তারা বলে দিল, যদি মুহাম্মাদের সাথে তোমার দেখা হয়, তবে তাঁর থেকে আমাদের জন্যে নিরাপত্তা নিয়ে নিও।

আবু সুফিয়ান, হাকিম বিন হিযাম এবং বুদাইল বিন ওরকা বের হল। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহিনী দেখে ভয় পেয়ে গেল। এদিকে আব্বাস রা. আবু সুফিয়ানের আওয়াজ শুনে ফেললেন। তিনি বললেন : হে হানযালার বাপ! সে বলল : উপস্থিত, বলুন। তিনি বললেন : দেখ, রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাথে দশ হাজার সৈন্যবাহিনী। তখন আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। আর আব্বাস রা. তাকে নিরাপত্তা দিলেন। আবু সুফিয়ান ও তার দুই সাথিকে নিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন, তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্বাস রা.-কে বললেনঃ তুমি তাকে নিয়ে মুসলমানদের চলার পথে দাঁড় করিয়ে দাও, যাতে সে মুসলমানদের শক্তি ও ক্ষমতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারে। আব্বাস রা. নবী করিম ﷺ-কে ইশারায় বললেন, আবু সুফিয়ানকে কিছু একটা দিন যা দিয়ে সে গর্ব করতে পারে। কারণ, সে গৌরব প্রিয় লোক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে সে নিরাপদ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধ হতে বিরত থাকতে বললেন। তিনি সকল নেতৃবর্গকে কঠোরভাবে নিষেধ করে বলেছেন, তোমরা যুদ্ধ হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে। তবে যদি কেউ তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায় তাহলে শুধু তার সাথেই যুদ্ধ করবে। খালেদ বিন ওয়ালীদ ব্যতীত মুসলমানদের কেউ কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হননি। খানদামা নামক স্থানে কুরাইশদের একটি দলসহ সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, সুহাইল ইবনে আমর এবং ইকরামা বিন আবু জাহেলের সাথে

খালেদ বিন ওয়ালীদের সাক্ষাৎ হয়। তারা তাকে প্রবেশে বাধা প্রদান করে এবং অস্ত্র প্রদর্শন করে ও তীর নিক্ষেপ করে। খালেদ তার সাথিদের যুদ্ধের প্রতি আহ্বান জানালেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করলেন। মুশরিকদের তেরো জন নিহত হল আর মুসলমানদের মাত্র দুজন শহীদ হলেন। তারা হলেন কারয বিন জাবের এবং হুবাইশ বিন খালেদ বিন রাবিআ।

জুহুন নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাঁবু সাটানো হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বীর দর্পে মক্কাতে প্রবেশ করেন। ফলে মক্কাবাসী ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় তাকে মেনে নেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটের ওপর চড়ে বাইতুল্লার তাওয়াফ সম্পাদন করলেন। কাবার চার পাশে তিন শত ষাটটি মূর্তি রাখা ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেগুলোর পাশ দিয়ে যেতেন আর হাতে রাখা লাঠি দিয়ে আঘাত করতেন। মুখে বলতেন:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ.

"এবং সত্য এসেছে, মিথ্যা বিদূরিত হয়েছে।"[৮৬]

মূর্তিগুলো তখন উপুর হয়ে পড়ে যাচ্ছিল। সর্ববৃহৎ মূর্তিটির নাম ছিল হুবুল, এটা ছিল কাবার একেবারে সামনে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাকামে ইবরাহীমে এসে দুরাকাত সালাত আদায় করলেন। এর পরেই লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার জন্য আসলেন। বললেন : হে কুরাইশ জনগণ! তোমাদের কি ধারণা, আমি তোমাদের সাথে কি রূপ ব্যবহার করব? তারা বলল : আপনি ভাল ব্যবহারই করবেন। আপনি আমাদের উদার-অনুগ্রহশীল ভাই এবং অনুগ্রহশীল ভাইয়ের ছেলে। তিনি বললেন : তোমরা যাও, তোমরা সকলেই মুক্ত ও স্বাধীন। আল্লাহ তাদের ওপর বিজয়ী করে দেয়ার পর, তিনি তাদের ক্ষমা করে দিলেন। অপরাধী ও অবাধ্য সম্প্রদায়ের ওপর কর্তৃত্ব অর্জন করার পর তিনি মাফ করে দেয়ার একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। অতঃপর সাফা পাহাড়ে বসলেন। সেখানে লোকজন তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করল। তাঁর কথা শুনবে এবং সাধ্য মত তাঁর অনুসরণ করবে মর্মে অঙ্গীকার প্রদান করল। অত:পর একের পর এক লোক এসে ইসলামে দীক্ষিত হতে লাগল।

মক্কা বিজয়ের দিনটি ছিল শুক্রবার, রমজান মাসের বিশ তারিখ। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় পনেরো দিন অবস্থান করেন। অতঃপর হুনাইন অভিমুখে যাত্রা করেন। মক্কাতে সালাত পড়ানোর জন্য ইতাব বিন উসাইদকে মনোনীত করলেন, আর দীনী শিক্ষা-দীক্ষার জন্য মুয়ায বিন জাবালকে দায়িত্ব দিলেন।

---

[৮৬] সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত নং : ৮১

অধ্যায়-৩ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিকার

সন্দেহ নেই, মহান আল্লাহ নবী ﷺ-কে প্রেরণ করে আমাদেরকে করেছেন সম্মানিত এবং তাঁর রিসালাতের সূর্য উদিত করে আমাদের প্রতি করেছেন সীমাহীন ইহসান।

ইরশাদ হচ্ছে,

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

অবশ্যই আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের প্রতি ইহসান করেছেন। কারণ, তিনি তাদের মাঝে তাদের থেকেই একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শোনা। তাদের পরিশোধন করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট গোমরাহিতে ছিল।[৮৭]

আমাদের ওপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনেক অধিকার রয়েছে, যা আদায় ও সংরক্ষণ করা একান্ত জরুরি। বিনষ্ট ও অবহেলা করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

এসব অধিকারের কিছু নিম্নে বর্ণিত হল,

১. তাঁর প্রতি ঈমান আনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিকারসমূহের মধ্যে প্রধান ও শ্রেষ্ঠতম অধিকার হল তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করা। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শেষ নবী হিসেবে মানবে না, সে কাফির। পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান এ ক্ষেত্রে তার কোনো কল্যাণে আসবে না।

পবিত্র কোরআনের অসংখ্য আয়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেয় এবং তার রিসালাতে সন্দেহ-সংশয় পোষণ হতে বারণ করে।

---

[৮৭] সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং : ১৬৪

ইরশাদ হয়েছে-

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا.

"সুতরাং তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও যে নূর আমি অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি ঈমান আনয়ন কর।"[৮৮]

আরও ইরশাদ হচ্ছে :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ.

"মু'মিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজদের সম্পদ ও নিজদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ।"[৮৯]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করা ধ্বংস ও কঠিন শাস্তির কারণ এ বিষয়টি নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইরশাদ হচ্ছে-

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"এটি এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিরোধিতা করেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিরোধিতা করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।"[৯০]

নবী করিম ﷺ বলেছেন :

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

---

[৮৮] তাগাবুন : ৮

[৮৯] সূরা হুজুরাত : ১৫

[৯০] সূরা আনফাল:১৩

"যার হাতে মুহাম্মাদের আত্মা তার শপথ, এ জাতির যে-ই আমার নাম শুনেছে, হোক সে খ্রিস্টান কিংবা ইহুদি, অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করেছে, আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করেই। তা হলে সে জাহান্নামবাসী হবে।"[৯১]

২. আনুগত্য করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্যই তার প্রতি ঈমানের প্রকৃত প্রমাণ। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনার দাবি করে অথচ তার আদেশ পালন করে না এবং তিনি যেসব বিষয় থেকে বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে না, তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করে না সে তার দাবিতে মিথ্যাবাদী। আর ঈমান হল মনোজগতে আন্দোলিত একটি বিষয়, ব্যক্তির কর্ম ও আমল যাকে সত্যায়ন করে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তাঁর দয়া ও করুণা একমাত্র আনুগত্যশীল ও আত্মসমর্পণকারীরাই পেয়ে থাকে। তিনি বলেন:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ.

"আমার রহমত সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। আমি তা লিখে দেব তাদের যারা আল্লাহকে ভয় করে, যাকাত দেয় ও যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে।"[৯২]

এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা কঠিন শাস্তির ধমক দিয়েছেন সেসব লোকদেরকে যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে। ইরশাদ হচ্ছে-

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

"অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় করে।"[৯৩]

---

[৯১] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৫৩/২৪০

[৯২] সূরা আরাফ, আয়াত নং : ১৫৬

[৯৩] সূরা নূর : ৬৩

আল্লাহ তাআলা তার রাসূল ﷺ-এর আদেশে আত্মসমর্পণ ও তার হুকুমে আত্ম প্রশান্তি রাখতে আদেশ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।[১৪]

৩. তাঁকে ভালোবাসা

উম্মতের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রাপ্য অধিকারের মধ্যে একটি হল তাকে ভালোবাসা, সাধারণ অর্থে নয় বরং তা হতে হবে পূর্ণাঙ্গ, সর্ব-ব্যাপ্ত, ও অন্তরের অন্তস্থল থেকে।

রাসূলুল্লাহ বলেছেন:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ و وَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

“তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান, পিতা-মাতা ও সমগ্র মানুষ হতে অধিক প্রিয় হব।”[১৫]

যে ব্যক্তির হৃদয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসা নেই সে মু'মিন হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। মুসলিম নাম ধারণ ও মুসলমানদের মাঝে বসবাস এ ক্ষেত্রে তাকে মু'মিনদের দলভুক্ত করতে অপারগ বলে প্রমাণিত হবে।

সর্বোচ্চ ভালোবাসা হল মু'মিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভালোবাসবে নিজ থেকেও অধিক। ওমর রা. রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একদা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে বাদ দিয়ে সকল বিষয় থেকে আপনি আমার কাছে অধিক প্রিয়। প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন

---

[১৪] সূরা নিসা : ৬৫

[১৫] সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ১৫

لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ. فَقَالَ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ النَّبِيُّ: الْآنَ يَا عُمَرُ.

"না, আমার আত্মা যার কবজায় তাঁর কসম, আমাকে তোমার নিজ সত্তা থেকেও অধিক ভালোবাসতে হবে। ওমর বললেন: আল্লাহর কসম নিশ্চয়ই আপনি এখন আমার কাছে আমার নিজ সত্তা থেকেও অধিক প্রিয়। নবী ﷺ বললেন, এখন হয়েছে হে ওমর।"[৯৬]

৪. পক্ষাবলম্বন ও তাঁকে সাহায্য করা

জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার এটি। তাঁর জীবদ্দশায় এ দায়িত্ব অনুরূপভাবে আদায় করেছেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম। আর তাঁর ওয়াফাতের পর এ দায়িত্ব পালিত হবে তাঁর সুন্নত সংরক্ষণের মাধ্যমে, যদি তা কোন অপবাদের অথবা মূর্খদের বিকৃতির বা বাতিলপন্থীদের বানোয়াট রচনার শিকার হয়। ব্যক্তি রাসূলকে প্রতিরক্ষার মাধ্যমেও এ দায়িত্ব পালিত হবে, যদি তিনি আক্রান্ত হন কারও তুচ্ছতাচ্ছিল্যের, অথবা যদি কেউ তাঁর সুউচ্চ অবস্থানের সাথে সাংঘর্ষিক কোন বিশেষণে তাঁকে বিশেষিত করার স্পর্ধা দেখায়।

বর্তমানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যক্তিত্ব আক্রমণের শিকার হচ্ছে অহর্নিশ। এমতাবস্থায় সমস্ত উম্মতের দায়িত্ব হবে, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আক্রমণকারীদের প্রতিহত করা। তাদেরকে এ অন্যায় আচরণ হতে বিরত রাখতে যার-পর-নাই চেষ্টা করে যাওয়া এবং এ ক্ষেত্রে সকল মাধ্যম ব্যবহার করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং মিথ্যাচারিতা ও অপবাদ থেকে বিরত হতে অন্যায়কারীদেরকে বাধ্য করা।

৫. দাওয়াতী প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ওয়াফাদারীর একটি দাবি হচ্ছে, সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করা। রাসূল বলেছেন,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

"আমার পক্ষ হয়ে একটি আয়াত হলেও পৌঁছিয়ে দাও।"[৯৭]

---

[৯৬] সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৬৬৩২

[৯৭] সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৩৪৬১

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন,

لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

"আল্লাহ যদি তোমার মাধ্যমে একজন মাত্র ব্যক্তিকেও হিদায়াত দান করেন তা হবে তোমার জন্য লাল উট থেকেও উত্তম।"[৯৮]

অন্য এক হাদীসে এসেছে,

مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ

"আমি কিয়ামত দিবসে অন্যান্য উম্মতের ওপর তোমাদের আধিক্য নিয়ে গর্ব করব।"[৯৯]

উম্মতে মুহাম্মাদীর আধিক্যের একটি মাধ্যম হল, ইসলাম প্রচার এবং অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর ইসলাম ধর্মে ব্যাপক প্রবেশ। আর আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর প্রতি লোকদের দাওয়াত প্রদান সমস্ত নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের দায়িত্ব, পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে :

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

"বল! এটি আমার পথ। আল্লাহর প্রতি আহ্বান করি, যথার্থ জ্ঞান নিয়ে, আমি ও আমার অনুসারীবৃন্দ।"[১০০]

সুতরাং উম্মতের প্রতিটি সদস্যের উচিত, তাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠান হয়েছে, তা যথার্থভাবে পালন করা। যেমন, দাওয়াত ও সত্য পৌঁছিয়ে দেয়ার কাজ। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ ইত্যাদি। ইরশাদ হয়েছে,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরা উত্তম জাতি, তোমাদের বের করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য, তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ হতে বারণ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।"[১০১]

---

[৯৮] সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ৩০০৯

[৯৯] মুসনাদে বায্যার, হাদীস নং : ৬৪৫৬

[১০০] সূরা ইউসুফ, আয়াত নং : ১০৮

৬. জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় যথাযথ সম্মান করা

এটিও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ একটি অধিকার যা অবহেলিত হচ্ছে উম্মতের অনেক সদস্যের দ্বারা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا . لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

"নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাঁকে সাহায্য কর ও সম্মান কর, আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর সকাল ও সন্ধ্যায়।"[১০২]

ইবনে সুদী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সহযোগিতা ও সম্মানের অর্থ হলো, তাঁর তাজিম করা, তাঁকে বড় বলে জানা, তাঁর অধিকারসমূহ আদায় করা। কেননা তাঁর বিশাল দান ও অনুগ্রহ তোমাদের সবারই ওপর রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান শ্রদ্ধায় সাহাবাগণ ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কথা বলতেন এতই শ্রদ্ধাভরা নির্লিপ্ততায় তাঁরা তা শুনতেন, মনে হত যেন তাঁদের মাথায় পাখি বসে আছে।

যখন পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হল,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

"হে মু'মিনগণ, নবীর আওয়াজের ওপর তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না এবং তোমাদের পরস্পরে কথা বলার সময় যেভাবে উচ্চ কথা বল সেভাবে নবীর সামনে কথা বল না, এতে তোমাদের কর্মসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে, আর তোমরা তা টেরও পাবে না।"[১০৩]

আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর কসম, এখন থেকে আমি আপনার সাথে নিতান্তই ক্ষীণ আওয়াজ ব্যতীত কথা বলব না।

---

[১০১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং : ১১০

[১০২] সূরা ফাতহ, আয়াত নং : ৮-৯

[১০৩] সূরা হুজুরাত ,আয়াত নং : ০২

ওফাতের পর রাসূলুল্লাহকে সম্মানের অর্থ তাঁর সুন্নতের অনুসরণ, তাঁর নির্দেশসমূহের তাজিম করা, তাঁর বিচার ফয়সালা মেনে নেয়া, তাঁর বাণীসমূহের বিষয়ে আদব অবলম্বন করা, কোন মাযহাব বা ব্যক্তির অভিমতকে কেন্দ্র করে তাঁর হাদীসের বিপক্ষে না যাওয়া। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেছেন, এ-ব্যাপারে মুসলমানদের ঐক্যমত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন সুন্নত যদি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় তবে কোন ব্যক্তির অভিমতের ভিত্তিতে তা ছেড়ে দেওয়া বৈধ হবে না।

৭. তাঁর নাম শুনে দরূদ পড়া

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সালাত পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি সালাত প্রেরণ করেন, হে মু'মিনগণ তোমরাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সালাত পাঠ করো এবং তাকে সালাম দাও উত্তম পন্থায়।"[১০৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

قَالَ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

"ঐ ব্যক্তি অপদস্থ হল, যার কাছে আমি আলোচিত হলাম অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না।"[১০৫]

তিনি আরো বলেছেন,

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً .

"কিয়ামত দিবসে আমার অতি নিকটজন হবে ঐ ব্যক্তি যে আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করে।"[১০৬]

---

[১০৪] সূরা আহযাব, আয়াত নং : ৫৬
[১০৫] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৫৫১/৯
[১০৬] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং : ৪৮৪

অন্য এক হাদীসে এসেছে,

الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

"প্রকৃত কৃপণ ঐ ব্যক্তি যার কাছে আমি আলোচিত হলাম, কিন্তু সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না।"[১০৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম উল্লেখ হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন মুসলমান তাঁর প্রতি সালাত পাঠ না করে তবে এটা হবে নিশ্চিত অন্যায়।

৮. তাঁর বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব ও শত্রুদেরকে ঘৃণা করা

ইরশাদ হচ্ছে,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"তুমি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধাচারীদের ভালোবাসে। হোক না এ বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র। তাদের অন্তরে আল্লাহ সুদৃঢ় করেছেন ঈমান এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে এক রূহ দ্বারা। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।"[১০৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মুওয়ালাত বা বন্ধুত্বের একটি দিক হল, তাঁর সাহাবাদেরকে ভালোবাসা ও তাদেরকে বন্ধু ভাবা। তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন থাকা। তাদের প্রশংসা করা। তাদের অনুসরণ করা ও তাদের জন্য ইস্তি

---

[১০৭] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং : ১৭৩৬

[১০৮] সূরা মুজাদালাহ:২২

গফার করা। সাহাবাদের মাঝে যেসব বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে সেগুলো সম্পর্কে কোন রূপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা। তাদের সাথে যারা শত্রুতা পোষণ করে অথবা তাদের কারও চরিত্র হননের চেষ্টা করে, অথবা গালমন্দ করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করা। অনুরূপভাবে নবী পরিবারকে মহব্বত করা, তাদের সাথে মুয়ালাতপূর্ণ সম্পর্ক রাখা, তাদের সম্মান-মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া এবং তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি হতে বিরত থাকা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিকার রক্ষার আরেকটি দিক হচ্ছে, আহলে সুন্নাতের ওলামাদের মুহাব্বত করা, তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, তাদের অসম্মান ও মর্যাদাহানীকর কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মুওয়ালাতের (বন্ধুত্বসুলভ আচরণ) একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, কাফির, মুনাফিক, বেদআতপন্থী ও পথভ্রষ্ট এবং যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শত্রু ও প্রতিপক্ষ তাদেরকে শত্রু মনে করা।

প্রবৃত্তিপূজারি ও বেদআতপন্থীদের জনৈক ব্যক্তি আইয়ূব সাখতিয়ানীকে বললেন: আমি আপনাকে একটি কথা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং হাতে ইশারা দিয়ে বললেন, এমনকি অর্ধেক কথাও না। আর এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার শত্রুদের সাথে শত্রুতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে।

অধ্যায়-৪ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইবাদত

রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব বেশি ইবাদত করতেন। সালাত, সওম, যিকির, দুআ সব কিছুই বেশি বেশি করতেন। সব আমলই তিনি খুব সুন্দর ও ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন করতেন। আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের সালাত যদি ব্যথা কিংবা অন্য কোনো কারণে ছুটে যেত, তাহলে দিনের বেলায় বার রাকাত সালাত আদায় করে নিতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদের সালাত কখনো ত্যাগ করতেন না। রাতে এতো দীর্ঘ কিয়াম করতেন যে, পা ফুলে যেত। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে, উত্তর দিলেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে চাইব না?

হুযাইফাতুল ইয়ামান রা. বলেন, কোন একরাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করলাম। তিনি সূরা বাকারার তেলাওয়াত শুরু করলেন, আমার ধারণা ছিল একশত আয়াত পড়ে রুকু করবেন। কিন্তু না, (তা করেননি বরং) কেরাত চালিয়ে গেলেন। আমি ভাবলাম, এক সূরা দিয়ে এক রাকাত শেষ করবেন। তিনি তাও করলেন না। সূরা বাকারা শেষ করে সূরা নিসা শুরু

করলেন। এ সূরা শেষ করে সূরা আলে ইমরান আরম্ভ করলেন এবং এটিও শেষ করলেন। তিলাওয়াতের পুরোটাই ধীরে ধীরে তারতীলসহ আদায় করলেন। তিলাওয়াতে আল্লাহর তাসবীহ সম্বলিত আয়াত আসলে, তাসবীহ পড়েছেন। প্রার্থনার আয়াত আসলে, প্রার্থনা করেছেন। কোনো বস্তুর অনিষ্ট হতে পানাহ চাওয়ার আয়াত আসলে, অনিষ্ট হতে পানাহ চেয়েছেন। অতঃপর রুকু করলেন। রুকুতে পড়লেন, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمُ রুকুও প্রায় কিয়ামের সমান দীর্ঘ হল। অতঃপর বললেন, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ অতঃপর লম্বা কেয়াম করলেন, প্রায় রুকুর সমান। এরপর সেজদা করলেন, সেজদায় বললেন, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى সেজদাও প্রায় কেয়ামের সমান দীর্ঘ হল।

নবীজী মুকীম অবস্থায় নিয়মিত খুব যত্ন সহকারে দশ রাকাত সালাত আদায় করতেন, যোহরের আগে দুই রাকাত, যোহরের পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পরে দুই রাকাত, এশার পর ঘরে এসে দুই রাকাত এবং ফজর সালাতের আগে দুই রাকাত।

অন্য সব নফল সালাতের তুলনায় ফজর সালাতের সুন্নতের প্রতি তিনি বেশি গুরুত্ব দিতেন। সফর কিংবা মুকীম উভয় অবস্থায় ফজরের সুন্নত এবং বেতেরের সালাত ত্যাগ করতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর অবস্থায় এ দুই সুন্নত ব্যতীত অন্য কোনও সুন্নত পড়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। যোহরের আগে কখনো কখনো চার রাকাত পড়তেন। একবার রাতের সালাতে শুধুমাত্র একটি আয়াতই বার বার পড়তে থাকলেন এরই মাঝে সকাল হয়ে গেল।

রোযা রাখার জন্য সোম ও বৃহস্পতিবারের অপেক্ষায় থাকতেন।

তিনি বলেছেন, প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমল (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। আমার আমল রোযা অবস্থায় পেশ হোক, এটি আমার ভালো লাগে।

প্রতি মাসে নিয়মিত তিন দিন রোযা রাখতেন। মুআজা আদাবিয়া নামক জনৈক সাহাবী আয়েশা রা. কে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূল কি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন, তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মাসের কোন অংশে রোযা রাখতেন? বললেন, এর জন্য কোনও ধরা বাধা নিয়ম ছিল না।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর কিংবা মুকীম অবস্থায় সাধারণত আইয়ামে বীয তথা মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা বিহীন থাকতেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরার দিন রোযা রাখতেন এবং সাহাবাদের রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন।

আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো মাসে শাবানের চেয়ে বেশি রোযা রাখতেন না। তিনি শাবান মাসের পুরোটাই রোযা রাখতেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, দিন কয়েক ছাড়া পূর্ণ শাবানই তিনি রোযা রাখতেন।

যিকিরের ইবাদত সম্পর্কে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জিহ্বা আল্লাহর যিকির হতে কখনো ক্লান্ত হত না। সর্বাবস্থায় তিনি আল্লাহর যিকির করে যেতেন। সালাত শেষে তিনবার এস্তেগফার পড়তেন এরপর বলতেন :

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

"তুমি শান্তিময় আর তোমার নিকট হতেই শান্তির আগমন, তুমি কল্যাণময়, হে মর্যাদাবান হে সম্মানিত।"[১০৯]

সালাত শেষে আরো বলতেন :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক তার কোন শরীক নেই, রাজত্ব তারই এবং প্রশংসা তারই তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ তুমি যা প্রদান কর তা দেওয়ার মত কেউ নেই। আর তুমি যা দিবেনা তা দেওয়ার মত কেউ নেই। কোন পদমর্যাদার অধিকারীকে তার পদমর্যাদা তোমার শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না।"[১১০]

আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিকাংশ দুআ ছিল,

اَللّٰهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

---

[১০৯] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ৫৯১/১৩৫

[১১০] সহিহ বুখারী, হদীস নং : ৮৪৪

"হে আল্লাহ তুমি আমাদের দান কর দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের কল্যাণ আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।"[১১১]

তিনি এস্তেগফারও বেশি বেশি করতেন। ইবনে ওমর রা. বলেন, আমরা এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একশত বার পর্যন্ত এস্তেগফার পড়তে শুনতাম,

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

"হে আমার প্রভু আমাকে ক্ষমা করুন। আমার প্রতি ক্ষমাশীল হোন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"[১১২]

তিনি এবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা করতে নিষেধ করেছেন। বলতেন,

عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ، فَوَاللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبَّ الدِّيْنِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ

"তোমাদের সাধ্যে যতটুকু কুলায়, ততটুকু কর। আল্লাহর কসম! আল্লাহ (তোমাদের সওয়াব লেখতে) ক্লান্ত হবেন না, তোমরাই বরং (আমল করতে করতে) ক্লান্ত হয়ে পড়বে। ব্যক্তির নিয়মিত আমলকেই তিনি পছন্দ করতেন।"[১১৩]

রাত্রি জাগরণ

রাত সমাগত চারি দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিন্তু রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তার চারি পার্শ্বে সালাত, যিকির ও অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে আলোকিত করেছেন, রাত জাগরণ করছেন..। তিনি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের মালিক, যার হাতে সকল কিছুর চাবি-কাঠি স্বীয় স্রষ্টা মহান প্রভুর নির্দেশ পালনার্থে তাঁর সমীপে মুনাজাত করছেন। নির্দেশ হচ্ছে:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ. فَقِيلَ لَهُ: أَتَكَلَّفُ هَذَا؟ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

[১১১] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৬৮৮/২৩

[১১২] সুনানে আবি দাউদ, হাদীস নং : ১৫১৬

[১১৩] সহিহ বুখারী, হদীস নং : ৪৩

"রাসূল ﷺ রাতে এত নামাজ আদায় করতেন যে, তার দুই পা ফুলে যেত। তাকে বলা হলো: হে আল্লাহর রাসূল আপনার আগের ও পরের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, তবুও কেন আপনি এত ইবাদাত করেন? তিনি উত্তরে বলেন: আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী বান্দা হবো না?।"[১১৪]

হযরত আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ " বলেন:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ، فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ، أَلَمَّ بِأَهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ، وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، وَإِلَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

"আমি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নবী করীম ﷺ-এর রাত্রি কালীন সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি উত্তরে বললেন: তিনি প্রথম রাত্রিতে ঘুমিয়ে যেতেন। অতঃপর তিনি জাগ্রত হয়ে নামাজ আদায় করতেন, তারপর স্ত্রীর সাথে কোনো প্রকার প্রয়োজন মনে করলে তা পূরণ করতেন। আর আযান শুনার সাথে সাথেই লাফিয়ে উঠে পড়তেন, গোসলের প্রয়োজন হলে তা সেরে নিতেন অথবা ওযূ করে নামাযের জন্য বেরিয়ে যেতেন।"[১১৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত ছিল অনেক সুন্দর ও দীর্ঘ, আমরা একটু ভাল করে অনুধাবন করে স্বীয় জীবনে নমুনা হিসেবে বাস্তবায়ন করব!

আবু আব্দুল্লাহ হুযাইফা বিন আলইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، قَالَ: ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُسْتَرْسِلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ

---

[১১৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৮১৯/৭৯

[১১৫] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং : ৩৫৪৩৬

سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ". فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى "، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ

"আমি এক রাত্রিতে নবী করীম ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করি, তিনি সূরা বাক্বারা পড়া শুরু করলেন, আমি ভাবলাম তিনি হয়তো একশ আয়াত শেষে রুকুতে যাবেন, তিনি পড়তেই থাকলেন, আমি মনে করলাম তিনি হয়তো সম্পূর্ণ সূরা শেষ করে রুকুতে যাবেন, তিনি সূরা বাক্বারা শেষ করে সূরা আলে ইমরান পড়া আরম্ভ করলেন, আমি মনে করলাম তিনি হয়তো এ সূরা শেষ করে রুকুতে যাবেন, তারপর তিনি সূরা নিসা পড়া আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত পড়লেন। তিনি ধীর-স্থিরভাবে তাজভীদের সাথে পড়েন। যদি এমন কোনো আয়াত অতিবাহিত হতো যাতে তাসবীহ রয়েছে, সেখানে তিনি তাসবীহ [সুবহানাল্লাহ] পড়তেন। আর প্রার্থনা বিষয়ক কোনো আয়াত পাঠ করলে, তিনি আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করেন, আর আযাব বিষয়ক কোনো আয়াত পাঠ করলে তিনি তা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তারপর তিনি রুকু করেন। আর তাতে তিনি "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" পাঠ করেন। তার রুকুর পরিমাণও ছিল, প্রায় দাঁড়িয়ে থাকার সমপরিমাণ। রুকু থেকে উঠে "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা লাকাল হামদ" পাঠ করেন, তারপর প্রায় রুকু করার সমপরিমাণ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর সিজদা করে "সুবাহানা রাব্বিয়াল আলা" পাঠ করেন, তাঁর সিজদাও প্রায় তাঁর দাঁড়ানোর সময়ের সমপরিমাণই ছিল।"[১১৬]

ফজরের পর

মদিনায় রাত্রি অবসানের পর, পূর্বাকাশে ফজরের আভা উঁকি দেয়ার পর, মসজিদে ফজরের সালাত জামাতের সাথে আদায়ান্তে নবী ﷺ সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকতেন, তারপর তিনি দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন।

---

[১১৬] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং: ২৩৩৬৭

জাবের বিন সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا

"নবী করীম ﷺ ফজর নামাযান্তে উত্তমরূপে সূর্যোদয় পর্যন্ত নামাযের স্থানেই বসে থাকতেন।"[১১৭]

আর তিনি এ দুই রাকাত সুন্নাত সালাত পড়ার জন্য তার উম্মতকে উৎসাহ প্রদান করেন এবং এতে যে সওয়াব রয়েছে তাও স্মরণ করিয়ে দেন।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ» ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

"রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি জামায়াতের সাথে ফজরের সালাত আদায়ান্তে বসে আল্লাহর যিকিরে মশগুল থেকে সূর্য উদয় হওয়ার পর দুই রাকাআত নফল সালাত আদায় করবে, সে পরিপূর্ণ এক হজ্জ ও ওমরার সওয়াব পাবে। পরিপূর্ণ এ কথাটি তিনি তিনবার বলেন।"[১১৮]

চাশতের সালাত

দ্বিপ্রহর হবে হবে ভাব, সূর্যের তাপের প্রখরতা বেড়ে চলছে, তাপে মুখ পুড়ে যাবার উপক্রম এ সময়টা হল চাশতের সময়, কাজের চাপ অনেক, জীবন যাপনের চাহিদা পূরণের কত ব্যস্ততা, রিসালাতের প্রচুর দায়িত্ব, প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাত, সাহাবীদের শিক্ষা প্রদান ও পরিবারের সবার অধিকার আদায়ের পরও নবী করীম ﷺ আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করতে থাকেন।

মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: " أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ

---

[১১৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৬৭০/২৮৭

[১১৮] তিরমিযী, হাদীস নং : ৫৮৬

"আমি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললাম: রাসূল ﷺ কি চাশতের সালাত পড়তেন? তিনি উত্তরে বলেন: হাঁ, তিনি চার রাকাআত পড়তেন; অনেক সময় মা-শাআল্লাহ বেশিও পড়তেন।"[১১৯]

রাসূল ﷺ এ সালাত সম্পর্কে অসিয়তও করে গেছেন। হযরত আবু হুরাইরা " বলেন:

أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: «بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ

"আমার বন্ধু নবী ﷺ আমাকে প্রতি মাসে তিনটি রোজা রাখা, দুই রাকাআত চাশতের সালাত পড়া ও ঘুমানোর পূর্বেই বিতর সালাত আদায় করার অসিয়ত করেছেন।"[১২০]

ঘরে নফল সালাত আদায় করা

এ ঘরে তো ঈমানেরই আবাদ। ইবাদাত ও যিকিরে ভরপুর। আর আমাদের ঘরও যেন সেরকম হয় সে জন্য নবী করীম ﷺ আমাদের অসিয়ত করেছেন। তিনি বলেন:

اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا

"তোমাদের ঘরেও তোমরা কিছু সালাত আদায় করো, ঘরকে সালাত না পড়ে কবরে পরিণত করো না।"[১২১]

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: নবী করীম ﷺ সাধারণত সুন্নত সালাতগুলো এবং ঐ নফল সালাত যা নির্ধারিত কারণে [যেমন, চন্দ্র গ্রহণ ইত্যাদি] পড়া হয় তা ঘরেই পড়তেন বিশেষ করে মাগরিবের সুন্নাত। তিনি মাগরিবের সুন্নাত মসজিদে পড়েছেন এমন কোন প্রমাণ নেই। ঘরে সুন্নাত ও নফল সালাত আদায় করার অনেক উপকার রয়েছে, তন্মধ্যে:

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের অনুকরণ।
২. মহিলা ও শিশুদেরকে নামাযের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া।

---

[১১৯] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং : ১৩৮১

[১২০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৭২১/৮৫

[১২১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৪৩২

৩. নামাযে কেরাত ও যিকির করার মাধ্যমে শয়তানকে ঘর থেকে বিতাড়িত করা।

৪. সালাত মসজিদে আদায় করার তুলনায় অধিক ইখলাস পূর্ণ হওয়া।

৫. লোক দেখানো তথা রিয়া বা ছোট শিরক থেকে বাঁচা।

রমাযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেনঃ মাহে রমযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ পরিপূর্ণ অনুসরণীয়, মানযিলে মাকসুদে পৌঁছাতে কার্যকরী ও সকলের জন্য আমলের উপযোগী।

সিয়াম দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়। সে হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র নয় বছর সিয়াম পালনের সুযোগ পেয়েছেন।

ফরয হওয়ার প্রথম পর্যায়ে সিয়াম পালন প্রক্রিয়াটি ছিল খুবই সহজ। ইচ্ছা করলে কোন ব্যক্তি রোযা পালন না করে কোন দরিদ্র ব্যক্তির জন্য খাবারের ব্যবস্থা করলেই হয়ে যেত। পরবর্তীতে সিয়াম পালন সকলের ওপর অত্যবশ্যকীয় বিধানরূপে আরোপিত হয়। শুধুমাত্র বয়োবৃদ্ধ পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে মিসকীন খাওয়ানোর হুকুমটি বলবৎ থাকে।

অবশ্য রোগাক্রান্ত ও মুসাফির ব্যক্তি রোযা না রেখে পরবর্তীতে কাযা করতে পারবে, এ বিধান এখনও বলবৎ রয়েছে। আর গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিনী মহিলা যদি জীবনের ক্ষতির আশঙ্কা করে তবে তাদের জন্যও এ অনুমতি রয়েছে।

তবে তারা যদি স্বীয় সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করে, তাহলে কাযা করার সাথে সাথে প্রতিদিনের জন্য একজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে। কেননা তাদের রোযা ছেড়ে দেয়াটা অসুস্থতার কারণে হয়নি। বরং তারা সুস্থই ছিল। এ কারণে মিসকীন খাওয়ানোর মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। যেমনটি ইসলামের শুরুতে সুস্থ ব্যক্তির রোযা ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ছিল।

ইবাদতের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া

মাহে রমযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ ছিল ইবাদতের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া। জিবরাইল আ. রমযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন পাঠ করে শোনাতেন ও তাঁকে পাঠ করতে বলতেন। তিনি দান খয়রাতে প্রবল বাতাসের চেয়ে অধিক দ্রুতগামী হতেন। রমযান এলে তার দানশীলতায় যুক্ত হত আরো নতুন মাত্রা। রমযানে তিনি দান-

সদকা, ইহসান, কুরআন তিলাওয়াত, সালাত ও যিকিরে অধিক পরিমাণে নিমগ্ন হতেন।

ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে রমযানকে এমনভাবে বিশেষায়িত করতেন যা অন্য কোন মাসের বেলায় করতেন না। তিনি কখনো সেহরি গ্রহণ করা থেকেও বিরত থাকতেন। উদ্দেশ্য ছিল রাত ও দিনের পুরো সময়টাই ইবাদতে কাটিয়ে দেয়া।

রাসূলুল্লাহ সাহাবাদেরকে সেহরি গ্রহণ না করে সওমে বিসাল পালন হতে বারণ করতেন। তাদেরকে বলতেন:

لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ وَفِي رِوايةٍ: إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي.

"আমি তোমাদের মত নই। আমি রাত্রিযাপন করি, অন্য এক বর্ণনায়, আমি আমার রবের সান্নিধ্যে থাকি। তিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান।"[১২২]

তিনি উম্মতের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে সওমে বিসালকে নিষিদ্ধ করেছেন। তবে সেহরির সময় পর্যন্ত রোযা দীর্ঘায়িত করার অনুমতি দিয়েছেন। সহীহ বুখারীতে আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন,

لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ

"তোমরা সওমে বিসাল পালন কর না। যে ব্যক্তি এরূপ করতে চায়,. সে যেন তা কেবল সেহরি পর্যন্ত করে।"[১২৩]

এটি সিয়াম পালনকারীর জন্য অধিক উপযোগী ও সহজ। কেননা এটা তার জন্য রাতের খাবার গ্রহণ করার মতই, তবে সে একটু দেরি করে করছে। অর্থাৎ দিন ও রাতে রোযাদারের জন্য একবার খাবার গ্রহণের অনুমতি রয়েছে। সেহরীর সময় খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে রোযাদার তার এ খাবারটাকেই রাতের শুরু থেকে সরিয়ে শেষ রাতে নিয়ে গেল মাত্র।

মাহে রমযান শুরু বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ ছিল, তিনি নিশ্চিতরূপে চাঁদ দেখা ব্যতীত, অথবা কোন এক ব্যক্তির সাক্ষ্য ব্যতীত মাহে রমযানের রোযা রাখা শুরু করতেন না। একবার ইবনে ওমর রা. এর সাক্ষ্য অনুযায়ী রোযা রাখেন। জনৈক বেদুইন ব্যক্তির সাক্ষীতেও রোযা রেখেছিলেন। এ দুই জনের

---

[১২২] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ১৯২২, ৭২৪১
[১২৩] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ১৯৬৭

দেয়া সংবাদের ওপর ভিত্তি করেই রোযা রাখেন। রাসূলুল্লাহ তাদের দ্বারা সাক্ষ্য প্রদানমূলক বাক্য উচ্চারণ করাননি। তাদের দেয়া সংবাদ যদি কেবলই সংবাদ হিসেবে ধরা হয়, তবে তিনি একজনের দেয়া সংবাদ তথা খবরে ওয়াহেদকে রমযানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট মনে করেছেন। আর যদি বিষয়টিকে সাক্ষ্য হিসেবে ধরে নেয়া হয়, তবে তিনি সাক্ষ্যদাতাকে সাক্ষ্য সংক্রান্ত শব্দ উচ্চারণ করতে বলেন নি। আর যদি চাঁদ দেখা না যেত অথবা এ ব্যাপারে কারো সাক্ষ্য পাওয়া না যেত, তাহলে শাবান মাস ৩০ দিন পুরো করতেন। ২৯ শাবান দিবাগত রাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে চাঁদ দেখা অসম্ভব হলে তিনি পুরো ৩০ দিন হিসেব করে শাবান মাস শেষ করতেন, তারপর রোযা রাখা শুরু করতেন।

মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে চাঁদ দেখা না গেলে, সেদিন তিনি রোযা রাখতেন না। এ ধরনের দিনে রোযা রাখার নির্দেশও তিনি কাউকে দেননি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা অবস্থায় তিনি শাবান মাস ৩০ দিন পূর্ণ করতেন। এটাই হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল ও নির্দেশ। এর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

"আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে তোমরা শাবান মাস ৩০ দিন হিসেব করে গণনা করো।"[১২৪]

বুখারির বিশুদ্ধ বর্ণনাতেও এর সমর্থন মেলে, বুখারিতে এসেছে,

فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ

"তোমরা শাবান মাসের হিসেব পূর্ণ কর।"[১২৫]

মাহে রমযান সমাপ্তি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ হচ্ছে,তিনি রমযান শুরুর ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করে মানুষকে সিয়ামের আদেশ করতেন, আর রমযান সমাপ্তির ব্যাপারে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন।

ঈদের সালাতের সময় চলে যাওয়ার পর যদি দুই ব্যক্তি চাঁদ দেখার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিত তবে তিনি রোযা ছেড়ে দিতেন এবং অন্যদেরকেও ছেড়ে দিতে বলতেন এবং পরদিন সময়মত ঈদের সালাত আদায় করতেন।

---

[১২৪] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ১৯০০

[১২৫] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ১৯০৯

সাহ্‌রী ও ইফতার

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সময় হওয়া মাত্রই ইফতার সেরে নেয়ার প্রতি গুরুত্ব দিতেন, বিলম্ব করতেন না এবং তিনি সেহ্‌রী গ্রহণ করতেন। সেহ্‌রী গ্রহণের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। তবে সেহ্‌রী বিলম্বে গ্রহণ করতেন। সেহ্‌রী বিলম্বিত করার প্রতি তিনি উৎসাহ্ও দিতেন।

তিনি খেজুর দিয়ে ইফতার করতে উৎসাহ দিতেন। খেজুর না পেলে পানি দিয়ে। উম্মতের প্রতি গভীরতম মমত্ববোধেরই প্রকাশ ঘটেছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কর্মপদ্ধতিতে। কেননা ক্ষুধাক্লিষ্ট উদরে মিষ্টি জাতীয় দ্রব্যের প্রবেশ মানবপ্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ। মানুষের দৈহিক শক্তি এতে সতেজ হয়। বিশেষ করে দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি পায়।

মদীনার মিষ্টি দ্রব্য হল খেজুর। খেজুরই মদীনাবাসীদের প্রধান খাদ্য। এটিই তাদের খাদ্য এবং এটিই তাদের তরকারী।

আর পানি দ্বারা ইফতার করার গুরুত্ব এখান থেকে বুঝা যায় যে, রোযা রাখার ফলে কলিজায় একপ্রকার শুষ্কতার সৃষ্টি হয়। শুরুতে পানি দিয়ে যদি তা ভিজিয়ে নেয়া যায় তাহলে খাদ্য গ্রহণের উপকারিতা পরিপূর্ণ হয়। ক্ষুধা ও পিপাসার্ত ব্যক্তি যদি খাবার গ্রহণের পূর্বে একটু পানি পান করে খাবার শুরু করে তবে এটাই তার জন্য উত্তম। ওপরন্তু পানি ও খেজুরের মধ্যে হৃৎপিণ্ড সুস্থ থাকার যে উপাদান রয়েছে তা তো হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরাই ভাল জানেন।

ইফতার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ

রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায়ের পূর্বেই ইফতার সারতেন। তিনি সাধারণত গুটি কয়েক খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। খেজুর না পেলে কয়েকটি খোরমা। তাও না পেলে কয়েক ঢোক পানি। নবী করীম ﷺ ইফতারের পূর্বে এ দুআ পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

'হে আল্লাহ! তোমারই (সন্তুষ্টির) জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমারই ওপর নির্ভর করেছি এবং এখন তোমারই অনুগ্রহে ইফতার করছি।'[১২৬]

---

[১২৬] সুনানে আবু দাউদ ২/২৩৫৮

অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে,

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ

"ইফতারের সময় রোযাদারের জন্য এমন একটি দোয়া করার সুযোগ রয়েছে যা কখনো ফিরিয়ে দেয়া হয় না।"[১২৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত,

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ।

"রাত যখন এদিক দিয়ে আগমন করে এবং ঐ দিক দিয়ে চলে যায়, রোযাদারের তখন ইফতার হয়ে যায়।"[১২৮]

এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, অর্থাৎ রাতের আগমনের সাথে সাথে রোযাদার ব্যক্তি বিধানগতভাবে ইফতার করে ফেলেছে বলে ধরে নেয়া হবে যদিও সে নিয়ত না করে। অন্য এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হবে, সে ইফতার লগ্নে প্রবেশ করেছে। أَصْبَحَ (সকাল করেছে) ও أَمْسَى (সন্ধ্যা করেছে) এর মতই।

সিয়াম পালনকারীর আদব

রোযা পালনাবস্থায় অশ্লীল কর্মে জড়িত হওয়া, হট্টগোল, গালমন্দ অথবা অপরের গালমন্দের উত্তর দেওয়া থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বারণ করেছেন। গালাগালকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে রোযাদার ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু এতটুকু বলতে বলেছেন, إِنِّي صَائِمٌ অর্থাৎ, আমি রোযাদার। 'আমি রোযাদার' কথাটি কীভাবে বলতে হবে সে বিষয়ে ওলামাদের কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়,

-মুখে উচ্চারণ করে বলা, এটাই হাদীসের আপাত ব্যাখ্যা।

-রোযা পালন অবস্থায় রয়েছে, কথাটি নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য রোযাদার ব্যক্তি মনে মনে এরূপ বলবে।

-ফরয রোযার সময় মুখে উচ্চারণ করে বলবে, আর নফলের সময় মনে মনে বলবে, কেননা রিয়ামুক্ত হওয়ার এটা একটা সুন্দর পন্থা।

---

[১২৭] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং : ১৭৫৩

[১২৮] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ১৯৪১

রমযানে সফর সংক্রান্ত আদর্শ

রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানে সফর করেছেন। সফর অবস্থায় তিনি কখনো রোযা রেখেছেন আবার কখনো ইফতার করেছেন, অর্থাৎ রোযাবিহীন অবস্থায় থেকেছেন। আর সাহাবাদেরকে এ দুয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। শত্রুর কাছাকাছি পৌঁছে গেলে তিনি রোযা ভঙ্গ করার নির্দেশ দিতেন। শত্রুদেরকে মোকাবেলা করার সময় শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেই তিনি এরূপ করতেন।

তবে যদি সফরে যুদ্ধ-লড়াইয়ের কোন অনুষঙ্গ না থাকত তাহলে রোযা ভঙ্গের ক্ষেত্রে বলতেন, এটা হল রুখসত তথা সুযোগ, যে গ্রহণ করল, ভাল করল। আর যে করল না বরং রোযা রাখল তাতে তার কোন পাপ হবে না।

তবে কতটুকু পথ অতিক্রম করলে শরীয়তসম্মত সফর হবে এবং রোযাদার ইফতার করতে পারবে, এ ব্যাপারে তিনি কিছু নির্ধারণ করেন নি। সফরের দূরত্ব নির্ধারক কোন কিছুই রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়।

সাহাবাগণ সফর শুরু করতেন। আর রোযা ভঙ্গ করলে নিজ এলাকা অতিক্রম করে যাওয়ার পর ভঙ্গ করতে হবে, এ জাতীয় কোন শর্ত আরোপ করতেন না। সফরের শুরুতেই নিজ বাড়ি-ঘর অতিক্রম করার পূর্বেই রোযা ভঙ্গ করতেন এবং বলতেন, এটিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ। উবাইদ বিন জাবর বলেন:

قَالَ عُبَيْدُ بْنُ جَبْرٍ: رَكِبتُ مَعَ أَبِي بَصْرةَ الغِفَارِيِّ صَاحِب رَسُولِ اللهِ سَفِينةٍ مِنَ الفُسْطَاطِ فِي رَمضَانَ. فَلَمْ يُجَاوِزِ البُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ وَقَالَ: اقْتَرِبْ. قُلْتُ: أَلَسْتَ تَرَى البُيُوتَ؟ قَالَ أَبُو بَصْرةَ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ؟.

"আমি সাহাবী আবু বসরা (রা)-এর সাথে ফুসতাত থেকে সফরের উদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহণ করলাম। তিনি নিজ এলাকার ঘর-বাড়ি অতিক্রম করার পূর্বেই দস্তরখান আনার জন্যে বললেন এবং আমাকে বললেন, কাছে আস। আমি বললাম: আপনি কি এলাকার ঘর-বাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছেন না? আবু বসরা বললেন: তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত উপেক্ষা করতে চাও।"[১২৯]

[১২৯] সুনানে আবি দাউদ, হাদীস নং : ২৪১২

মুহাম্মদ ইবনে কাব বলেছেন.

أَتَيتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا، وَقَد رُحِّلَتْ لَهُ رَاحِلَتُه، وَقَدْ لَبِسَ ثِيَابَ السَّفرِ، فَدَعا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ؟ قَالَ: سُنَّةٌ. ثُمَّ رَكِبَ.

"আমি রমযানে আনাস ইবনে মালেকের কাছে গেলাম, তিনি সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সফরের উদ্দেশ্যে তার বাহন প্রস্তুত করে রাখা ছিল। তিনি সফরের পোশাক পরিধান করলেন। অতঃপর খাবার আনতে বললেন এবং গ্রহণ করলেন। আমি বললাম, এটা কি সুন্নত। তিনি বললেন, হ্যাঁ, সুন্নত। এরপর তিনি সওয়ার হয়ে রওয়ানা হলেন।"[১৩০]

এ হাদীসগুলো রমযানে সফর অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি প্রসঙ্গে খুবই স্পষ্ট প্রমাণ।

রমযানে ভুল করে খাদ্য-পানীয় গ্রহণকারীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ

মাহে রমযানে কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাবাতের গোসল না সেরেই সুবহে সাদেক অতিক্রম করেছেন। এবং সেদিন ফজরের আযানের পর গোসল সেরেছেন এবং রোযা রেখেছেন।

রোযা অবস্থায় তিনি কখনো কখনো স্ত্রীদের চুম্বন করতেন, আর এ চুম্বনকে পানি দিয়ে কুলি করার তুল্য বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

রোযা অবস্থায় ভুল করে কিছু খেলে বা পান করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ হল উক্ত রোযা কাজা না করা। কেননা আল্লাহই ঐ ব্যক্তিকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন। এটা ঘুমন্ত অবস্থায় খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের মতই। আর ঘুমন্ত ও ভুলকারী ব্যক্তি তাকলীফ বা দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তক্ত।

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ

এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ (যেসব বস্তু খাদ্যের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাও এর মধ্যে শামিল যেমন খাদ্যজাতীয় ইনজেকশন) শিঙ্গা লাগানো ও বমি করা।

---

[১৩০] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং : ৭৯৯

আল-কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রীর মিলনও পানাহারের মত রোযা ভঙ্গের কারণ। এ ক্ষেত্রে কারও কোন দ্বিমত নেই। চোখে সুরমা লাগালে রোযা ভাঙবে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ বিষয়ে কিছু প্রমাণিত হয়নি। তিনি রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করতেন বলেও বর্ণনায় এসেছে।

ইমাম আহমদ রহ. বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযা অবস্থায় মাথায় পানি ঢালতেন, কুলি করতেন ও নাকে পানি দিতেন। তবে নাকে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করা থেকে বারণ করেছেন। রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন বলে কোন প্রমাণ নেই।

দিনের শুরুতে অথবা শেষভাগে মিসওয়াক থেকে বারণ করেছেন বলেও বিশুদ্ধ সূত্রে কিছু পাওয়া যায় না।

এতেকাফ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ

রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের শেষ দশকে এতেকাফ করতেন। ওফাত পর্যন্ত তিনি এ নিয়মের অনুবর্তী ছিলেন। এক বছর কোন কারণে শেষ দশকের এতেকাফ করতে পারেননি, পরে শাওয়াল মাসে তা কাজা করেছেন। লাইলাতুল কদর তালাশ করতে গিয়ে তিনি একবার রমযানের প্রথম দশকে অতঃপর মধ্য দশকে এরপর শেষ দশকে এতেকাফ করেন। পরবর্তীতে তাকে জানিয়ে দেয়া হল যে, লাইলাতুল কদর শেষ দশকে। এরপর থেকে তিনি ওফাত পর্যন্ত শেষ দশকেই এতেকাফ চালিয়ে গেছেন।

তিনি তাঁবুর ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিতেন যা মসজিদে টানানো হত। সেখানেই তিনি আল্লাহর যিকির-আরাধনায় নিবিষ্ট হতেন।

এতেকাফের নিয়ত করলে তিনি ফজরের সালাত আদায় করতেন ও এতেকাফ শুরু করতেন।

প্রতি বছর দশ দিন করে এতেকাফ করতেন। তবে যে বছর পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন সে বছর বিশ দিন এতেকাফ করেছেন।

জিবরাঈল আ. বছরে একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে কুরআন পড়তেন, তবে ইন্তেকালের বছর দুইবার পড়েছেন।

এতেকাফের সময় তিনি নির্ধারিত তাঁবুতে একা একা প্রবেশ করতেন।

এতেকাফ অবস্থায় প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতেন না।

মসজিদ হতে আয়েশা (রা.)-এর কক্ষে মাথা প্রবেশ করিয়ে দিতেন, আয়েশা (রা) নিজ কক্ষ হতেই হায়েয অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা ধুয়ে দিতেন এবং আঁচড়িয়ে দিতেন।

এতেকাফে থাকাকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের কেউ কেউ নির্ধারিত স্থানে যেতেন, সাক্ষাত শেষে তিনি উঠে দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ ﷺও দাঁড়াতেন এবং বিদায় দিতেন। আর এ সাক্ষাতের ঘটনা সাধারণত: রাতের বেলায় সংঘটিত হত।

এতেকাফ অবস্থায় তিনি কখনোই কোন স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করেননি। এমনকি চুমোও দেননি।

তিনি ইতিকাফ করতে গেলে বিছানা পেতে দেয়া হত। এতেকাফস্থলে তাঁর খাটও রাখা হত।

কোন প্রয়োজনে ইতিকাফ স্থল হতে বের হলে, সে কাজ ব্যতীত অন্য কোনো কাজ করতেন না। যেমন, কোন রোগীর পাশ দিয়ে যেতেন, কিন্তু তার কাছে যেতেন না এবং তার সম্বন্ধে কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেসও করতেন ন।

একবার তিনি একটি তুর্কি তাঁবুতে এতেকাফ করেন। তখন তাঁবুটির প্রবেশপথ পাটি দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এতেকাফের মূল উদ্দেশ্য যাতে অর্জিত হয় সে জন্যই তিনি এরূপ করেছেন। বর্তমান সময়ের অজ্ঞ ও মূর্খ লোকদের অবস্থা ঠিক এর বিপরীত। তারা এতেকাফের জায়গাকে আলাপ-চারিতা ও যিয়ারতকারীদের অভ্যর্থনা জানানোর জায়গা বানিয়ে ফেলে। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, এসব এতেকাফের রং-রূপ আর নববী এতেকাফের রং-রূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

অধ্যায়-৫ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শারীরিক সৌন্দর্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

আমরা এখন নবী ﷺ-এর ঘরের নিকটবর্তী। অতএব, তাঁর দরজায় অনুমতি সূচক কড়া নাড়াবো। সব খেয়াল পরিত্যাগ করে সামান্যতম দৃষ্টি রাখব সে সমস্ত সাহাবীদের বর্ণনার দিকে যারা স্বয়ং নবী ﷺ-কে দেখেছে, তাতে যেন আমরাই তাঁকে দেখছি তিনি আমাদের সম্মুখে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছেন।

আল-বারা ইবনে আজেব রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ البَائِنِ، وَلاَ بِالقَصِيرِ

"নবী ﷺ সর্বোত্তম চেহারা ও সর্বোত্তম শারীরিক কাঠামোর অধিকারী ছিলেন, তিনি অতি লম্বা ছিলেন না বা খাটোও ছিলেন না।"[১৩১]

তিনি আরও বর্ণনা করেন:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ

"নবী ﷺ প্রশস্ত কাঁধের অধিকারী ছিলেন, তাঁর চুল ছিল কানের লতি পর্যন্ত, আমি তাঁকে লাল চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি, তাঁর চেয়ে সুন্দর কোন কিছু আর কখনও দেখিনি।"[১৩২]

আবু ইসহাক আস-সুবাইয়ি বলেন :

سُئِلَ البَرَاءُ أَكَانَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ: لاَ بَلْ مِثْلَ القَمَرِ

---

[১৩১] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ৩৫৪৯

[১৩২] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ৩৫৫১

“এক ব্যক্তি বারা বিন আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করেছিল: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা কি তলোয়ারের ন্যায় ছিল? তিনি উত্তর দিলেন, না, বরং চাঁদের ন্যায় ছিল।”[১৩৩]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَا مَسِسْتُ حَرِيرًا وَلاَ دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ شَمِمْتُ رِيحًا قَطُّ أَوْ عَرْفًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ أَوْ عَرْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“আমি রেশমি কাপড় ও অন্যান্য জিনিস ধরে দেখেছি, কিন্তু কোন জিনিস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত থেকে মোলায়েম বা নরম ছিল না এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরীরের ঘ্রাণের চেয়ে উত্তম কোন ঘ্রাণ আমি কখনো পাইনি।”[১৩৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম গুণাবলির মধ্যে একটি হল লজ্জা। এমনকি এ সম্পর্কে আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ

“অন্তঃপুরে পর্দায় থাকা বালিকার চেয়েও তিনি বেশী লজ্জা করতেন। তবে তিনি যদি কোন কিছু অপছন্দ করতেন তা আমরা তার মুখমণ্ডল থেকেই বুঝতে পারতাম।”[১৩৫]

এ হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কতিপয় দৈহিক গুণাবলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর দৈহিক ও চারিত্রিক উভয় প্রকারের আদর্শকে পরিপূর্ণ করেছিলেন।

মানুষের অঙ্গ ভঙ্গি চাল-চলন ও আচার আচরণ হল তার জ্ঞানের লক্ষণ ও তার মন-মানসিকতা বুঝার চাবিকাঠি।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কন্যা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সর্বাপেক্ষা বেশী জানতেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র সম্পর্কে, আর তিনিই নিখুঁত রূপে

---

[১৩৩] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ৩৫৫২

[১৩৪] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ৩৫৬১

[১৩৫] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ৬১০২

বর্ণনা দিতে পারবেন তাঁর অবস্থা সম্পর্কে। কেননা তিনি তাঁর ঘুমের অবস্থায়, জাগ্রতাবস্থায়, রোগে ও সুস্থতায়, রাগ ও সন্তুষ্ট অবস্থায় ছিলেন তাঁর নিকটতম। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا صَخَّابًا فِي الأَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো অশ্লীল বা অশ্লীলতা লালনকারী ব্যক্তি ছিলেন না। হাট-বাজারে কখনো হৈচৈ করতেন না। আর মন্দের প্রতিদান মন্দ দ্বারা দিতেন না বরং তিনি ক্ষমা করে দিতেন।"[১৩৬]

এ হল এ উম্মতের করুণা, হিদায়াত ও সততার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র, আমাদের জন্য তাঁর গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর নাতী হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

سَأَلْتُ أَبِي عَنْ سِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُلَسَائِهِ، فَقَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِمُ الْبِشْرِ، سَهْلُ الْخُلُقِ، لَيِّنُ الْجَانِبِ، لَيْسَ بِفَظٍّ غَلِيظٍ وَلَا صَخَّابٍ، وَلَا عَيَّابٍ، وَلَا مَشَّاحٍ، يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِي، وَلَا يُؤَيِّسُ مِنْهُ رَاجِيهِ، وَلَا يُخَيِّبُ فِيهِ، قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ: الرِّيَاءُ، وَالإِكْثَارُ، وَمَا لَا يَعْنِيهِ، وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ: كَانَ لَا يَذُمُّ أَحَدًا وَلَا يُعَيِّبُهُ، وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ، وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِيمَا رَجَا ثَوَابَهُ، وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ، كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا، لَا يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ الْحَدِيثَ، مَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ أَنْصَتُوا لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ حَدِيثُهُمْ عِنْدَهُ حَدِيثُ أَوَّلِهِمْ، يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُونَ مِنْهُ، وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ، وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ حَتَّى

---

[১৩৬] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং : ২০১৬

إِنْ كَانَ أَصْحَابُهُ لَيَسْتَجْلِبُونَهُمْ، وَيَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَأَرْفِدُوهُ، وَلَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلَّا مِنْ مُكَافِئٍ، وَلَا يَقْطَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتَّى يَجُوزَ فَيَقْطَعَهُ بِنَهْيٍ أَوْ قِيَامٍ

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথীদের সাথে আচরণ সম্পর্কে আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম: উত্তরে তিনি বলেন: নবী ﷺ হাস্যোজ্জল চেহারাসম্পন্ন, অমায়িক চরিত্রের অধিকারী ও বিনয়ী ছিলেন। কঠোর ছিলেন না, হৈচৈকারী ছিলেন না, ছিদ্রান্বেষী ও কৃপণ ছিলেন না, তাঁর নিকট আগত ব্যক্তি নিরাশ ও হতাশ হত না। তিনি নিজের মধ্য হতে তিনটি জিনিস পরিত্যাগ করেছিলেন: ১. রিয়া বা আত্মপ্রকাশ, ২. অতিরঞ্জন এবং ৩ অনর্থক কার্যকলাপ। মানুষের জন্য তিনি তিনটি জিনিসকে পরিত্যাগ করেন: ১. তিনি কাউকে নিন্দা করতেন না, ২. কাউকে দোষারোপও করতেন না এবং ৩. সওয়াবের প্রত্যাশা ব্যতীত কোন কথাই বলতেন না। যখন তিনি কথা বলতেন, শ্রবণকারীরা এমনভাবে কান পেতে শুনত যেন তাদের মাথায় পাখী বসে আছে। অত:পর যখন তিনি কথা শেষ করতেন তখন তারা কথা বলত। তারা তাঁর সামনে কখনো ঝগড়া বা কথা কাটাকাটি করত না। তাঁর নিকট কেউ কথা বলা আরম্ভ করলে তারা তার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকত। তাঁর উপস্থিতিতে তাদেরই কথা বলার অধিকার থাকত যারা প্রথম কথা বলা শুরু করত। লোকেরা যাতে হাসে তিনিও তাতে হাসতেন, মানুষ যাতে আশ্চর্য হয় তিনিও তাতে আশ্চর্য হতেন এবং তিনি বলতেন: "যখন তোমরা কোন অভাবীকে তার প্রয়োজনীয় কিছু প্রার্থনা করতে দেখ তার প্রার্থনায় তাকে সাহায্য করো।" তিনি মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা পছন্দ করতেন না, কারো কথা বলার সময় তার কথার মাঝে বাধা দিতেন না, হ্যাঁ, তবে সীমা অতিক্রম করলে তাকে হয়ত আদেশ বা নিষেধ করতেন।"[১৩৭]

মুসলিম জাতির রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শগুলোকে অনুধাবন করুন! আর আপনি সেগুলোকে আঁকড়ে ধরুন এবং তা বাস্তবায়ন করায় সচেষ্ট হোন কেননা তা সর্ব প্রকার মঙ্গলের সমাহার।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ ছিল যে, তিনি সাহাবীদেরকে দ্বীনের বিধান শিক্ষা দিতেন। যেমন তিনি বলেন:

---

[১৩৭] শামায়েলে তিরমিযী, হাদীস নং : ৩৩৪

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে মৃত্যুবরণ করল সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে"।[১৩৮]

তিনি আরও বলেনঃ

المسلم اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

"প্রকৃত মুসলিম তো সে ব্যক্তি যার হাত ও কথার অনিষ্ট হতে অন্য মুসলিম নিরাপদে থাকে, আর প্রকৃত মুহাজির তো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিষেধ কৃত বস্তুকে ছেড়ে দিয়েছে"।[১৩৯]

তিনি আরো বলেনঃ

بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"অন্ধকারে মসজিদে গমনকারীদেরকে কিয়ামত দিবসে পূর্ণ আলোর সুসংবাদ দান কর।"[১৪০]

তিনি আরো বলেনঃ

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

"তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে স্বীয় জান, মাল ও কথার দ্বারা যুদ্ধ কর।"[১৪১]

তিনি আরো বলেনঃ

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

"বান্দা এমনও কথা বলে, যার মাধ্যমে সে এমন কিছু প্রকাশ করে যে, তার ফলে সে জাহান্নামের এত দূরে ছিটকে পড়ে যা পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বেরও অধিক"।[১৪২]

---

[১৩৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৪৪৯৭
[১৩৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১০
[১৪০] তিরমিযী, হাদীস নং : ২২৩
[১৪১] আবু দাউদ, হাদীস নং : ২৫০৪

তিনি আরো বলেন:

إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً

"আমি অভিশম্পাতকারীরূপে প্রেরিত হইনি বরং আমি দয়াস্বরূপ প্রেরিত হয়েছি"।[১৪৩]

হযরত উমর " হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

لَا تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ

"নিশ্চয়ই রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন: তোমরা আমাকে মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করো না যেমন খ্রিস্টানরা মরিয়ম পুত্র ঈসাকে করেছে।"[১৪৪]

হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهِ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

"আমি নবী করীম ﷺ-এর মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর নিকট কামনা করি যে, আমার তোমাদের মধ্য হতে একজন খলিল-বন্ধু হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাকে খলিল বানিয়েছেন, যেমনভাবে তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে খলিল বানিয়েছিলেন, আর আমি যদি কাউকে খলিল বানাতাম তবে আবু বকরকে আমার খলিল বানাতাম। ওহে আমার উম্মত! তোমাদের পূর্বের উম্মত তাদের নবীদের কবরকে সিজদার স্থান রূপান্তরিত করেছিল, সাবধান হে আমার উম্মত! তোমরা কবরসমূহকে

---

[১৪২] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৯৮৮/৪৯

[১৪৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৫৯৯/৮৭

[১৪৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৩৪৪৫

মসজিদে রূপান্তরিত করো না, আমি এ কাজ হতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি।”[১৪৫]

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের গুণ ও মর্যাদা অনেক, তিনি ছিলেন অসংখ্য মহৎগুণের অধিকারী। নিচে আমরা তাঁর অসংখ্য গুণাবলি হতে সামান্য আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

১. উত্তম চরিত্র ও মাধুর্যপূর্ণ আচরণ

এ বিষয়ে স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই প্রশংসা করে বলেন:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.

আর অবশ্যই তুমি মহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।[১৪৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

“উত্তম আদর্শের পূর্ণতা দান করার জন্যই আমাকে রাসূল করে পাঠানো হয়েছে।”[১৪৭]

২. মানবতার জন্যে তাঁর অনুগ্রহ-করুণা, দয়া-অনুকম্পা

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

আর আমি তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্যে কেবল রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।[১৪৮]

আরো ইরশাদ হয়েছে:

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا.

তিনি ছিলেন মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।[১৪৯]

---

[১৪৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৫৩২/২৩

[১৪৬] সূরা কালাম, আয়াত নং : ৪

[১৪৭] সুনানে কুবরা বায়হাকী, হাদীস নং : ২০৭৮২

[১৪৮] সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং : ১০৭

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ .

আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্যে কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন-হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেত।[১৫০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন:

إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ

"নিশ্চয় আমি রহমত ও উপহার স্বরূপ।"[১৫১]

৩. জন্ম থেকেই তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ যত্ন ও তত্ত্বাবধান

ইরশাদ হয়েছে:

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى . وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى . وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى .

তিনি কি তোমাকে এতীম রূপে পাননি? অতঃপর আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি তোমাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন।[১৫২]

৪. তাঁর বক্ষ উন্মুক্ত করা এবং তাঁর আলোচনা সুউচ্চ করা

মহান আল্লাহ্ বলেন:

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ . وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ . الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ . وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

---

[১৪৯] সূরা আহযাব, আয়াত নং : ৪৩

[১৫০] সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং : ১৫৯

[১৫১] মুসান্নেফে আবি শায়বা, হাদীস নং : ৩১৭৮২

[১৫২] সূরা দুহা, আয়াত নং : ৬-৮

আমি কি তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি? আমি কি লাঘব করেনি তোমার বোঝা, যা তোমার পৃষ্ঠকে ভেঙে দিচ্ছিল এবং আমি তোমার চর্চা ও আলোচনাকে করেছি সুউচ্চ।[১৫৩]

৫. তিনি হচ্ছেন শেষ নবী

ইরশাদ হয়েছে:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ .

মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।[১৫৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত যে একটি ঘর নির্মাণ করল এবং নির্মাণকর্ম খুব সুন্দর ও পরিপূর্ণ রূপে সমাপ্ত করল, তবে ঘরের এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিল। লোকেরা ঘর প্রদক্ষিণ করতে লাগল এবং নির্মাণশৈলী দেখে খুব বিস্মিত হয়ে বলল, ঐ খালি স্থানে ইট লাগাচ্ছ না কেন ? তোমার ঘর পূর্ণতা পেত। আমিই হচ্ছি সেই ইট।"

৬. সকল নবী-রাসূলদের ওপর তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দান

নবী করিম ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ছয়টি দিক থেকে সকল নবীদের ওপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। আমাকে জাওয়ামিউল কালিম তথা ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য বলার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে, আমাকে রোব (ভক্তি-মাখা-ভীতি) দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, গনীমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) আমার জন্যে বৈধ করা হয়েছে, আমার জন্যে সকল ভূমিকে পবিত্র ও সেজদার উপযুক্ত করা হয়েছে, আমি সকল মানুষের তরে প্রেরিত হয়েছি এবং আমার মাধ্যমে নবুওয়ত পরম্পরা শেষ করা হয়েছে।"

৭. তিনি হচ্ছেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "আমি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব, আল্লাহ তাআলা সকল মাখলুক সৃষ্টি করলেন অতঃপর তাদের মধ্যে যারা উত্তম আমাকে তাদের সাথে রাখলেন। এরপর তাদেরকে দুই দলে বিভক্ত করলেন আর আমাকে উত্তম দলের সাথে রাখলেন। তারপর তাদেরকে বিভিন্ন বংশে

---

[১৫৩] সূরা ইনশিরাহ, আয়াত নং : ১-৩

[১৫৪] সূরা আহযাব, আয়াত নং : ৪০

বিভক্ত করলেন আর আমাকে তাদের উত্তম বংশের সাথে রাখলেন। অতঃপর তাদেরকে ঘরে ঘরে বিভক্ত করলেন আর আমাকে তাদের উত্তম ঘরের মধ্যে রাখলেন। সুতরাং আমি তোমাদের থেকে ঘর ও ব্যক্তি উভয় দিক থেকে উত্তম।"

৮. তিনি কেয়ামতের দিন হাউজে কাওসার ও শাফাআতের মালিক

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: "আমি হাউজে (কাউসারে) তোমাদের পূর্বে উপস্থিত হয়ে তোমাদের অপেক্ষায় থাকব। তোমাদের কতিপয় লোককে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। এক পর্যায়ে আমি যখন তাদেরকে চিনে নেব তাদেরকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া হবে। আমি বলব: হে রব, আমার সাহাবীবৃন্দ ! তখন বলা হবে, আপনার জানা নেই তারা আপনার ইন্তেকালের পর কি কি (বেদআত) আবিষ্কার করেছে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় প্রত্যেক নবীকেই বিশেষ একটি দুআ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে, তাঁরা সেটি করে ফেলেছেন এবং তা কবুলও করা হয়েছে। আর আমি আমার দুআটি কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফাআতের জন্যে বিলম্বিত করেছি।"

৯. কেয়ামত দিবসে তিনি মানবকুলের নেতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: "কেয়ামতের দিন আমি সকল আদম সন্তানের নেতা। এতে কোন গর্ব-অহংকার নেই। সেদিন আমার হাতে প্রশংসার ঝাণ্ডা থাকবে তাতে কোন গর্ব-অহংকার নেই। আদম থেকে নিয়ে যত নবী-রাসূল আছেন সকলেই আমার ঝাণ্ডার নিচে থাকবেন। আমি হচ্ছি প্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম কবুল করা হবে। এতে কোন গর্ব-অহংকার নেই।"

১০. তিনিই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: "জান্নাতের দরজায় আমিই সর্বপ্রথম করাঘাত করব, তখন খাযেন (প্রহরী) জিজ্ঞেস করবে: কে আপনি? আমি বলব: মুহাম্মাদ। সে বলবে: উঠছি এবং আপনার জন্যেই খুলে দিচ্ছি। আপনার পূর্বে কারো জন্যে উঠব না এবং আপনার পরেও আর কারো জন্যে দাঁড়াব না।"

১১. তিনি সকলের জন্যে উত্তম আদর্শ

ইরশাদ হয়েছে:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"[১৫৫]

১২. তিনি মনগড়া ও প্রবৃত্তির তাড়না থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত

দীন ও শরীয়ত সংশ্লিষ্ট তাঁর সকল কথা ও বাণী আল্লাহর পক্ষ হতে ওহী যা কোন বাতিলের পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

এবং তিনি নিজ খেয়াল-খুশি মোতাবেক কথা বলেন না। ইহা তো ওহী বৈ অন্য কিছু নয়, যা প্রত্যাদেশ করা হয়।[১৫৬]

১৩. সত্যবাদিতা ও আমানতদারী

রাসূলুল্লাহ ﷺ নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই নিজ জাতির কাছে সত্যবাদী ও আমানতদার হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তারা তাঁকে আল আমীন বলে ডাকত। এ খেতাবটি কেবল তার জন্যই সুনির্ধারিত ছিল। এর মাধ্যমে এটিই প্রমাণ হয় যে তিনি সত্যবাদিতা আমানতদারীসহ যাবতীয় উত্তম গুণাবলির সর্বোচ্চ চূড়া স্পর্শ করতে পেরেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্যবাদিতা ও আমানতদারির ব্যাপারে তাঁর শত্রুরাও সাক্ষ্য দিয়েছে। আবু জেহেল রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মারাত্মকভাবে ঘৃণা ও তাঁকে মিথ্যা-প্রতিপন্ন করা সত্ত্বেও সত্যবাদী বলেই বিশ্বাস করত। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল: মুহাম্মাদ সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী? উত্তরে সে বলল, ধ্বংস হোক তোমার। আল্লাহর কসম। নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সত্যবাদী। মুহাম্মাদ কখনও মিথ্যা কথা বলেননি। কিন্তু যদি কুসাইয়ের সন্তানরা ঝাণ্ডা, পানি পান করানো, কাবাঘরের পাহারাদারী ও নবুওয়ত নিয়ে যায় তাহলে কুরাইশের অন্যান্য শাখাগুলোর ভাগে কি রইল ?

---

[১৫৫] সূরা মুমতাহিনা, আয়াত নং : ৬

[১৫৬]

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যে আবু সুফিয়ান নবীর বিরুদ্ধে কঠিন শত্রুতায় লিপ্ত ছিল, সম্রাট হেরাক্লিয়াস যখন তাকে জিজ্ঞেস করল, সে এখন যা বলছে তা বলার আগে, তোমরা কি তাঁকে মিথ্যা বলার অপবাদ দিতে? আবু সুফিয়ান উত্তরে বলল, না।

হেরাক্লিয়াস বলল: আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, সে যা বলছে তা বলার পূর্বে তোমরা কি তাঁকে মিথ্যার অপবাদ দিতে, তুমি বললে, না। আমি বুঝতে পেরেছি, যিনি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী নন তিনি আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হতে পারেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর যেদিন প্রথম ওহী নাযিল হয়, তিনি কাঁপতে কাঁপতে খাদিজা (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, আমাকে কম্বলাবৃত কর। আমাকে কম্বলাবৃত কর। খাদিজা (রা.) বললেন। না না। আল্লাহ আপনাকে কখনো অসম্মানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন। সত্য কথা বলেন...।

عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ . خَرَجَ رَسُولُ اللهِ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا، فَهَتَفَ: يَا صَبَاحَاهُ" فَقَالُوا: مَنْ هَذَا ؟ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُم إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً بِالوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا. قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدِي عَذَابٍ شَدِيدٍ [متفق عليه]

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যখন وأنذر عشيرتك الأقربين (তুমি তোমার নিকটজনদের ভীতি প্রদর্শন কর) নাযিল হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন এবং সাফা পর্বতে আরোহণ করে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, ইয়া সাবাহাহ! লোকেরা বলল, কে ডাকছে? অতঃপর সকলেই তাঁর কাছে একত্রিত হল। তিনি বললেন, যদি আমি বলি, উপত্যকায় একটি সৈন্যদল তোমাদের ওপর হামলা করতে উন্মুখ হয়ে আছে, তবে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা বলল, নিশ্চয়ই। আমরাতো আপনাকে কেবল সত্যবাদী হিসেবেই পেয়েছি। তিনি

বললেন, আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করছি।[১৫৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্যবাদিতা ও আমানতদারি মুশরিকদেরকে রীতিমতো বিপদে ফেলে দিয়েছিল যে, তারা তাঁকে কি উপাধিতে খেতাব করবে- তারা একবার বলে জাদুকর, মিথ্যাবাদী। আবার বলে, কবি। একবার বলে, গণক আবার বলে, পাগল। আর তারা এ ক্ষেত্রে একজন অন্যজনকে ভর্ৎসনা করত। কেননা তারা জানত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

নযর ইবনে হারিস রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে খুবই নির্দয় ছিল। সে একবার কুরাইশদেরকে বলল, হে কোরাইশগণ! তোমাদেরকে এমন একটি বিষয় পেয়ে বসেছে যা পূর্বে কখনো ঘটেনি। মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে ছিলেন অল্প বয়সী বালক। বুদ্ধিমত্তায় তোমাদের সবার সন্তুষ্টির পাত্র। কথায় সত্যবাদী। তোমাদের মধ্যে সমধিক আমানতদার। অতঃপর যখন তোমরা তার অলকে সাদা চুল দেখতে পেলে, আর সে নিয়ে এল নতুন এক বার্তা, তখন তোমরা তাকে বললে যাদুকর। আল্লাহর কসম, সে যাদুকর নয়। তোমরা তাকে গণক বললে। না, আল্লাহর কসম, সে গণক নয়। তোমরা তাকে কবি বললে, পাগল বললে। এরপর সে বলল, হে কুরাইশগণ! তোমরা তোমাদের বিষয়টা খতিয়ে দেখ। আল্লাহর কসম! খুবই মহৎ এক বিষয় তোমাদের কাছে এসেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমানতদারী প্রসঙ্গে বলা যায় যে এ মহৎ গুণটিই খাদিজাকে আকৃষ্ট করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী হওয়ার জন্যে তাকে আগ্রহান্বিত করেছে। কেননা সিরিয়ায় ব্যবসা-মৌসুমে রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর ব্যবসা পরিচালনা করতেন। তিনি তার গোলাম মায়সারার কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমানতদারী ও উন্নত চরিত্র সম্পর্কে যা জানতে পেরেছিলেন তা তাকে অভিভূত করেছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমানতদারীর একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে, কুরাইশের মুশরিকরা- কাফির ও রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সত্ত্বেও- তাদের মূল্যবান ধন-সম্পদ তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখত। এ ব্যাপারে তারা নিরাপত্তাবোধ করত। আল্লাহ যখন তাঁর রাসূলকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা) কে মক্কায় তাঁর জায়গায় রেখে গেলেন, যাতে তিনি আমানতগুলো হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন।

---

[১৫৭] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ৪৯৭১

সবচেয়ে বড় আমানত যা রাসূল বহন করেছেন ও সর্বোত্তম পদ্ধতিতে হকদারদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তা হল ওহী ও রেসালতের আমানত যা আল্লাহ তাঁর কাঁধে অর্পণ করেছেন। তিনি এ আমানত মানুষের কাছে অনুপুঙ্খভাবে ও সর্বোত্তম পদ্ধতিতে পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি দলীল-প্রমাণ, বয়ান-বর্ণনা, যবান, তরবারী সবই ব্যবহার করেছেন শত্রুদের মুকাবিলায়। আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য বিজয় এনে দিয়েছেন। তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য মানুষের হৃদয় খুলে দিয়েছেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনল এবং তাঁকে সত্য বলে জানল, তাঁকে সাহায্য করল। আর এভাবে তাওহীদের বাণী উঁচু হল। ইসলাম পৃথিবী জুড়ে প্রচার পেল। গ্রাম ও শহরের এমন বাড়ি বাকি রইল না যেখানে আল্লাহ এ দ্বীনকে প্রবেশ করাননি।

১৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা-বার্তা

ইতিপূর্বে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর কতিপয় গুণাবলী অবলোকন করলাম। এবার আমরা তাঁর কথা-বার্তা সম্পর্কে অবগত হব, তিনি কি ভাবে কোন ভঙ্গিতে কথা বলতেন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা বলার পূর্বে আমরা তার কথার কিছু বর্ণনা শুনব। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

مَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هٰذَا. وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ يُبَيِّنُهُ، فَصْلٌ، يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ

"রাসূল ﷺ তোমাদের মতো এমন তাড়াতাড়ি কথা বলতেন না, এক নাগাড়ে কথা বলে যেতেন না। বরং তিনি স্পষ্ট ও ধীর স্থিরভাবে কথা বলতেন, তার বৈঠকে যারা উপস্থিত থাকত, সবাই তার কথাগুলি মুখস্থ করে ফেলত।"[১৫৮]

তাঁর কথা-বার্তা ছিল অতি সহজ ও নরম। তিনি চাইতেন যে, তাঁর কথা যেন বোধগম্য হয় এবং শ্রোতারা বুঝতে পারে। তার উম্মতের প্রতি এত খেয়াল ছিল যে, তারা কে কতটুকু বুঝতে সক্ষম সে শ্রেণী ভেদ বিবেচনা করে কথা বলতেন, শ্রোতাদের বুঝ শক্তির ব্যবধানের প্রতি লক্ষ্য করে কথা বলতেন, সবাই যাতে বুঝতে পারে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলতেন। একথা এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সহনশীল।

---

[১৫৮] তিরমিযী, হাদীস নং : ৩৬৩৯

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا فَصْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ

"রাসূল ﷺ-এর কথা বলার পদ্ধতি ছিল ধীর-স্থির, যারাই তাঁর কথা শুনত সবাই তা বুঝতে পারত।"[১৫৯]

রাসূল ﷺ-এর বিনয়, উদারতা ও প্রশস্ত হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন, তার কথাকে বুঝার জন্য একটি কথাকে তিনি বারবার- পুনরায়- বলতেন।

হযরত আনাস বিন মালিক " হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلَاثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ

"কথাকে ভালভাবে বুঝার জন্য রাসূল ﷺ তার কথাকে তিন বার করে পুনরাবৃত্তি করতেন।"[১৬০]

রাসূল ﷺ মানুষের সাথে নরম ও কোমল ব্যবহার করতেন এবং তারা যেন তাকে ভয় না করে সে জন্য প্রবোধ দান করতেন। কেননা, অনেকেই এমন ছিল যারা তাঁকে ভয় করত!।

হযরত ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَكَلَّمَهُ، فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُ، فَقَالَ لَهُ: هَوِّنْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ

"একদা রাসূল ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে ভয়ে ভয়ে কথা বলতে লাগল, অতঃপর রাসূল ﷺ তাকে বলেন: তুমি ভয় করো না, কেননা আমি কোনো রাজা-বাদশাহ নই। আমি তো এক মহিলার সন্তান যিনি শুকনো মাংস খেয়েছেন।"[১৬১]

১৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রসিকতা

নবী ﷺ স্বীয় উম্মত, সৈন্যবাহিনী, সৈন্য পরিচালনা ও পরিবারের চিন্তায় রত। আবার কখনো ওহী, ইবাদাত ও অন্যান্য চিন্তা রয়েছেই। সাধারণত বড় বড় ব্যস্ততার মাঝে মানুষ জীবনের চাওয়া পাওয়া ও আত্মিক প্রশান্তির জন্য

---

[১৫৯] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং : ৪৮৩৯

[১৬০] তিরমিযী, হাদীস নং : ৩৬৪০

[১৬১] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং : ৩৩১২

প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই ভুলে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক হকদারের হক সঠিকভাবে আদায় করেছেন, কারো অধিকারে তিনি কসুর করেননি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এত কাজ ও দায়িত্ব থাকা স্বত্ত্বেও তার হৃদয়ে বাচ্চাদেরও স্থান ছিল অম্লান। তিনি বাচ্চাদের সাথে রসিকতা করে তাদের অন্তরে আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়ে তাদের মনকে জয় করে নিতেন। যেমন তিনি অনেক সময় বড়দের সাথেও রসিকতা করতেন।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا، قَالَ: إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا

"তিনি বলেন: সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি আমাদের সাথে রসিকতা করেন? তিনি উত্তরে বলেন: আমি শুধু সত্য দ্বারাই রসিকতা করে থাকি।"[১৬২]

হযরত আনাস বিন মালিক " বর্ণনা করেন,

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ذَا الأُذُنَيْنِ

"নবী করীম ﷺ তাকে এ বলে সম্বোধন করতেন: হে দুই কান ওয়ালা।"[১৬৩]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: উম্মে সুলাইমের এক ছেলেকে আবু ওমাইর বলে ডাকা হতো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে আসলে অনেক সময় রসিকতা করতেন। একদা রসিকতা করার জন্য তাদের বাড়ীতে প্রবেশ করে দেখলেন যে, সে চিন্তিত, তিনি বললেন, কি হয়েছে আবু ওমাইরকে চিন্তা মগ্ন দেখছি? উপস্থিত ব্যক্তিরা বলল: হে আল্লাহর রাসূল! তার নুগাইর নামে পাখীটি মরে গেছে, যাকে নিয়ে সে খেলত। এরপর থেকেই তিনি তাকে বলতেন:

يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ

"হে আবু ওমাইর তোমার নুগাইর পাখীর কি খবর?"[১৬৪]

বড়দের সাথেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রসিকতা করার ঘটনা রয়েছে, তন্মধ্যে আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

---

[১৬২] তিরমিযী, হাদীস নং : ১৯৯০

[১৬৩] সুনানে আবি দাউদ, হাদীস নং : ৫০০২

[১৬৪] সহিহ বুখারী, হাদসি নং : ৬২০৩

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمه زَاهِر بن حرَام وَكَانَ يهدي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَادِيَةِ فَيُجَهِّزُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ» . وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهُ وَكَانَ دَمِيمًا فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خلفِه وَهُوَ لَا يُبصره. فَقَالَ: أَرْسِلْنِي مَنْ هَذَا؟ فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فَجعل لَا يألوا مَا أَلْزَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَرَفَهُ وَجَعَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا وَاللَّهِ تَجِدُنِي كَاسِدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ

"গ্রাম্য এক ব্যক্তি ছিল, যার নাম ছিল যাহের বিন হারাম। নবী করীম ﷺ তাকে খুব ভালোবাসতেন। তার গায়ের রং ছিল কালো বর্ণের। একদা নবী করীম ﷺ তার নিকটে গেলেন, সে তখন তার মালামাল বিক্রির কাজে ব্যস্ত ছিল। অতঃপর তিনি তার অজান্তে পেছন থেকে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। সে তখন বলতে লাগল: কে তুমি? আমাকে ছেড়ে দাও। পিছনের দিকে ফিরে জানতে পারল যে, তিনি রাসূল ﷺ। নবী করীম ﷺ-কে চেনার পর তার পিঠকে রাসূল ﷺ-এর সিনার সাথে ঘষতে কোনো প্রকার কার্পণ্য করেনি। রাসূল ﷺ বলছিলেন: এ দাসকে কে ক্রয় করবে? সে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে এত সস্তা মনে করলেন? নবী করীম ﷺ বলেন: না, তুমি আল্লাহর নিকট অনেক মূল্যবান।"[১৬৫]

রাসূল ﷺ ছিলেন উত্তম চরিত্র, মহান বৈশিষ্ট্য ও ভদ্র ব্যবহারের অধিকারী।

[১৬৫] শরহে সুন্নাহ, হাদীস নং : ৩৬০৪

তিনি তার পরিবার ও সাহাবীদের সাথে এমন উদার ও খোলা মেজাজের হওয়া সত্ত্বেও তার হাসির একটা সীমা ছিল। তিনি অট্টহাসি হাসতেন না, বরং তিনি মুচকি হাসি দিতেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا، حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কখনো অট্টহাসি দিতে দেখিনি, যার ফলে মুখের ভেতরের তালু প্রকাশ পায়, বরং তিনি মুচকি হাসি দিতেন।"[১৬৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এরকম হাস্যোজ্জল চেহারা ও সুন্দর আচরণ হওয়া স্বত্ত্বেও তার সামনে কেউ আল্লাহর শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ করলে তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে যেত।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَاهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ

"একদা রাসূল ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করলেন, আর আমি আমার ঘরে ছবি যুক্ত কাপড় দ্বারা পর্দা লটকিয়ে ছিলাম। রাসূল ﷺ তা দেখে তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যায় এবং তা নষ্ট করে বলেন: হে আয়েশা! যারা কোনো জীবের ছবি আঁকাবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে তাদের কঠিন আযাব হবে।"[১৬৭]

এ হাদিস এটাই প্রমাণ করে যে, ঘর-বাড়ীতে ছবি রাখা হারাম যদি তা দেখা যায়। আর তার চেয়ে ভয়াবহ হল: যদি তা দেয়ালের সাথে লটকানো হয় অথবা ঘর-বাড়ীর কোণ, আলমারি ও শোকেসে যদি মূর্তি বা পুতুল রাখা হয়। এতে গোনাহ তো রয়েছেই তা সত্ত্বেও রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে এ বাড়ীর অধিবাসীরা।

---

[১৬৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৬০৯২

[১৬৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২১০৭/৯২

১৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কান্না

অনেক পুরুষ ও নারী ক্রন্দন করে থাকে! কিন্তু কিভাবে কাঁদতে হয় ও কার জন্য কাঁদতে হয়?! নবী ﷺ চাইলে তো এ ধরার সব কিছু তার হাতের মুঠোয় হতো, তবু তিনি কাঁদতেন, জান্নাত তো তাঁর সামনেই এবং সেথায় তাঁর জন্য সর্বোচ্চ স্থান! হ্যাঁ, ভাই এরপরেও নবী ﷺ কাঁদতেন। কিন্তু সে কান্না ছিল একজন আবেদের কান্না। নবী ﷺ নামাযে তাঁর প্রভুর সাথে কথোপকথনের সময় ও কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণের সময় কাঁদতেন! তাঁর কান্নার কারণ কি ছিল? তা তো ছিল শুধু তাঁর নরম হৃদয় ও আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য এবং আল্লাহর মহত্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও তাঁর প্রতি ভীতি থাকার করণে আল্লাহর শান ও তাঁর ভয়েই কাঁদতেন।

আবু আব্দুল্লাহ মুতরাফ বিন আশ শিখখীর তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ» يَعْنِي: يَبْكِي

"আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট গেলাম, সে সময় তিনি নামাযে রত ছিলেন, পাতিলে পানি গরম করলে যে শব্দ হয় তাঁর ভেতর থেকে সেরকম কান্নার আওয়াজ আসছিল।"[১৬৮]

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ " বলেন,

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأْ عَلَيَّ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ {وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهْمِلَانِ

"একদা রাসূল ﷺ আমাকে বললেন: তুমি আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আর আমি আপনাকে তা পড়ে শোনাব? তিনি বলেন: আমি অন্যের মুখে শুনতে পছন্দ

---

[১৬৮] সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং : ১২১৪

করি। আমি সূরা নিসা পাঠ করতে করতে যখন "وجئنا بك على هؤلاء شهيدا" "আর আমি তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত করব।[সূরা নিসা: ৪১]" আয়াতে পৌঁছলাম, তখন দেখি রাসূল ﷺ-এর দুই চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।"[১৬৯]

বরং আপনি রাসূল ﷺ-এর মাথার মধ্য ভাগের কতিপয় পেকে যাওয়া চুল এবং তার দাড়ির দিকে লক্ষ করলে দেখবেন যে, প্রায় ১৮টি দাড়ি পেকে সাদা হয়েছিল। রাসূল ﷺ-এর ঐ সমস্ত চুল সাদা হওয়ার কারণ তাঁর পবিত্র মুখ থেকে শুনার জন্য হৃদয়টি নিবন্ধ করুন: হযরত আবু বকর " একদা বললেন:

يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ شِبْتَ، قَالَ: «شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَالوَاقِعَةُ، وَالمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

"হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন! তিনি বলেন: সূরা হুদ, সূরা ওয়াকিয়াহ, সূরা মুরসালাত, সূরা নাবা ও সূরা কুউয়িরাতের ভয়াবহতায় আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে।"[১৭০]

১৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘুম

উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন:

اللهَ، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، وَلْيَقُلْ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبِّي بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

"তোমাদের কেউ যখন বিছানায় শয়ন করতে যাবে, তখন বিসমিল্লাহ বলে সে তার কাপড়ের এক পার্শ্ব দ্বারা বিছানা ঝাড়বে। কেননা সে জানে না তার বিছানায় তার অবর্তমানে কী হয়েছে। আর যখন শয়ন করার ইচ্ছা করবে তখন যেন ডান পার্শ্ব হয়ে শয়ন করে, আর বলে:

---

[169] তিরমিযী, হাদীস নং : ৩০২৫, (হাদীসটি সহীহ)

[170] তিরমিযী, হাদীস নং : ৩২৯৭

سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبِّي بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ. إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

"হে আল্লাহ তোমার পবিত্রতম প্রশংসা। হে প্রভু! তোমার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশকে শয্যায় স্থাপন করছি, [আমি শয়ন করছি] আর তোমরাই নাম নিয়ে আমি তাকে উঠাব [শয্যা ত্যাগ করাব] যদি তুমি [আমার নিদ্রাবস্থায়] আমার প্রাণ কবজ করো, তবে তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আর যদি তুমি তাকে ছেড়ে দাও [বাঁচিয়ে রাখো] তবে সে অবস্থায় তুমি তার হেফাজত করো যেমন-ভাবে তুমি তোমার সৎ বান্দাদের হিফাজত করে থাকো।"[১৭১]

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য রাসূল ﷺ-এর দিক নির্দেশনা হলো: তিনি ইরশাদ করেন:

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ

"তুমি যখন বিছানায় শয়ন করতে যাবে, তখন তুমি নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করে ডান পার্শ্ব হয়ে শয়ন করবে।"[১৭২]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

"প্রতি রাতেই রাসূল ﷺ যখন শয়নের জন্য যেতেন, তখন তাঁর দুই হাতকে একত্র করে তাতে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও নাস পড়ে তাতে ফুঁ দিয়ে যতদূর সম্ভব তার শরীর মাসেহ করতেন। তিনি মাথা, মুখমণ্ডল ও সামনের অংশ দ্বারা মাসেহ শুরু করতেন এবং অনুরূপ তিনবার করতেন।"[১৭৩]

---

[১৭১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৭১৪/৬৪
[১৭২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ২৪৭
[১৭৩] আল বুখারী, হাদীস নং: ৫০১৭।

হযরত আনাস বিন মালিক " বর্ণনা করেন: রাসূল ﷺ বিছানায় শয়ন করার সময় বলতেন:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا. فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ.

'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর; যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় প্রদান করেছেন। এমন বহুলোক রয়েছে যাদের পরিতৃপ্ত করার কেউই নেই, যাদের আশ্রয় দানকারী কেউই নেই'।"[১৭৪]

হযরত আবু কাতাদাহ " বলেন:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ، نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ

"রাসূল ﷺ সফরের সময় রাতের শেষের দিকে কোথাও অবতরণ করে শয়ন করলে, ডান পার্শ্ব হয়ে শয়ন করতেন আর ফজরের কিছুক্ষণ পূর্বে শয়ন করলে হাত খাড়া করে তার উপর মাথা রেখে শুইতেন।"[১৭৫]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কত প্রচুর নিয়ামত দান করেছেন..।

প্রিয় পাঠক! সৃষ্টির সেরা, সমস্ত নবীদের সরদার জমিনের বুকে যত মানুষের পদচারণ হয়েছে তার শ্রেষ্ঠতম শেষ নবীর বিছানা সম্পর্কে চিন্তা করুন!

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ

"রাসূল ﷺ যে বিছানায় ঘুমাতেন তা ছিল চামড়ার ও তার ভেতরের জিনিস ছিল খেজুর গাছের ছাল।"[১৭৬]

---

[১৭৪] মুসলিম, হাদীস নং : ২৭১৫

[১৭৫] শরহে সুন্নাহ, হাদীস নং : ৩৩৫৯

[১৭৬] শরহে সুন্নাহ, হাদীস নং : ৩১২২

একদা সাহাবীদের এক দল ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এমতাবস্থায় ঘুরে বসলেন, তাতে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পার্শ্বদেশ ও মাদুর বা চাটাইয়ের মাঝে কোন কাপড় দেখতে পাননি যার ফলে তাঁর পার্শ্বদেশে মাদুরের দাগ বসে গেছে তা দেখে ওমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কেঁদে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: হে ওমার কেন কাঁদছ? তিনি উত্তরে বলেন: আমরা জানি আপনি রোম ও পারস্যের রাজার চেয়ে আল্লাহর নিকট অনেক সম্মানী। তারা এ ধরাতে কত প্রকার সুখ আর আনন্দ ফূর্তি করে যাচ্ছে আর আপনাকে আমরা এ অবস্থায় দেখছি! একথা শুনে রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেন: "হে ওমার তুমি কি চাও না যে তাদের জন্য দুনিয়ায় হোক আর আমাদের জন্য হোক আখিরাতে? ওমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: হ্যাঁ। তিনি বলেন: তবে এরূপই হবে।

১৮. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিনয়- নম্রতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্র ও সুউচ্চ সম্মানের অধিকারী ছিলেন, কুরআনের শিক্ষাই ছিল তাঁর আদর্শ, যেমন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

"তাঁর আদর্শ ছিল কুরআন।" [১৭৭]

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ

"উত্তম আদর্শের পূর্ণতা দান করার জন্যই আমাকে রাসূল করে পাঠানো হয়েছে।"[১৭৮]

রাসূল ﷺ তাঁর প্রশংসায় অতিরঞ্জন করা পছন্দ করেতন না, যা তাঁর বিনয়ী হওয়ারই প্রমাণ।

হযরত উমর " হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

---

[১৭৭] তিরমিযী, হাদীস নং : ২৪৬০১

[১৭৮] সুনানে কুবরা বায়হাকী, হাদীস নং : ২০৭৮২

"তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করো না, যেমন মরিয়মের পুত্রর খ্রিস্টানরা মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করেছে। আমি তো আল্লাহর একজন বান্দা মাত্র, তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূলই বলবে।"[১৭৯]

হযরত আনাস " বলেন: কিছু লোক রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্যে বলল:

أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا، وَيَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، إِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِيهَا اللهُ تَعَالَى، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল হে আমাদের মাঝের উত্তম ব্যক্তি ও উত্তম ব্যক্তির পুত্র, আমাদের সর্দার ও সর্দারের পুত্র। এ কথাগুলি শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: ওহে লোক সকল! তোমরা তোমাদের কথা বল, কিন্তু শয়তান যেন তোমাদের উপর বিজয়ী হতে না পারে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে সম্মান দান করেছেন সে সম্মান থেকে বাড়িয়ে কেউ আমাকে বেশি সম্মান করবে তা আমি কখনো পছন্দ করি না। আমি তো আল্লাহর বান্দা মুহাম্মাদ ও তাঁর রাসূল।"[১৮০]

আমাদের সমাজে এমন অনেক লোক আছে যারা নবী ﷺ-কে এমন প্রশংসা করে থাকে যা তাঁর ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায়; এমন কি অনেকে এমন ধারণা করে যে তিনি গায়েব বা অদৃশ্যের সংবাদ জানতেন এবং তার হাতে রয়েছে উপকার ও অপকারের চাবিকাঠি এবং অভাব-অনটন ও সবার প্রয়োজন মিটানো ও রোগ মুক্তিও তাঁর হাতেই।

তাদের সেই আক্বিদা বা বিশ্বাসকে অলীক ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُ ۚ

---

[১৭৯] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং : ১৫৪

[১৮০] সুনানে কুবরা বায়হাকী, হাদীস নং : ১০০০৭

"বলুন! আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের উপকার-অপকারের উপরও অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম, তবে তো আমি অধিকাংশ কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না।"[১৮১]

এই সেই মহানবী যিনি এ ধুলির ধরায় আশ্রিত সবুজ-শ্যামলের ছায়া প্রাপ্ত সমস্ত সত্ত্বার শ্রেষ্ঠতম। সর্বদা তিনি আল্লাহর নির্দেশ পালনে সচেষ্ট ও সদা স্বীয় রবের প্রতি প্রত্যাবর্তিত। যিনি কখনো অহঙ্কারকে আশ্রয় দেননি বরং তিনি ছিলেন বিনয়ীর মূর্তপ্রতীক এবং আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রনায়ক।

হযরত আনাস বিন মালেক " বলেন:

لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ

"সাহাবাদের নিকট রাসূল ﷺ-এর চেয়ে কোনো ব্যক্তি অধিক ভালোবাসার পাত্র ছিল না। তিনি আরো বলেন: সাহাবারা বসে থাকা অবস্থায় রাসূল ﷺ আগমন করলে তার সম্মানার্থে উঠে কখনো দাঁড়াত না। কেননা তারা জানতেন যে, রাসূল ﷺ তা পছন্দ করতেন না।"[১৮২]

মুসলিম উম্মার মহানবী ﷺ-এর আশ্চর্যজনক নম্রতা এবং অতুলনীয় উত্তম চরিত্রের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। তিনি কীভাবে এক অসহায় রমণীর প্রতি বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করেন ও শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তার জন্য তাঁর মূল্যবান সময় প্রদান করেন।

হযরত আনাস বিন মালেক " বলেন:

أَنَّ امْرَأَةً لَقِيَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً قَالَ: يَا أُمَّ فُلَانٍ، اجْلِسِي فِي أَيِّ نَوَاحِي السِّكَكِ شِئْتِ، أَجْلِسْ إِلَيْكِ

"নবী করীম ﷺ-এর সাথে মদীনার রাস্তায় জনৈক মহিলার সাথে দেখা হলো, সে মহিলা বলল, আপনার নিকট আমার কিছু আবেদন রয়েছে। একথা শুনে

---

[১৮১] আল কুরআন, সূরা আরাফ, ৭ : ১৮৮

[১৮২] তিরমিযী, হাদীস নং : ২৭৫৪

তিনি বললেন: তুমি মদীনার যে কোনো রাস্তায় বসতে চাও আমি তোমার আবেদন শুনার জন্য সেই রাস্তায় বসতে রাজি।"[১৮৩]

রাসূল ﷺ বিনয়ীদের শিরোমণি ও মূর্তপ্রতীক। হযরত আবু হুরাইরা "নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

"যদি ছাগলের একটি খুর খাওয়ার জন্যও আমন্ত্রিত হই, তা আমি সাদরে গ্রহণ করব, আর আমাকে ছাগলের খুর উপহার দেয়া হলেও আমি তা সাদরে গ্রহণ করব।"[১৮৪]

> সর্বকালের অহঙ্কারীদের জন্য রাসূল ﷺ-এর বাণী এক প্রতিবন্ধক হয়ে থাকবে এবং তাদের অহংকার ও বড়ত্বের জন্য থাকবে দাঁত ভাঙ্গা জবাব।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ " নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

"যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার, থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[১৮৫]

> অহঙ্কার হলো জাহান্নামের পথ। আল্লাহ তা'আলা এথেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন- যদিও তা অণু পরিমাণ হয়!

প্রিয় পাঠক! অহঙ্কার করে বিচরণকারীর কি ভয়াবহ পরিণতি হয়েছিল! এবং তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা রাগান্বিত হয়ে কেমন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়েছিলেন! একটু ভেবে দেখুন!

হযরত আবু হুরাইরা " হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

---

[১৮৩] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং : ১২১৯৭

[১৮৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ২৫৬৮

[১৮৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৯১/১৪৭

"এক ব্যক্তি দামি পোশাক পরে আত্মঅহমিকা নিয়ে ও মাথা আঁচড়িয়ে ফ্যাশন করে চলছিল, এ অবস্থায় আল্লাহ তাকে জমিনের ভেতর দাবিয়ে দিলেন। সে কিয়ামত পর্যন্ত নিচের দিকে দাবতেই থাকবে।"[১৮৬]

১৯. শিশুদের প্রতি দয়া

কঠোর হৃদয়ের লোক দয়া কি জিনিস তা জানে না, আর তাদের অন্তরে দয়ার কোন ঠাঁই নেই! তারা যেন কঠিন পাথরের ন্যায়। আদান প্রদানের ব্যাপারে তারা রুক্ষ এবং হৃদয়ের অনুভূতি ও মানবীয় প্রেমেও তারা কৃপণ! কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে কোমল হৃদয় দান করেছেন সেই মায়া ও ভালোবাসার আদর্শ।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ، فَقَبَّلَهُ، وَشَمَّهُ

"নবী করীম ﷺ তার ছেলে ইব্রাহীমকে কোলে নিয়ে চুমা দিলেন ও [আরবের রীতি অনুসারে] ঘ্রাণ নিলেন।"[১৮৭]

তাঁর এ দয়া ও ভালোবাসা শুধু আপন সন্তানের প্রতিই ছিল না বরং তা সকল মুসলিম সন্তানের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

হযরত জাফর "-এর স্ত্রী আসমা বিনতে ওমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

"একদা আমার বাড়িতে রাসূল ﷺ প্রবেশ করে জাফরের সন্তানদেরকে ডাকলেন। আমি দেখলাম তিনি তাদেরকে চুমা দিয়ে ঘ্রাণ নিলেন, আর তাঁর দু নয়ন ঝরে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। অতঃপর আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! জাফর সম্পর্কে আপনার নিকট কি কোনো প্রকার সংবাদ এসেছে? তিনি উত্তরে বললেন: হ্যাঁ, তিনি তো আজ নিহত হয়েছেন। তারপর আমরাও কাঁদতে লাগলাম। তিনি চলে গিয়ে বললেন: তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য খানা পাকাও, কেননা তারা শোকার্ত।"

তাদের মৃত্যুতে যখন রাসূল ﷺ কাঁদছিলেন ও তার দু চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল, তখন সাআদ বিন উবাদাহ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল: হে আল্লাহ রাসূল! আপনি কাঁদছেন? রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন:

هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ

---

[১৮৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৫৭৮৯

[১৮৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১৩০৩

"এ তো দয়া যা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে দান করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর দয়াশীল বান্দাদেরকেই দয়া করে থাকেন"।[১৮৮]

রাসূল ﷺ-এর ছেলে ইব্রাহীমের মৃত্যুতে যখন তাঁর দু নয়ন দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল, এ দেখে আব্দুর রহমান বিন আউফ বলে উঠল: হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কাঁদছেন?

অতঃপর তিনি বললেন:

يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ» ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ

"ওহে ইবনে আউফ! এ তো দয়া, অতঃপর তিনি আবার অশ্রু ঝরালেন। তারপর তিনি বললেন: নিশ্চয়ই চোখের অশ্রু প্রবাহিত হবে, হৃদয় চিন্তিত হবে, আর আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট আমরা তাই বলব। তারপর বললেন: ওহে ইব্রাহীম! তোমার মৃত্যুতে আমরা সবাই চিন্তিত।"[১৮৯]

রাসূল ﷺ-এর মহান আদর্শে আদর্শবান হওয়া ও সার্বিক জীবনে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করা আমাদের একান্ত করণীয়। আমরা এমন যুগে উপনীত হয়েছি যখন ছোটদের স্নেহ করা ও তাদেরকে উপযুক্ত মূল্যায়ন করা একেবারে হয় না। তারাই তো হলো আগামী দিনের জনক এবং জাতির কর্ণধার এবং ভবিষ্যতের উষার আলো!

মূর্খতা ও অহংকার, স্বল্প বিবেক ও আমাদের সীমিত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আমরা শিশুদের জন্য হৃদয়ের প্রশস্ততাকে তালাবদ্ধ করে উদারতাকে হারিয়ে ফেলেছি! কিন্তু রাসূল ﷺ স্বীয় হাতে ও মুখেই রেখেছিলেন সেই হৃদয়ের চাবি। ইনি সেই রাসূল; যিনি শিশুদের অনেক ভালোবাসতেন এবং তাদেরকে স্নেহ ও কদর করতেন এবং তাদেরকে যথাযথ মূল্যায়ন করতেন।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ» وَقَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

---

[১৮৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১২৮৪

[১৮৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১৩০৩

"আনাস " শিশু-কিশোরদের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার সময় সালাম দিতেন এবং বলতেন: রাসূল ﷺ এরূপই করতেন।"[১৯০]

শিশুদের শিক্ষা দেওয়া বা তাদের লালন-পালন চঞ্চল ও দুষ্টামি করাতে যেমন রয়েছে কষ্ট তেমনি রয়েছে ক্লান্তি...এরপরও রাসূল # তাদের উপর রাগ করতেন না ও তাদেরকে ধমকি বা গালিও দিতেন না। রাসূল # তাদের সাথে কোমল ব্যবহার ও দয়াসুলভ আচরণ করতেন।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ

"নবী করীম ﷺ-এর নিকট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে আসা হতো, তিনি তাদের জন্য দু'আ করে দিতেন। একবার তার কাছে এক ছেলে বাচ্চা আনা হলে, [তিনি সে বাচ্চাকে কোলে নেওয়ায়] সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল, তিনি পানি নিয়ে আসতে বললেন, কাপড় ধৌত না করে সে পানি পেশাবের জায়গায় ব্যবহার করলেন।"[১৯১]

প্রিয় পাঠক! আপনি নবীর ঘরে শুভাগমন করেও কি আপনার আগ্রহ সৃষ্টি হবে না যে, আপনি আপনার ছোটদের সাথে খেল-তামাশায় লিপ্ত হবেন, আপনার ছেলেদের সাথে রসিকতা করবেন? তাদের ফেটে পড়া হাসি ও চমৎকার চমৎকার ভাষা শুনাবেন!? অথচ মুসলিম জাতির নবী ﷺ শিশুদের সাথে এমনটি করতেন।

হযরত আবু হুরাইরা " হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْلِعُ لِسَانَهُ لِلْحُسَيْنِ، فَيَرَى الصَّبِيُّ حُمْرَةَ لِسَانِهِ، فَيَهَشُّ إِلَيْهِ

"রাসূল ﷺ হাসান বিন আলীর জন্য স্বীয় জিহ্বাকে বের করে দিতেন, অতঃপর ছোট ছেলে জিহ্বার লালিমা দেখে আনন্দ ভোগ করত।"[১৯২]

হযরত আনাস " হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

---

[১৯০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৬২৪৭

[১৯১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৬৩৫৫

[১৯২] সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং : ৬৯৭৫

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَاعِبُ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَهُوَ يَقُوْلُ: يَا زُوَيْنَبُ، يَا زُوَيْنَبُ، مِرَارًا.

"নবী করীম ﷺ উম্মে সালামার ছোট কন্যা যায়নাবকে নিয়ে খেলা করতেন আর বারবার বলতেন: হে যুয়াইনাব, ওহে যুয়াইনাব! ।"[১৯৩]

রাসূল ﷺ-এর বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ দীর্ঘায়িত হয়ে মহা ইবাদাতেও পৌঁছে যায়। তাঁর মেয়ে যায়নাবের কন্যা উমামাকে 'আবি আলআস বিন আররবী' এর কন্যাকে বহন করা অবস্থায় সালাত পড়তেন, যখন তিনি দাঁড়াতেন তাকে বহন করতেন, আর সিজদার সময় নামিয়ে রেখে সিজদা করতেন। [বুখারী ও মুসলিম]

মাহমুদ বিন আররবী' " হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ

"রাসূল ﷺ আমাদের বাড়ির কুয়ার পানির বালতি থেকে মুখে নিয়ে কুলি করে আমার মুখে পানি ছিটা দেয়ার ঘটনা এখনও মনে পড়ে, সে সময় আমার বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর।"[১৯৪]

নবী ﷺ যেমন বড়দের শিক্ষা দিতেন, তেমনি ছোটদেরকেও শিক্ষা দিতেন। হযরত ইবনে আব্বাস " বলেন:

يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ

"একদা আমি রাসূল ﷺ-এর পেছনে ছিলাম, অতঃপর তিনি আমাকে ডেকে বললেন: হে বৎস! আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দেব। আর তা হলো: তুমি আল্লাহর অধিকার ও ইবাদাত রক্ষা করবে, আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করবেন। তুমি যদি আল্লাহর অধিকারকে রক্ষা করো, তবে বিপদে তাঁকে তোমার [সাহায্যকারী রূপে] সামনে পাবে। আর যখন তুমি কিছু চাইবে, তখন একমাত্র

---

[১৯৩] আহাদীসুস সহীহাহ ২৪১৪, সহীহুল জামে ৫০২৫

[১৯৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৭৭

আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই করবে।"[১৯৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র আদর্শ ও মহান সীরাত সম্পর্কে জানলাম, আমরা এগুলো দ্বারা আমাদের অন্তরকে উজ্জিবিত করে পরবর্তীদের জীবন চলার জন্য সে আদর্শ হিসেবেরেখে যাব। যার ফলে এ ছোটরাই স্নেহ-আদর ও উত্তম চরিত্র নিয়ে জাতির নেতৃত্ব দেয়ার মহান ব্যক্তিতে পরিণত হবে। আল্লাহর তাওফীকে তারাই উত্তম জননী ও আদর্শ পিতা হিসেবে গড়ে উঠবে।

২০. সহনশীলতা, নম্রতা ও ধৈর্যশীলতা

কঠোরতা ও জোর-জবরদস্তি করে অধিকার আদায়, জালেম ও অত্যাচারীর চরিত্র। কিন্তু আমাদের নবী ﷺ হকদারের ন্যায় সংগত হক আদায় ও তার সহায়তার নিমিত্তে ন্যায়ের মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন। যেন তারা তাদের হক বুঝে পায় ও তা গ্রহণ করে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী ﷺ-কে ন্যায় ও সত্যের পথে আদেশ ও নিষেধের যে আদর্শ দান করেছেন, তা তিনি বাস্তবায়ন করেছেন। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে কোন কঠোরতা, জবরদস্তি ও জুলুম-অত্যাচারের কোন নমুনা দেখতে পাইনা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ এক জিহাদের ময়দান ব্যতীত তার হাত দিয়ে কাউকে মারেননি, এমনকি তার স্ত্রী ও খাদেমকেও না। তাঁকে কোন ব্যাপারে প্রতিশোধ নিতে দেখিনি, তবে কেউ আল্লাহর বিধানের অবমাননা করলে তিনি আল্লাহর হকের জন্যই প্রতিশোধ নিতেন।"[১৯৬]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ» ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، حَتَّى «نَظَرْتُ

---

[১৯৫] তিরমিযী, হাদীস নং : ২৫১৬

[১৯৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৩২৮/৭৯

إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ» . ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ. «فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে চলছিলাম, তাঁর গায়ে ছিল মোটা ঝালরযুক্ত নাজরানী চাদর। অত:পর এক বেদুইন তাকে ধরে সজোরে টানতে লাগল, আমি তাকিয়ে দেখি তার ঘাড়ে জোরে টানের চোটে চাদরের ঝালরের দাগ লেগে গেছে। তারপর বেদুইন বলে উঠল: হে মুহাম্মাদ! তোমার কাছে যে সম্পদ আছে, তা আমাকে দেয়ার আদেশ দাও। তিনি তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন ও তাকে দেয়ার আদেশ দিলেন।"[১৯৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইনের যুদ্ধ শেষে ফিরছিলেন, এমতাবস্থায় কতিপয় বেদুইন তাঁর অনুসরণ করে তাঁর নিকট চাইতে থাকল। অত:পর তারা তাঁকে এক বৃক্ষের দিকে নিয়ে আসল, তারপর তিনি স্বীয় সওয়ারীর ওপর থাকা অবস্থায় তাঁর চাদর নিয়ে নেয়া হল। তিনি বলেন:

رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي، أَتَخْشَوْنَ عَلَيَّ الْبُخْلَ، فَوَاللَّهِ لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا، وَلَا جَبَانًا، وَلَا كَذَّابًا

"আমাকে আমার চাদর ফিরিয়ে দাও, আমার ওপর কি কৃপণতার ভয় কর? তিনি আবার বল্লেন: আল্লাহর শপথ! আমার নিকট যদি এ বৃক্ষসমূহ পরিমাণও পশু থাকত তবুও আমি তা তোমাদের মাঝে বিতরণ করে দিতাম। তারপর তোমরা আমাকে না কৃপণ পেতে, না কাপুরুষ, না মিথ্যাবাদী পেতে।"[১৯৮]

কতই না সুন্দর তার আচরণ এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের চিত্র। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নমনিয়তা এবং উপকারী ও কল্যাণজনক বিষয়কে বুঝান ও অন্যায় অকল্যাণকে প্রতিকার করাই ছিল তাঁর কর্ম।

---

[১৯৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৫৮০৯

[১৯৮] জামে মুআম্মারে ইবনে রাশেদ, হাদীস নং : ২০০৪৯

সাহাবারা যখন দেখল যে, মসজিদে পেশাবকারী ভুল পথে পা বাড়িয়েছে, তারা রাগান্বিত হয়ে অতি তাড়াতাড়ি তাকে বারণ করার চেষ্টা করতে গেল, তাদের এ কাজ করার অধিকারও রয়েছে। কিন্তু দয়ার সাগর নবী ﷺ তাদেরকে বাধা দিলেন, কেননা বেদুইন ছিল অজ্ঞ ব্যক্তি, আর তা করলে তার ক্ষতি হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছেন তা ছিল অনুপম উত্তম।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

"এক বেদুইন মসজিদে ঢুকলো এবং মসজিদের ভেতর পেশাব করা আরম্ভ করলো, সাহাবীরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন: তোমরা তাকে বারণ করো না, ছেড়ে দাও এবং পেশাবের জায়গায় এক বালতি পানি ঢেলে দাও। নিশ্চয়ই তোমরা সহজতা আরোপকারী হিসেবেই প্রেরিত হয়েছ, কঠোর হয়ে প্রেরিত হওনি।"[১৯৯]

দাওয়াতী কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে ধৈর্য, তার অনুসারী দাবীদারদের জন্য অপরিহার্য হল সে অনুযায়ী তার আদর্শ মত চলা এবং নিজেকে অধৈর্যের মুখে ঠেলে না দেয়া। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟ فَقَالَ: "لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ

---

[১৯৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ২২০

لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ ". قَالَ: فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، فَمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ ". فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئً

"আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ওপর ওহুদ যুদ্ধের দিনের চেয়ে কঠিন কোন সময় কি অতিবাহিত হয়েছে? তিনি উত্তরে বলেন: আমি তোমার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যা পেয়েছি। আর তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন ছিল, যা আমি তাদের পক্ষ থেকে 'আকাবার দিনে পেয়েছি। আমি যখন ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য নিজকে ইবনে আবদ য়ালীল বিন আবদে কিলালকে উপস্থাপন করেছিলাম, আমি যা চেয়েছিলাম সে ব্যাপারে তারা আমার ডাকে সাড়া দেয়নি। আমি সেখান থেকে বিষন্ন হৃদয়ে ফিরে এসেছিলাম। আমি কারনুস সায়ালেব [ছায়লুল কাবীর] এ আসার পর আমার পূর্ণ জ্ঞান ফিরেছিল। অত:পর আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, এক খণ্ড মেঘমালা আমাকে ছায়া দিচ্ছে। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখি যে, সেখান থেকে জিবরীল [আলাইহিস সালাম] আমাকে ডেকে বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আপনার সম্প্রদায়ের কথা শুনেছেন ও তারা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন তাও অবগত হয়েছেন। অত:পর তিনি পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেস্তাকে প্রেরণ করেছেন, আপনি তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য তাকে যা ইচ্ছা নির্দেশ দিতে পারেন। এরপর পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেস্তা আমাকে সালাম দিয়ে বললেন: হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আপনার সম্প্রদায় আপনার সাথে কিভাবে কথা বলেছে তা শুনেছেন। আর আমি পাহাড়ে নিযুক্ত ফেরেস্তা, আমাকে আমার প্রতিপালক আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন, আপনি যেন আমাকে যা ইচ্ছা নির্দেশ দেন। আপনি যদি চান, তবে মক্কা বেষ্টিত দুই বড় পাহাড়কে তাদের ওপর সমন্বয় করে দেই। অত:পর নবী ﷺ বলেন: আমি চাই, আল্লাহ তা'আলা তাদের ঔরসে এমন সন্তান জন্ম দিবেন, যারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই ইবাদাত করবে ও তার সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করবে না।"[২০০]

---

[২০০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৭৯৫/১১১

বর্তমানে অনেকেই দাওয়াতী কাজে তাড়াহুড়া করে থাকে এবং অতি দ্রুত এ কাজের ফলাফল পেতে চায়। প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেয়া দাওয়াতী ক্ষেত্রে ও একটি বড় দোষ। উক্ত দোষ দায়ীদের মাঝে বিস্তার হওয়ার কারণে অনেক দাওয়াতী কাজ নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কোথায় সে ধৈর্য ও কোথায় সে সহনশীলতা। অনেক বছর পর, অনেক কষ্ট সহ্য, অনেক ধৈর্য ধারণ এবং অনেক যুদ্ধ-জিহাদের পরই তো রাসূলুল্লাহ ﷺ যা চেয়েছিলেন তা প্রতিফলিত হয়েছিল!!

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোন এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করতে দেখছি তিনি বলেন,

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ

"সে নবীর সম্প্রদায় তাঁকে মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছে, তিনি মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছা অবস্থায় বলছে: হে আল্লাহ! তুমি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দাও। কেননা তারা বুঝে না।"[২০১]

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের সাথে কোন জানাজা নামাযে উপস্থিত ছিলেন, এমতাবস্থায় যায়েদ বিন সু'নাহ নামক জনৈক ইয়াহুদী তার প্রাপ্ত ঋণ চাওয়ার জন্য এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামার কলার ও চাদর ধরে রাঙ্গা চোখে বলল: ওহে মুহাম্মাদ! তুমি আমার প্রাপ্ত ঋণ পরিশোধ করবে না? এবং সে অনেক শক্ত শক্ত কথা বলল। এ দৃশ্য দেখে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু রেগে গেলেন ও যায়েদের দিকে তাকালেন এমতাবস্থায় তাঁর উভয় চক্ষু যেন ঘুর্ণিয়মান তারকার মত স্বীয় কক্ষপথে ঘুরার মত ঘুরছে। অত:পর বললেন: ওহে আল্লাহর দুশমন! তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এমন কথা বললে আমি যা শুনছি, আর এমন ব্যবহার করলে যা আমি দেখছি? যিনি তাঁকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তার শপথ করে বলছি, আমি যদি তার তিরস্কারের ভয় না করতাম তবে আমার তলোয়ার দ্বারা এখনই তোমার মাথাকে আলাদা করে দিতাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ শান্তভাবে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দিকে তাকাচ্ছিলেন, অত:পর বললেন:

---

[২০১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৩৪৭৭

يَا عُمَرُ، أَنَا وَهُوَ كُنَّا أَحْوَجَ إِلَى غَيْرِ هَذَا، أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الْأَدَاءِ، وتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ التِّبَاعَةِ، اذْهَبْ بِهِ يَا عُمَرُ وأَعْطِهِ حَقَّهُ وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

"ওহে উমার! শুন, আমি ও সে ব্যক্তি তোমার নিকট থেকে এ রকম আচরণ আশা করিনি। তোমার নিকট হতে এ আশা করি যে, তুমি আমাকে ঋণ পরিশোধ করার অনুরোধ করবে ও তাকে সুন্দর আচরণ করতে বলবে।"[২০২]

উমার তুমি তাকে নিয়ে গিয়ে তার অধিকার দিয়ে দাও ও অতিরিক্ত বিশ সা' খেজুর দিয়ে দাও।

যায়েদ [ইয়াহুদী] বলে, উমার যখন আমাকে বিশ সা' খেজুর বেশী দিল, তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে উমার! বেশী দিলে কেন? উমার বললেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার রাগের পরিবর্তে বেশী দিতে বলেছেন। যায়েদ বলল:? হে উমার! তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছো? উমার বলেন: না, তবে তুমি কে? সে বলল: আমি যায়েদ বিন সু'নাহ।

তিনি বলেন: ও! তুমি ইয়াহুদী পাদ্রী? আমি বললাম: হ্যাঁ,। তিনি বললেন: তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এরূপ আচরণ করলে কেন? এরূপ কথা বললে কেন? সে বলল: হে উমার! আমি যখন তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলাম, তখন তার চেহারার মাঝে নবূয়তের দুটি আলামত ব্যতীত সব বুঝতে পেরে ছিলাম, আর আমি তার নিকট থেকে এ দুটি আলামত সম্পর্কে অবহিত হইনি: আর তা হল: [১] তাঁর সহিষ্ণুতা অজ্ঞতার ওপর অগ্রগামী কি না। [২] মূর্খতা বশত তাঁর সাথে কেউ যত বেশী অসদাচরণ করবে তার ধৈর্য আরো বৃদ্ধি পাবে। এ দুটি বিষয় পরীক্ষার জন্যই আমি এ আচরণ করেছি। ওহে উমার! তোমাকে সাক্ষী করে বলছি: আল্লাহ তা'আলা আমার রব্ব হওয়াতে, ইসলাম আমার দ্বীন হওয়াতে ও মুহাম্মাদ ﷺ আমার নবী হওয়াতে আমি সন্তুষ্ট। আমি তোমাকে এও সাক্ষী রাখছি যে, আমার অর্ধেক সম্পদ মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতের জন্য সাদকা করে দিলাম। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: আপনি তাদের কতিপয়ের জন্য নির্ধারণ করুন, কেননা আপনি তাদের সবাইকে দিতে পারবেন না। যায়েদ

---

[২০২] মুজামুল কবীর তাবরানী, হাদীস নং : ৫১৪৭

বলল: তাদের কতিপয়ের জন্যই। এরপর যায়েদ [ইয়াহুদী] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমীপে হাজির হয়ে বলল:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

সে তাঁর ওপর ঈমান আনলো ও তাঁকে নবী রূপে বিশ্বাস স্থাপন করলো।[২০৩]

আমরা ঘটনাটি আদ্যপ্রান্ত চিন্তা করি, যাতে আমরা পেতে পারি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ, অনুসরণের একটি বড় শিক্ষণীয় অংশ। মানুষকে দয়া ও নমনিয়তার মাধ্যমে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে পাব ধৈর্যের শিক্ষা। আর যদি তারা সদ্ব্যবহার করে তবে তাতে তাদেরকে উৎসাহিত করা হবে তাতে তাদের হৃদয়ে শুভ আশাবাদ উজ্জীবিত হবে।

২১. শত্রুদের প্রতি তাঁর দয়া ও অনুকম্পা

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সমগ্র মানব জাতির জন্য রহমত বিশেষ। এ বিশেষণে বিশেষায়িত করে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করছেন।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.

আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।[২০৪]

নবী করিম ﷺ বলেন:

وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً

"আমি তো রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছি।"[২০৫]

তাঁর দয়া ও রহমত ছিল মুসলিম অমুসলিম সবার ক্ষেত্রেই ব্যাপক।

সাহাবী তোফায়েল বিন আমর আদদাওসী যখন নিজ কবীলা দাওসের হেদায়েত প্রাপ্তি নিয়ে একেবারে নিরাশ হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে আরজ করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! দাওস সম্প্রদায় নাফরমানী করছে এবং হক গ্রহণে

---

[২০৩] হাকেম মুসতাদরাকে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন

[২০৪] সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং : ১০৭

[২০৫] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৫৯৯/৮৭

অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। আপনি তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট বলুন, তাদের ওপর বদ-দুআও করুন।

দরখাস্ত শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবলামুখী হয়ে দু হাত ওঠালেন। দৃশ্য দেখে লোকেরা দাওস গোত্রের ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে নিঃসংশয় হয়ে গেল। কিন্তু রহমতের নবী দোয়া করে বললেন:

اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ

"হে আল্লাহ দাওসকে হেদায়াত দান কর এবং সুপথে নিয়ে আস।"[২০৬]

তাদের জন্যে তিনি হেদায়াত ও কল্যাণের দুআ করলেন। ধ্বংস ও বিনাশের দুআ হতে তিনি বিরত রইলেন। কারণ তিনি মানবতার জন্যে শুধু কল্যাণই কামনা করতেন, তিনি তাদের সফলতা ও মুক্তির প্রত্যাশা করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্যে তায়েফ গিয়েছেন। কিন্তু তায়েফবাসী তাঁর এ কল্যাণময় আহ্বান শোনার কথা দূরে থাক, বরং তারা তাকে বিদ্রূপ ও উপহাস করল। দুষ্ট লোকদের তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল। তারা তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করে রক্তাক্ত করে দিল, তাঁর গোড়ালিদ্বয় থেকে অজস্র রক্ত ঝরল।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা উক্ত ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জানতে চাইলাম, আপনার জীবনে উহুদের দিন থেকেও মারাত্মক কোন দিন কি অতিবাহিত হয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: (হ্যাঁ), তায়েফের দিন তোমার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যা পেয়েছিলাম। তাদের কাছ থেকে যে ব্যবহার আমি পেয়েছিলাম সেটি ছিল খুবই ভয়াবহ যখন আমি নিজেকে ইবনে আবদে ইয়ালীল বিন আবদে কুলালের সামনে পেশ করেছিলাম। কিন্তু তার কাছে যা আশা করেছিলাম সেটি পাইনি। তাই দুঃখ ভরা হৃদয় ও বিষন্ন চেহারা নিয়ে ফিরে আসছিলাম। করনুস সাআলিব নামক স্থানে এসে চৈতন্য ফিরে পেলাম। মাথা উপরে উঠিয়ে দেখি একগুচ্ছ মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখি সেখানে জিবরাইলও আছেন। আমাকে ডেকে বললেন, আপনার পালনকর্তা আপনার কওমের কথা এবং তারা যে উত্তর দিয়েছে সবই শুনেছেন। তিনি আপনার নিকট পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। তাদের ব্যাপারে আপনার যা ইচ্ছা তাই নির্দেশ করুন। তিনি বলেন, এরপর পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত

---

[২০৬] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ২৯৩৭

ফেরেশতা আমাকে ডেকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয় আল্লাহ আপনার জাতির কথা এবং আপনার সাথে তাদের দুর্ব্যবহার সম্পর্কে সবই জানেন। আমি পাহাড়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা। আল্লাহ আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। তাদের ব্যাপারে আপনার যা ইচ্ছা তাই আমাকে আদেশ করুন। আপনি ইচ্ছে করলে তাদের দুই পাশের দুই পাহাড়কে একত্রিত করে দিবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বরং আমি চাই আল্লাহ তাআলা তাদের ঔরস থেকে এমন সব লোক বের করবেন যারা একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না।

এটিই হচ্ছে নববী রহমত, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রক্তঝরা জখম, ভগ্ন হৃদয়, ক্ষত-বিক্ষত অন্তর- সব ভুলিয়ে দিয়েছে এবং এমন অবস্থায় তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে যে তাদের কল্যাণ ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা তিনি করেননি। তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসা এবং সিরাতে মুস্তাকীমের পথ দেখানো ব্যতীত অন্য কিছু ভাবেননি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয় করলেন, দশ হাজার যোদ্ধার একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে তাতে প্রবেশ করলেন। যারা তাঁকে নির্যাতন করেছিল, দূরে ছুঁড়ে মেরেছিল, হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, নিজভূমি হতে অন্যায়ভাবে বের করে দিয়েছিল, তাঁর সাথি-সঙ্গীদের হত্যা করেছিল এবং তাদের দ্বীনকে কেন্দ্র করে নির্যাতন চালিয়েছিল, আজ আল্লাহ তাআলা তাঁকে সে সব লোকদের ওপর কর্তৃত্ব দান করলেন। এ মহান বিজয় সাধিত হওয়ার পর জনৈক সাহাবী বললেন:

الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ

আজ হচ্ছে তীব্র লড়াই ও হতাহতের দিন।

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

بَلِ الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ

আজ বরং অনুকম্পা ও দয়া প্রদর্শনের দিন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেসব পরাভূত লোকদের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন, যাদের চক্ষু হয়ে গিয়ে ছিল ছানাবড়া, গলা বুক গিয়েছিল শুকিয়ে এবং অন্তরাত্মা হয়ে গিয়েছিল ভীত-সন্ত্রস্ত। যারা অপেক্ষা করছিল এ বিজয়ী নেতা তাদের সাথে কী ধরনের আচরণ করেন, তাদের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তা দেখার জন্যে। তারা তো সে জাতি যারা প্রতিশোধ গ্রহণ ও গাদ্দারিতে ছিল সিদ্ধহস্ত যেমনটি করেছিল উহুদসহ অন্যান্য যুদ্ধে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের লক্ষ্য করে বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সাথে কীরূপ আচরণ করব বলে তোমাদের ধারণা। তারা বলল, ভাল ও সুন্দর আচরণ। তুমি সম্মানিত ভাই ও সম্মানিত ভাইয়ের পুত্র। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যাও, তোমরা সকলেই মুক্ত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যথার্থই বলেছেন:

إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ

"নিশ্চয় আমি উপহারস্বরূপ প্রদত্ত রহমত।"[২০৭]

২২. জীব-জন্তু ও জড়পদার্থের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দয়া-অনুকম্পা মুসলিম- অমুসলিম সকলের জন্য ব্যাপ্ত ছিল, বিষয়টি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এবার আমরা আলোচনা করব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মায়া-মমতার আরও বিস্তৃত পরিধি নিয়ে। অর্থাৎ তাঁর এ অনুকম্পা শুধুমাত্র মানব জাতি পর্যন্ত সীমিত ছিল এমন নয়, বরং তা জীব-জন্তু ও জড়পদার্থকেও শামিল করেছে চমৎকারভাবে।

এক বর্ণনায় এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, পথিমধ্যে কঠিন পিপাসায় আক্রান্ত হয়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি কূপের সন্ধান পেল। সে তাতে নেমে পানি পান করে বের হয়ে এসে দেখতে পেল একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে আর কাদামাটি খাচ্ছে। লোকটি নিজ মনে বলল: পিপাসার কারণে কুকুরটির তেমন কষ্টই হচ্ছে যেমনটি হয়েছিল সামান্য আগে আমার। এ চিন্তা করে সে কূপে অবতরণ করে নিজ মোজায় পানি ভর্তি করল এরপর পানি ভর্তি মোজা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে উপরে উঠে আসল এবং পানি কুকুরকে পান করাল। আল্লাহ তাআলা তার এ কাজ পছন্দ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবাগণ জানতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! এসব জন্তু-জানোয়ারের মাঝেও কি আমাদের জন্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: প্রাণ স্পন্দন আছে এমন প্রতিটি বস্তুর সেবায় ছাওয়াবের ব্যবস্থা আছে।

এ ব্যাপক অর্থবোধক নীতিবাক্যের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ পৃথিবীর তাবৎ পশুসম্পদ প্রতিরক্ষা পরিষদ ও সংস্থা যারা পশুকুলের প্রতি মমত্বপূর্ণ আচরণ নিশ্চিত করণ ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের

---

[২০৭] মুসান্নেফে আবি শায়বা, হাদীস নং : ৩১৭৮২

সবাইকে পিছনে ফেলে শীর্ষ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বরং সেদিন হতেই তাদের থেকে শত-সহস্র বছরের পথ এগিয়ে রয়েছেন যেদিন তিনি বলেছেন :

জনৈকা নারী একটি বিড়ালের কারণে শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে, সে ঐ বিড়ালটি মৃত্যু অবধি বন্দি করে রেখেছিল, ফলে সেই নারীকে ঐ বিড়ালের কারণে জাহান্নামে যেতে হবে। বন্দি করে সে তাকে খেতে ও পান করতে দেয়নি এবং মুক্ত করে দেয়নি যে পড়ে থাকা আবর্জনা কুড়িয়ে খাবে।

এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য, তাঁর সাহাবীদের জীব-জন্তুর প্রতি যত্নশীল ও দরদি করে তোলা এবং সংগত কারণ ছাড়া জীব-জন্তু হত্যা না করা কারণ বিনা প্রয়োজনে কোন প্রাণী মারাত্মক অপরাধ যার কারণে হত্যাকারীকে জাহান্নামে যেতে হবে।

নবী করিম ﷺ বিনা কারণে জন্তু হত্যা থেকে বিরত থাকার জন্যে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। বলেছেন:

কেউ চড়ুই বা তার চেয়ে ছোট কোন পাখি নাহকভাবে হত্যা করলে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। প্রশ্ন করা হল : ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তার হক কি? বললেন: তার হক হল, জবাই করা অতঃপর খাওয়া। মস্তক ছিঁড়ে তাকে ছুঁড়ে না মারা। পশু-পাখি জবাই করার সময় জবাই প্রক্রিয়া সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা এবং দয়া ও মমতাপূর্ণ আচরণের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষ নির্দেশ প্রদান করেছেন।

তিনি বলেছেন:

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তুতে ইহসানকে ফরয করেছেন, অতএব তোমরা যখন হত্যা করবে সুন্দরভাবে করবে আর যখন জবাই করবে মমতার সাথে-সুন্দরভাবে জবাই করবে এবং তোমাদের প্রত্যেকেই যেন (জবাইয়ের পূর্বে) নিজ ছুরি ধার দিয়ে নেয় এবং জবাইকৃত জন্তুকে যেন আরাম দান করে।

কতিপয় আলেম বলেছেন: জবাইর ক্ষেত্রে ইসলামের এ সুন্দরতম ও মানবতাপূর্ণ রীতি দেখে অনেক পশ্চিমা লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। ইসলাম যে সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ দ্বীন এটি তারই প্রমাণ বহন করে।

নবী আকরাম ﷺ আরো ইরশাদ করেছেন:

لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

"প্রাণ আছে এমন কোন বস্তুকে তোমরা নিশানা হিসাবে ব্যবহার কর না।"[২০৮]

অর্থাৎ তিরন্দাজি প্রশিক্ষণকালে কোন জীবকে নিশানা হিসেবে স্থাপন করো না। কেননা এরূপ করা দয়া ও অনুকম্পা পরিপন্থী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম মিশন ছিল সব জায়গা থেকে সর্বপ্রকার নির্যাতন ও নিপীড়ন দূর করা, এমনকি জীব-জন্তুর ক্ষেত্রেও তাঁর এ প্রচেষ্টা ছিল দুর্বার। এসব কাজে তিনি খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার জনৈক আনসারী সাহাবীর খেজুর বাগানে তাশরীফ রাখলেন। সেখানে একটি উট বাধা ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে সে শব্দ করে কেঁদে উঠল, এতে তার দু গাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। রাসূলুল্লাহ উটের নিকটে এলেন এবং তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। উট শান্ত হয়ে গেল। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এ উটের মালিক কে?

এক আনসারী যুবক এসে বলল: আমি, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ বললেন:

أَلَا تَتَّقِي اللهَ فِيْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الَّتِيْ مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا ؟ فَإِنَّهُ شَكَىٰ إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ.

"এসব জীব-জন্তু আল্লাহ তাআলা যেগুলো তোমার মালিকানায় দিয়েছেন, এ সবের ব্যাপারে তুমি কি আল্লাহকে ভয় করনা? সে এসে আমার নিকট অভিযোগ করল : তুমি তাকে খেতে দাও না এবং লাগাতার কাজে খাটিয়ে তাকে ধ্বংস করে দিচ্ছ।"

এ রহমতে মুহাম্মাদী থেকে কেউই বঞ্চিত হয়নি। জিন-ইনসান থেকে শুরু করে জীব-জন্তু পর্যন্ত সমানভাবে তাঁর দয়া-অনুকম্পা উপভোগ করে গেছে, এমনকি জড় পদার্থও মুহাম্মাদী অনুকম্পায় তাদের পরিপূর্ণ হিস্‌সা বুঝে পেয়েছিল।

ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করেন:

নবীজীর জন্যে মিম্বার তৈরি করা হলে, যে খেজুর বৃক্ষের সাথে দাঁড়িয়ে তিনি খোতবা দিতেন সেটি ছোট শিশুর মত কান্না জুড়ে দিল। অবস্থা দেখে তিনি মিম্বার থেকে নেমে আসলেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন সেটি সান্ত্বনা প্রদত্ত শিশুর ন্যায় বিলাপ করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: সে আগে যিকির-আযকার এবং ওয়াজ নসিহত শ্রবণ করত সে দুঃখে এখন কাঁদছে।

---

[২০৮] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ৫৮

আল্লামা হাসান রহ. যখন এ হাদীসের আলোচনা করতেন খুব কাঁদতেন আর বলতেন: হে মুসলিমবৃন্দ, একটি কাঠ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাতের আগ্রহে কাঁদতে পারে তাহলে তোমরা তাঁর প্রতি আরো আগ্রহী হওয়ার অধিক উপযোগী।

২৩. উম্মতের প্রতি নবীজীর দয়া ও সহানুভূতি

নবী করিম ﷺ তার উম্মতের প্রতি ছিলেন খুবই দয়াবান। যখন তাঁকে দুটি বিষয়ের একটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হত তখন তিনি সহজ বিষয়টি বেছে নিতেন। যাতে উম্মতের কষ্ট দূর হয় এবং তাদের জন্য বিষয়টি সহজ হয়।

এজন্যই তিনি বলেছেন:

إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا، وَلَا مُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا

নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে জোরপ্রয়োগকারী ও কঠোরতাকারী হিসেবে প্রেরণ করেননি বরং তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন শিক্ষক ও সহজকারী হিসেবে।[২০৯]

তিনি আরো বলেন:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ.

নিশ্চয় আল্লাহ দয়ালু, দয়া করা পছন্দ করেন, দয়ার কারণে সে পুরস্কার দান করেন যা কঠোরতায় দান করেন না।[২১০]

আরও ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

"নিশ্চয়ই কোমলতা ব্যতীত কোনো বস্তুতেই সৌন্দর্য পাওয়া যাবে না। আর যে বস্তু থেকে তা সরিয়ে নেওয়া হবে তা তাকে অসুন্দর করে দেবে।"[২১১]

আল্লাহ তাআলা তার নবীর দয়া এবং নমনীয়তার প্রশংসা করে বলেন:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

---

[২০৯] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৪৭৮/২৯

[২১০] সুনানে আবি দাউদ, হাদীস নং : ৪৮০৭

[২১১] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৫৯৪/৭৮

তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দু:খ-কষ্ট তার পক্ষে দু:সহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।[২১২]

উম্মতের প্রতি তার দয়ার দৃষ্টান্ত,

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল: হে রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি।

রাসূলুল্লাহ বললেন: তোমাকে কীসে ধ্বংস করেছে?

সে বলল: আমি রমযানের দিনের বেলায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি একজন গোলাম আযাদ করতে পার? সে বলল: না।

তারপর বললেন: তাহলে তুমি কি দুই মাস লাগাতার রোযা রাখার সামর্থ্য রাখ?

সে বলল: না।

রাসূলুল্লাহ বললেন: তাহলে কি তুমি ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে পারবে? বলল: না।

লোকটি অপেক্ষা করছিল, এরই মাঝে একটি খেজুর ভর্তি থলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে আনা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তুমি এগুলো সদকা করে দাও।

লোকটি বলল: আমার থেকে বড় অভাবী কে? মদীনার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে এমন কোন পরিবার পাবেন না যারা আমার চেয়ে দরিদ্র। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে হাসলেন যে তাঁর গজদন্ত বের হয়ে পড়ল। এরপর তিনি বললেন, তুমি এগুলো নিয়ে যাও এবং নিজ পরিবারকে প্রদান কর।

সম্মানিত পাঠক, যে লোকটি রমযানের দিনে ভুল করল এবং স্ত্রীর সাথে সহবাস করল তার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতো মমত্ব ও দয়াপূর্ণ আচরণ করলেন তা একটু ভেবে দেখুন।

রাসূল সা: বার বার তার সাথে নম্রতা প্রদর্শন করছিলেন এবং কঠিন শাস্তি থেকে তুলনামূলক সহজ শাস্তির দিকে নিয়ে এসেছেন। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যে, তিনি তাকে অপরাধ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মুক্তিপণ আদায়ের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন।

---

[২১২] সূরা তাওবা, আয়াত নং : ১২৮

বরং তার দারিদ্র্য ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি খাবার নিয়ে তার পরিবারস্থ লোকদের মাঝে বণ্টন করার অনুমতিও প্রদান করেছেন। কি অভূতপূর্ব মায়া ও নম্রতা। কেমন হৃদয় নাড়া দেয়া কোমলতা। এ হল নববী দয়া আর এমনই ছিল মুহাম্মদী হৃদ্যতা।

মুয়াবিয়া বিন হাকাম আস্‌সুলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এর সাথে সালাত আদায় করছিলাম, হঠাৎ, সালাতে এক লোক হাঁচি দিল, তার উত্তরে আমি বললাম, يَرْحَمُكَ اللهُ অর্থাৎ, আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন ! এ শুনে সবাই আমার দিকে কড়াভাবে তাকাল, আমি তাদেরকে বললাম, হায় দুর্ভোগ ! তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছ কেন? তারা তাদের হাত দিয়ে উরুতে আঘাত করতে লাগল, আমি বুঝতে পারলাম তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে। তাই আমি নীরব হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করে বলেন, নিশ্চয় সালাতে মানুষের নিজেদের কোন কথা বলার অবকাশ নেই বরং সালাত হলো তাসবীহ, তাকবীর এবং কুরআন তিলাওয়াত।তাঁর জন্য আমার মাতা পিতা উৎসর্গ হোক, তাঁর পূর্বে আমি তাঁর চেয়ে উত্তম শিক্ষক এত সুন্দরভাবে শিক্ষা প্রদান করতে দেখিনি। আল্লাহর কসম তিনি আমাকে কোন প্রকার গালমন্দ করেননি, কোন রূপ তিরস্কার করেননি এবং কোন প্রকার মারধর করেননি-

ইমাম নববী রহ. বলেন, এ হাদীস আমাদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়।

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহান চরিত্র, যার ওপর তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং যার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা প্রদান করেছেন।

২. জাহেল মূর্খদের প্রতি তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ এবং তাদের প্রতি তাঁর দয়া ও নম্রতা প্রদর্শন।

৩. এবং জাহেল-মূর্খদের সাথে হৃদ্যতা ও দয়াপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন, তাদেরকে কোন বিষয় শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি অবলম্বন বা উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান, তাদের প্রতি মমতা প্রদর্শন এবং সঠিক বিষয়টি তাদের বোধ ও বুঝের নিকটবর্তী করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্রে নিজেদের চরিত্রবান করার ব্রত গ্রহণ করা।

উম্মতের প্রতি তাঁর সহানুভূতির আরো একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে তাদের ওপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সওমে বিসাল তথা ইফতার ও সাহরী বিহীন লাগাতার রোযা রাখার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।

সহানুভূতির আরো একটি নিদর্শন:

তিনি রমযানে তিন বা ততোধিক রাত মসজিদে কিয়ামুল্লাইল করেছিলেন, এক পর্যায়ে তাঁর পেছনে বহু লোক সমবেত হয়ে গেলো, আর তিনি আশঙ্কা করলেন এভাবে চলতে থাকলে হয়ত সেটি তাদের ওপর ফরয হয়ে যাবে। তাই তিনি আর সেখানে উপস্থিত হননি।

উম্মতের প্রতি দয়া ও সহানুভূতির আরো একটি উদাহরণ:

তিনি একদিন মসজিদে গিয়ে মসজিদের দুই খুঁটিতে রশি বাঁধা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন: এ রশি কেন? লোকেরা বলল: এটি যয়নবের রশি। (ইবাদত করতে করতে) ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি এতে ঝুলে পড়েন। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, রশিটি খুলে ফেল, তোমাদের কেউ সালাত আদায় করলে যেন উদ্যম ও প্রানবন্ত অবস্থায় আদায় করে। যদি ক্লান্ত ও অবসাদ গ্রস্ত হয়ে যায় তাহলে যেন বসে পড়ে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْ مَهْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "دَعُوْهُ لَا تُزْرِمُوهُ. فَتَرَكُوْهُ حَتَّى بَالَ. ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَالْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ". قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ, فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ.

"বিশিষ্ট সাহাবী আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মসজিদে ছিলাম। একজন বেদুইন মসজিদে প্রবেশ করল এবং কিছু সময় পর মসজিদেই প্রস্রাব করতে উদ্যত হল। এ অবস্থা দেখে সাহাবারা তাকে বললেন: থাম... থাম...।পরিস্থিতি দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, প্রস্রাব বন্ধ করতে বাধ্য করো না। (এতে তার ক্ষতির আশঙ্কা আছে) তারা তাকে ছেড়ে দিল, সে প্রস্রাব করল। অত:পর রাসূলুল্লাহ তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন : এ মসজিদগুলোতে

প্রস্রাব পায়খানা ও এ ধরনের কদর্য কাজ করা শোভনীয় নয় বরং এগুলো নির্মাণ করা হয়েছে আল্লাহর যিকির ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্যে। বর্ণনাকারী বলছেন: এরপর নবীজী তাদের একজনকে (পরিষ্কার করার) নির্দেশ দিলেন, তিনি পানি ভর্তি একটি বালতি এনে তাতে ঢেলে দিলো।"[২১৩]

উম্মতের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কি মায়া-মুহব্বত ছিল এবং তিনি তাদের প্রতি কোন পর্যায়ের সহানুভূতিশীল ছিলেন, নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে আমরা এর একটি বাস্তব নিদর্শন দেখতে পাব।

জনৈক যুবক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে যিনা করার অনুমতি দিন!!

উপস্থিত লোকেরা তার দিকে তেড়ে এসে ধমকাতে লাগল এবং বলল: থাম... থাম...।

তখন রাসূলুল্লাহ বললেন : নিকটে আস। সে তাঁর নিকটে আসল।

নবীজী বললেন : তুমি কি এ কাজ তোমার মায়ের জন্যে পছন্দ কর?

সে বলল : না আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার ওপর উৎসর্গিত করুন।

নবীজী বললেন : কোন মানুষই তা নিজ মায়ের জন্যে পছন্দ করে না। আচ্ছা, তুমি কি এটি তোমার মেয়ের জন্য পছন্দ কর?

সে বলল: আল্লাহর কসম, না। ইয়া রাসূলাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার ওপর কোরবান করুন।

নবীজী বললেন, কোনো লোকই নিজ কন্যার জন্যে তা পছন্দ করে না। আচ্ছা তুমি কি তা তোমার বোনের জন্যে পছন্দ কর?

লোকটি বলল: আল্লাহর শপথ, না। আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার ওপর কোরবান করুন।

নবীজী বললেন : লোকেরাও নিজ বোনদের জন্যে তা পছন্দ করে না। তুমি কি এটি তোমার ফুফুর জন্যে পছন্দ কর ?

সে বলল : না... আল্লাহর শপথ। আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার ওপর কোরবান করুন।

নবীজী বললেন : লোকেরাও তাদের ফুফুদের জন্যে তা পছন্দ করে না। তুমি কি সেটি তোমার খালার জন্যে পছন্দ কর?

---

[২১৩] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৮৫/১০০

সে বলল: না... আল্লাহর শপথ। আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার ওপর কোরবান করুন।

নবীজী বললেন : লোকেরাও নিজেদের খালার জন্যে তা পছন্দ করে না। অত:পর নবীজী নিজ হাত তার ওপর রাখলেন এবং বললেন : হে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দাও। তার অন্তর পবিত্র করে দাও। তার লজ্জাস্থানকে হেফাজত কর। এরপর থেকে যুবকটি আর কোন বস্তুর দিকে নজর দেয়নি।

এরূপ সহানুভূতিশীল ও হৃদ্যতাপূর্ণ পদ্ধতির মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ যুবকটির হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হলেন এবং তার প্রার্থিত বস্তু যিনাকে তার কাছে ঘৃণিত করে দিতে পারলেন এবং এটি পরবর্তীতে তার সংশোধন ও সরল-সঠিক পথে চলার দিশা হয়ে থাকল।

উম্মতের প্রতি তাঁর সদয় হওয়ার আরো একটি দৃষ্টান্ত :

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: : بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوْا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُوْمَ فِي الشَّمْسِ وَلَا يَقْعَدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ, وَيَصُوْمَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ, وَلْيَسْتَظِلَّ, وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার নবী করিম ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তিকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে লোকেরা তার পরিচয় দিয়ে বলল: সে আবু ইসরাঈল, মান্নত করেছে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না এবং ছায়াতেও যাবে না, কারো সাথে কথা বলবে না এবং রোযা রাখবে। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন: তাকে আদেশ কর সে যেন কথা বলে, ছায়ায় যায়, বসে এবং নিজ সওম পূর্ণ করে।[২১৪]

---

[২১৪] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ৬৭০৪

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَقُوْلُ: وَاللهِ لَأَصُوْمَنَّ النَّهَارَ، وَلَأَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَنْتَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ذٰلِكَ؟" فقلتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: "فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ."

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: নবী আকরাম ﷺ-কে সংবাদ দেয়া হল যে, আমি শপথ করেছি, যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন দিনভর রোযা রাখব আর রাতভর জাগ্রত থেকে এবাদতে কাটিয়ে দেব। শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তুমি কি সেরকম বলেছ? আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনার প্রতি আমার মাতা পিতা কোরবান হোক! হ্যাঁ আমি সেরূপ বলেছি। তিনি বললেন: তুমিতো তা পারবে না। বরং তুমি একদিন রোযা রাখ আর একদিন রোযাবিহীন থাক। রাতের কিছু সময় এবাদতে অতিবাহিত কর আর কিছু সময় ঘুমিয়ে কাটাও। আর প্রত্যেক মাসে তিনটি করে রোযা রাখ। কারণ প্রতিটি নেক কাজে দশগুণ করে ছাওয়াব দেয়া হয়। আর এটি হচ্ছে সিয়ামুদ্দাহারের দৃষ্টান্ত।[২১৫]

অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে :

(রাসূলুল্লাহ বললেন) আমি কি এ বিষয়ে সংবাদ প্রাপ্ত হইনি যে তুমি সারাদিন রোযা রেখে কাটাবে আর রাতভর এবাদতে মগ্ন থাকবে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

নবীজী বললেন: তুমি এরূপ করবে না। বরং রোযা রাখবে এবং রোযাবিহীন থাকবে, রাতে (কিছু সময়) জাগ্রত থেকে ইবাদত করবে এবং সাথে সাথে নিদ্রাও যাপন করবে। কেননা, তোমার ওপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার চোখের হক আছে, তোমার স্ত্রীর হক আছে এবং তোমার প্রতিবেশীর হক আছে। তোমার জন্যে প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখাই যথেষ্ট। কারণ,

---

[২১৫] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ৩৪১৮

তোমাকে একেকটি নেকীর পরিবর্তে (অনুরূপ) দশটি (নেকীর) ছাওয়াব দেয়া হবে। আর এটি হচ্ছে সিয়ামুদদাহার।

২৪. নবী করিম ﷺ-এর ন্যায়পরায়ণতা

ইসলাম পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার বাণী নিয়েই পৃথিবীতে আগমন করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ন্যায় পরায়ণতা, ইহসান ও আত্মীয়দের দান করতে আদেশ করেছেন।[২১৬]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.

কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা না করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠা কর, এটাই তাকওয়ার সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি।[২১৭]

নবী করিম ﷺ-এর সার্বজনীন ন্যায়বিচারের একটি দৃষ্টান্ত,

মাখযুম গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত নারী চুরি করল, বিষয়টি কুরাইশদের ভাবিয়ে তুলল। তারা শাস্তি মওকুফ করার জন্য নবী করিম ﷺ-কে সুপারিশ করতে চাইল। নিজেরা বলাবলি করল, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কথা বলবে কে? তারাই বলল, নবী করিম ﷺ-এর প্রিয়ভাজন উসামা বিন যায়েদই একমাত্র এ দুঃসাহস করতে পারে। অতঃপর উসামাহ বিন যায়েদ নবী করিম ﷺ-এর নিকট তার ব্যাপারে সুপারিশ করলেন। অনুরোধ শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি বললেন : তুমি কি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করছ? উসামা বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

সন্ধ্যায় নবী করিম ﷺ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তীরা একারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের সম্ভ্রান্ত কোন ব্যক্তি চুরি করলে তাকে তারা ছেড়ে দিত। আর কোন দুর্বল

---

[২১৬] সূরা নাহল, আয়াত নং : ৯০

[২১৭] সূরা মায়িদা, আয়াত নং : ৮

ব্যক্তি চুরি করলে তার ওপর নির্বারিত দণ্ড আরোপ করত। আমি ঐ সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার আত্মা, যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করে তাহলে আমি তার হাত কেটে দেব।

এ হচ্ছে মহানবী-এর ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত, যা শক্তিশালী ও দুর্বলের মাঝে কোন পার্থক্য করে না, পার্থক্য করে না ধনী-গরিব ও রাজা-প্রজার মাঝে। সত্য ও ন্যায় বিচারের মানদণ্ডে সকলেই এক সমান।

আরেকটি দৃষ্টান্ত,

সাহাবী নুমান বিন বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমার পিতা আমাকে কিছু দান করলেন। তখন তার মাতা উমরাহ বিনতে রাওয়াহা বললেন : নবী করিম ﷺ-কে প্রত্যক্ষ করা অবধি আমি এতে রাজি নই। অতঃপর সে নবী করিম ﷺ-এর দরবারে এসে বলল : আমি ওমরাহ বিনতে রাওয়াহার সম্পদ হতে আমার ছেলেকে কিছু দান করেছি। সে আপনাকে সাক্ষী রাখার জন্য আমাকে আদেশ করেছে,

রাসূলুল্লাহ বললেন : তুমি কি তোমার সব ছেলেকে এভাবে দিয়েছ। সে বলল, না। তখন তিনি বললেন: আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের ছেলেদের মধ্যে ন্যায়ানুগভাবে বিতরণ কর। এরপর বশীর ফিরে গেল এবং তার দান ফিরিয়ে নিল।

আরেকটি বর্ণনায় আছে,

তিনি বললেন : তোমার কি এ ছাড়া আরো সন্তান আছে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন: তুমি এরকম করে সবাইকে দিয়েছ কি? বলল : না। তখন তিনি বললেন : তাহলে আমি অন্যায়-অবিচারের ওপর সাক্ষ্য দেব না।

নবী করিম ﷺ মালামাল বিলিবণ্টন করছিলেন। এমন সময় যুল খুওয়াইসারা তামীমী আসল, এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! ন্যায়সংগতভাবে ভাগ করুন। রাসূলুল্লাহ বললেন : তোমার ধ্বংস হোক। আমি ন্যায়বিচার না করলে ন্যায়বিচার করবে কে? ন্যায়বিচার না করলে আমিই ক্ষতিগ্রস্ত হব।

ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা মর্যাদা দান করেছেন, ন্যায়বিচারক বানিয়েছেন ও ওহীর আমানতও দান করেছেন, তিনি কীভাবে ন্যায়বিচার না করে পারেন? তিনিই তো এ বক্তব্য প্রদান করেছেন: নিশ্চয় ন্যায়বিচারকারীগণ আল্লাহ তাআলার নিকট নূর দ্বারা নির্মিত আসনে সমাসীন থাকবে। যারা নিজেদের বিচার-ফায়সালা ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখতে।

আর স্ত্রীদের মাঝে ন্যায়বিচারের বিষয়টি সম্পর্কে বলতে গেলে বলতেই হয় যে, এখানেও নবী করিম ﷺ ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাতি যাপন, সাংসারিক খরচপাতিসহ সবকিছুতে সফর-একামত সর্বাবস্থায় যতটুকু সম্ভব সমভাগ নিশ্চিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেকের নিকট এক রাত করে অবস্থান করতেন। নিজের হাতে যা থাকত তা তাদের প্রত্যেকের ওপর সমভাবে খরচ করতেন। প্রত্যেকের জন্য একটি করে কামরা নির্মাণ করেছেন। যখন ভ্রমণে যেতেন তখন তাদের মধ্যে লটারি দিতেন। যার অনুকূলে লটারি আসত তাকে নিয়ে বের হতেন। এ ব্যাপারে তিনি শিথিলতা করতেন না। এ সমতা ছিল তার আমরণ। তাঁর অসুস্থ অবস্থায় তাদের পালা অনুসারে প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে নিয়ে যাওয়া হত। যখন এটি তাঁর পক্ষে খুব কঠিন হয়ে পড়ল, আর সকলে বুঝে নিল যে, তিনি আয়েশার ঘরে থাকতে চান, তখন সকলে আয়েশার ঘরে থাকার অনুমতি দিল। তিনি সেখানেই মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থান করলেন। এত সূক্ষ্মভাবে ন্যায়পরাণতা রক্ষা করার পরও আল্লাহ তাআলার নিকট নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে বলছেন:

اَللّٰهُمَّ هٰذَا قِسْمِيْ فِيْمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِيْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ.

হে আল্লাহ আমি যার সামর্থ্য রাখি এটি আমার বণ্টন। অতএব তুমি যার মালিক এবং যা আমার আয়ত্বে নেই সে বিষয়ে তুমি আমাকে তিরস্কার কর না।

নবী করিম ﷺ এক স্ত্রীর দিকে অন্য স্ত্রীর তুলনায় বেশি ঝুঁকে যেতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন- যার দুজন স্ত্রী রয়েছে আর সে তাদের একজনের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে গেল সে কিয়ামতের দিন এক পাশে নুয়ে থাকা অবস্থায় আসবে।

২৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওয়াদা রক্ষা

ইসলাম ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার ধর্ম, সন্ধি-চুক্তি, প্রতিজ্ঞা ও সংকল্পের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ধর্ম।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূরণ কর।"[২১৮]

[২১৮] সূরা মায়িদা, আয়াত নং : ১

অন্যত্র বলেন :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

আর তোমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর, নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।[২১৯]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র প্রশংসা করে বলেন :

الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ

যারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না।[২২০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ؛ فَلَا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً وَلَا يَشُدَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ.

কোনো সম্প্রদায়ের সাথে যাদের সন্ধি থাকে, সে ঐ সন্ধি ভঙ্গ করবে না এবং তাতে কড়াকড়িও করবে না, যতক্ষণ না তার সময় শেষ হয় কিংবা চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দেয়া হয়।[২২১]

মিথ্যা নবুওয়তের দাবিদার মুসাইলামাতুল কায্যাবের দুজন দূত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কথা বলল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কথা শেষে বললেন, যদি দূত হত্যা করা নিষিদ্ধ না হতো, আমি তোমাদেরকে অবশ্যই হত্যা করতাম। তখন থেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ চালু হল, দূতদেরকে হত্যা করা যাবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাফিরদের সাথে ওয়াদা রক্ষার আরো একটি উদাহরণ হুদাইবিয়ার সন্ধিতে পরিদৃষ্ট হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কুরাইশদের প্রতিনিধি সুহাইল ইবনে আমরের সাথে চুক্তিনামা সম্পাদন করছেন, যার মধ্যে একটি ধারা ছিল, কুরাইশদের কেউ এ চুক্তিকালীন সময়ে নবী মুহাম্মাদের নিকট আসলে নবীজী তাকে ফেরত দিয়ে দেবেন যদিও সে মুসলমান হয়, বাকি ধারাগুলো লেখার কাজ এখনও চলছে, আবু জান্দাল ইবনে আমর বিন সুহাইল

---

[২১৯] সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত নং : ৩৪

[২২০] সূরা রাদ, আয়াত নং : ২০

[২২১] সুনানে আবি দাউদ, হাদীস নং : ২৭৫৯

শৃঙ্খলিত পা ও হাতকড়া পরিহিত অবস্থায় এসে উপস্থিত হল। সে মক্কার নিম্ন অঞ্চল দিয়ে এসে, মুসলমানদের কাছে নিজেকে হাজির করল।

সুহাইল বলল : মুহাম্মাদ, এই যে আবু জান্দাল, সর্বপ্রথম তার ব্যাপারে চুক্তি রক্ষা করার দাবি জানাচ্ছি আমি। তাকে আমার কাছে ফেরত দাও।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আমরাতো এখনও চুক্তি সম্পাদন শেষ করিনি।

সে বলল: তবে আমি তোমার সাথে আর কোনো ব্যাপারেই চুক্তি করব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: শুধু তাকে আমার জন্য ছাড় দাও।

সে বলল: আমি তোমার জন্যও তাকে ছাড় দেব না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: অবশ্যই তুমি তার ব্যাপারটি ছাড় দাও।

সে বলল: আমি ছাড় দিতে পারব না।

এ দিকে আবু জান্দাল খুব উচ্চ স্বরে চিৎকার করছিল, হে মুসলমান ভাইয়েরা! আমি কি মুশরিকদের নিকট প্রত্যর্পিত হব আর তারা আমাকে আমার দীনের ব্যাপারে কষ্ট দেবে? অথচ আমি মুসলমান হয়ে তোমাদের কাছে এসেছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : আবু জান্দাল! ধৈর্য ধারণ কর। উত্তম প্রতিদানের আশা রাখ। অবশ্যই আল্লাহ তোমার জন্য এবং তোমার সাথে থাকা সকল দুর্বল মুসলমানদের জন্য স্বস্তি ও মুক্তির পথ বের করে দেবেন। আমরা তাদের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে গেছি। তারা আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমরাও তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এখন আমরা তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করতে পারি না।

তদ্রুপ কুরাইশদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ সাকীফ গোত্রের জনৈক আবু বশীর রা. পলায়ন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে চলে আসেন। কুরাইশরা তার খোঁজে দুজন লোক পাঠায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদাইবিয়ার সন্ধি মোতাবেক তাকে ফেরত দিয়েদেন। এসব ঘটনাপঞ্জিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্ধি ও অঙ্গীকারের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাশীলতার বিষয়টি প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, যদিও সেসব অঙ্গীকার ও সন্ধিতে মুসলমানরা বাহ্যিকভাবে অন্যায়ের শিকার হয়েছে।

আরেকটি উদাহরণ :

বারা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ওমরা করার ইচ্ছা করলেন, মক্কায় প্রবেশ করার অনুমতি চেয়ে দূত পাঠালেন। তারা শর্ত করল : তিন দিনের বেশি থাকা যাবে না। তলোয়ার কোষবদ্ধ করা ব্যতীত প্রবেশ করা যাবে না। তাদের কাউকে দাওয়াত দেয়া যাবে না।

তিনি বলেন, আলী ইবনে আবী তালিব শর্তগুলো লিখছিলেন। তিনি লিখলেন, এটি সেই চুক্তি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ যার ফয়সালা দিয়েছেন। তারা সাথে সাথে বলে উঠল: আমরা যদি তোমাকে আল্লাহর রাসূল মনেই করতাম, তবে তো মক্কায় প্রবেশ করতে নিষেধ করতাম না এবং অবশই সকলে তোমার অনুসরণ করতাম। বরং এভাবে লিখ : এটা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর ফয়সালা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি যেমন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ, তদ্রুপ আল্লাহর রাসূলও। অত:পর আলী রা. কে বললেন : রাসূলুল্লাহ শব্দটি মুছে ফেল। আলী রা. বললেন : না, আমি মুছতে পারব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমাকে দেখিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখিয়ে দিলে তিনি স্বহস্তে তা মুছে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াদা খেলাপি ও বিশ্বাসঘাতকতা হতে সতর্ক করে বলেন। যে ব্যক্তি কাউকে নিরাপত্তা দিয়ে হত্যা করবে, আমি সে হত্যাকারী হতে মুক্ত, যদিও নিহত ব্যক্তি কাফির হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন : যে সম্প্রদায় চুক্তি ভঙ্গ করবে, তাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড ব্যাপকতা লাভ করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াদা রক্ষার পরিপন্থী বিষয় খিয়ানত হতে পানাহ চেয়েছেন। তিনি বলেন : আমি তোমার নিকট খিয়ানত হতে পানাহ চাচ্ছি। কারণ, এটা খুবই নিকৃষ্ট স্বভাব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ্বাসঘাতকতা ও খিয়ানতকে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। বলেন : কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাস ঘাতকের ওয়াদা খেলাপির জন্য ঝাণ্ডা থাকবে, যার মাধ্যমে তাকে চেনা যাবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ব্যাপারে বলেছেন : আমি ওয়াদা ভঙ্গ করি না।

২৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষমা

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ .

আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত বলেই তুমি তাদের সাথে বিনয়ী ও নম্র হয়েছ। আর যদি তুমি কর্কশ ও কঠিন হৃদয়ের হতে, তারা তোমার নিকট হতে সরে যেত। তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং যে কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ কর।[২২২]

---

[২২২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং : ১৫৯

অন্যত্র বলেন :

সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে চল, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।

তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাধারণ স্বভাব ছিল, ক্ষমা করা এবং এড়িয়ে চলা, তবে যখন একেবারে জরুরি হয়ে পড়ত, তখন কেবল শাস্তি দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে ক্ষমার অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, একটি বড় নমুনা।

আরেকটি উদাহরণঃ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নজদের এলাকায় একটি অশ্ববাহিনী প্রেরণ করেন। তারা বনী হানীফার এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আসে। যার নাম সুমামা বিন উসাল, ইয়ামামা বাসীদের নেতা। তারা তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেধে রাখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট এসে বললেন : সুমামা! তোমার খবর কি-(তোমার কিছু বলার আছে কি)? সে বলল : ভাল, মুহাম্মাদ। যদি তুমি আমাকে হত্যা কর, তবে রক্ত মাংসের একজন মানুষকে হত্যা করবে (হত্যাপোযুক্ত একজন ব্যক্তিকে হত্যা করবে), আর যদি আমাকে ক্ষমা কর, তবে কৃতজ্ঞ একজন ব্যক্তিকে ক্ষমা করবে। আর যদি সম্পদ চাও, তবে যা চাইবে, তাই দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এ অবস্থায় রেখে চলে গেলেন। পরবর্তী দিন বললেন : সুমামা! খবর কি তোমার ? সে বলল : আমি আগে যা বলেছি তাই। যদি তুমি আমাকে হত্যা কর, তবে রক্ত মাংসের একজন লোককে হত্যা করবে, আর যদি ক্ষমা কর, তবে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকেই ক্ষমা করবে। আর যদি সম্পদ চাও, তবে যা চাইবে, তাই দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সে অবস্থায় রেখে ফিরে গেলেন। পরবর্তী দিন আবার বললেন : সুমামা! তোমার খবর কি? সে বলল : গতকাল যা বলেছি তাই। আমাকে হত্যা করলে রক্ত মাংসের একজন মানুষকে হত্যা করবে, আর ক্ষমা করলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিতে ক্ষমা করবে। আর যদি সম্পদ চাও, তবে বল, যা চাইবে, তাই দেয়া হবে। তিনি বললেন : সুমামাকে ছেড়ে দাও। সে ছাড়া পেয়ে মসজিদের পাশে একটি বাগানে গিয়ে গোসল করে মসজিদে প্রবেশ করল। অতঃপর বলল :

أَشْهدُ أَنَّ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وأَشْهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ؛ يَا مُحَمَّدُ! وَاللهِ مَا كَانَ فِي الأَرْضِ وَجهٌ أَبغضَ إِلَيَّ من وجْهِكَ. فَقَدْ أَصبَح وجهُك أَحبَّ

الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ. وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ. وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন সত্যিকার মাবুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা এবং রাসূল। হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর শপথ করে বলছি, পৃথিবীর বুকে আমার নিকট আপনার চেহারার চেয়ে অধিক ঘৃণিত কোনো চেহারা ছিল না। আর এখন আপনার চেহারা অন্য সকল চেহারা অপেক্ষা আমার নিকট অধিক প্রিয় হয়ে গিয়েছে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার নিকট আপনার দ্বীন অপেক্ষা ঘৃণিত আর কোনো দ্বীন ছিল না আর এখন আপনার দ্বীন অন্য সকল দ্বীন থেকে আমার নিকট অধিক প্রিয় হয়ে গিয়েছে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনার শহরই আমার নিকট ছিল সর্বাধিক ঘৃণিত শহর আর এখন সেটিই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় হয়ে গিয়েছে। আপনার অশ্বারোহী বাহিনী আমাকে গ্রেফতার করেছে আর আমি উমরা পালনের মনস্থির করেছি। আপনি কি বলেন? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সুসংবাদ দান করলেন এবং উমরা পালনের নির্দেশ দিলেন।[২২৩]

তিনি মক্কায় আসলে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল: তুমি কি বেদ্বীন হয়ে গিয়েছ? উত্তরে তিনি বললেন: না, বরং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহর শপথ করে বলছি, এখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমোদন ব্যতীত ইয়ামামাহ থেকে তোমাদের কাছে এক দানা গমও আর আসবে না।

সুপ্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করে দেখুন। ক্ষমা ও উদারতা মানুষকে কীভাবে পরিবর্তন করে দেয়। মানুষের অন্তরে কত সুন্দরভাবে এর প্রভাব পড়ে এবং এ উদারতা কত নিপুণভাবে মানুষকে কুফরের অমানিশা ও শিরকের বিভ্রান্তি হতে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসে।

---

[২২৩] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ৪৩৭২

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষমার আরেকটি নিদর্শন

যে ইহুদি মহিলা তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বিষ প্রয়োগ করে বকরির গোস্ত পরিবেশন করেছিল তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ খানিক গোস্ত ভক্ষণ করেন। কিন্তু তিনি প্রতিশোধ নেননি। অবশ্য পরে তার গোস্ত খেয়ে মারা যাওয়া বিশ্‌র ইবনে বারা বিন মারূরের কিসাস স্বরূপ তাকে হত্যা করা হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষমার আরেকটি উদাহরণ : জাবের রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নজ্‌দ অভিমুখে অভিযান পরিচালনা শেষে ফিরতি পথে কাটাদার বৃক্ষ ভর্তি একটি ময়দানে বিশ্রাম নেয়ার জন্য যাত্রা বিরতি দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম ছায়ার তালাশে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সামুরা নামক গাছের সাথে তলোয়ার ঝুলিয়ে তার নিচে বিশ্রাম নিতে লাগলেন।

জাবের রা. বলেন : আমরা সামান্য ঘুমিয়ে নিলাম। হঠাৎ দেখি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ডাকছেন। আমরা তার নিকট গেলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম, একজন বেদুইন তার নিকট বসা আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায়, আমার তলোয়ার নিয়ে নেয়। আমি জাগ্রত হয়ে দেখি, তার হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার। সে আমাকে বলল : তোমাকে আমার কবল হতে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। এখানে বসা, এই সে ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কোনো শাস্তি না দিয়েই ছেড়ে দেন।

২৭. সেবক ও কৃতদাসদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দয়া

রাসূল ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্ব যুগে চাকর, কৃতদাসদের কোন মর্যাদা ও অধিকার ছিল না, রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকার বঞ্চিত এ সব লোকের থেকে দূর করে দিলেন সকল প্রকার অত্যাচার-অবিচার আর প্রতিষ্ঠা করলেন তাদের অধিকার। যারা তাদের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করত, ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করত কিংবা তিরস্কার-ভর্ৎসনা করত তিনি তাদেরকে কঠিন আযাবের ভয় দেখিয়ে সতর্ক করেছেন।

মারূর বিন সুয়াইদ বলেন : আমি আবু যর রা. কে দেখলাম, তিনি যে পোশাক পরিধান করতেন, তাঁর চাকরকে ঠিক ঐ মানের পোশাকই পরিধান করতে দিতেন, তাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে বললেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তিনি একজন লোককে গালি দিয়েছিলেন- তাকে তার মায়ের নামে তিরস্কার করেছিলেন- লোকটি নবী করিম ﷺ-এর নিকট এসে নালিশ করল, নবী ﷺ বললেন:

إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ

তুমি এমন লোক যার মাঝে জাহিলিয়াত বিরাজিত।[২২৪]

তোমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ তোমাদের চাকর-বাকর, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, সুতরাং যার অধীনে তার ভাই থাকবে, তার উচিত সে যা খাবে তাকেও তা খাওয়াবে, সে যা পরিধান করবে তাকেও তা পরিধান করাবে, তাদের কষ্ট হয় এমন বোঝা তাদের চাপিয়ে দিবে না, আর যদি দাও তবে তাদের সহায়তা করবে।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ: লক্ষ্য করে দেখুন, কিভাবে নবী করিম ﷺ একজন চাকরকে ভাইয়ের মর্যাদার আসন দান করলেন। যাতে প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়ে একথা স্থিরভাবে প্রথিত হয়ে যায়, সে যদি তার চাকর, কর্মচারী অথবা কৃতদাস শ্রেণির লোকদের ওপর অত্যাচার করে, তাহলে যেন নিজ ভাইয়ের সাথেই এ আচরণ করল। অতঃপর নবী আকরাম ﷺ, তাদের প্রতি অনুগ্রহ-দয়া, সম্মান প্রদর্শন, খাবার প্রদান ও পরিধেয় দান ইত্যাদি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়ার জন্যে বিশেষভাবে আদেশ প্রদান করলেন। বললেন: সে নিজে যা খাবে তাকেও তাই খেতে দেবে। নিজে যা পরিধান করবে তাকেও তাই পরতে দেবে। আর তাই আবু যর রা. নিজে যা পরিধান করতেন খাদেমকেও তা-ই পরতে দিতেন। অনুরূপ সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দিতেও নিষেধ করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞা পরোক্ষভাবে আদেশ করছে যে তাদের থেকে কাজ নেয়ার ক্ষেত্রে সহজ করতে হবে এবং বিশ্রামের জন্যে যথেষ্ট সময় দিতে হবে।

আবু মাসউদ আনসারী রা. বলেনঃ আমি আমার এক গৃহভৃত্যকে চাবুক দিয়ে প্রহার করছিলাম, হঠাৎ আমার পিছন থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম, اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ জেনে রাখ! হে আবু মাসউদ। রাগে আমি আওয়াজ বুঝতে পারছিলাম না। যখন তিনি আমার নিকটে আসলেন, তাকিয়ে দেখি, তিনি ওাসূলুল্লাহ ﷺ। বলছেন: জেনে রাখ! আবু মাসউদ। তিনি বলেন, অত:পর আমি হাত থেকে চাবুক ফেলে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন: জেনে রাখ! হে আবু মাসউদ! তুমি এ গোলামের ওপর যতটুকু ক্ষমতাবান, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তোমার ওপর এর চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান। আমি বললাম: আজকের পর থেকে আমি আর কখনো কোন গোলামকে প্রহার করব না।

---

[২২৪] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ৩০

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমি বললাম: আল্লাহর রাসূল সে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যদি তুমি তা না করতে, অবশ্যই তোমাকে (জাহান্নামের) আগুন স্পর্শ করতো।

নবী করিম ﷺ আরো বলেন: যে স্বীয় গোলামকে চপেটাঘাত করবে, তার প্রতিকার হল সে তাকে আযাদ করে দেবে।

নবী করীম ﷺই- ঐ মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি দুর্বলদের রক্ষা করেছেন, কৃতদাসদের মুক্ত করেছেন, চাকর-বাকরদের সাথে সুবিচার করেছেন, ভগ্ন হৃদয়দের মাঝে থেকে তাদের দুঃখ-কষ্ট খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং তা লাঘব করার জন্যে আজীবন জিহাদ করেছেন এবং প্রশান্ত করেছেন তাদের হৃদয় মন।

মুআবিয়া বিন সুয়াইদ বিন মুকরিন বলেন: আমাদের একজন কৃতদাসকে আমি চপেটাঘাত করেছিলাম, তারপর তাকে ও আমাকে আমার পিতা ডেকে বললেন: এর থেকে তুমি কেসাস (প্রতিশোধ) গ্রহণ কর। আমরা মুকরিন গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মাত্র সাতজন ছিলাম, আর আমাদের খাদেম ছিল মাত্র একজন। আমাদের এক লোক তাকে চপেটাঘাত করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তাকে তোমরা মুক্ত করে দাও।

সবাই বলল: আমাদের তো অন্য কোন খাদেম নেই। তখন তাকে বলল: তুমি তাদের খেদমত কর, তাদের প্রয়োজনমুক্ত হওয়া পর্যন্ত। যখন প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে তখন তাদের উচিত তাকে মুক্ত করে দেয়া।

এ হচ্ছেন মুহাম্মাদ ﷺ, আর চাকর-বাকর এবং কৃতদাসদের সাথে এ ছিল তাঁর অবস্থান। যারা মানব স্বাধীনতার দাবি করছে এবং এ ব্যাপারে খুব সোচ্চার প্রমাণ করার চেষ্টা করছে প্রতিনিয়তঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ অবস্থানের তুলনায় তারা কোথায়?

খাদেমদের সাথে নবী ﷺ-এর নিজের আচরণের বাস্তব নমুনার প্রতি লক্ষ্য করুন।

আনাস বিন মালেক রা. বলেন: আমি দশ বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত করেছি, আল্লাহর শপথ করে বলছি: তিনি আমার কোন কাজে কখনো উফ্ শব্দটি পর্যন্ত বলেননি এবং আমি কোন কাজ করার পর, বলেননি কেন করেছ? আর না করলে বলেননি- কেন করোনি?

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি আমাকে কখনো কোন দোষারোপ করেননি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার খাদেমকে জিজ্ঞেস করতেন: তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি?

আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: মদীনার কোন বাঁদি যদি রাসূলুল্লাহ স. এর হাত ধরত তাহলে তিনি স্বীয় হাত বাঁদির হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতেন না যতক্ষণ না সে তার প্রয়োজনে মদীনার যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেত।

২৮. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাদেম

অসহায় দুর্বল খাদেমকেও রাসূলুল্লাহ ﷺ যথাযথ মূল্যায়ন করতেন, তাকে তার দ্বীনদারী ও পরহেযগারীর ভিত্তিতেই মূল্যায়ন করতেন কর্ম ও দুর্বলতার ভিত্তিতে নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদেম ও মজুরদের ব্যাপারে বলেন:

هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

"তারা তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের কর্তৃত্বাধীন করে দিয়েছেন, তোমরা যা খাবে তা তাদেরকেও খাওয়াবে, তোমরা যা পরিধান করবে তা তাদেরকেও পরিধান করাবে, তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ দিবে না, আর যদি অনুরূপ দায়িত্ব দাও, তাতে তোমরাও সহযোগিতা করবে।"[২২৫]

আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَهُ، وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَ تَرَكْتَهُ

"আমি দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত করেছি, আমার কাজ কর্মে [বিরক্ত হয়ে ধমকের সূরে] তিনি কোন দিন উফ শব্দটি বলেননি, আর আমি কোন কাজ করলে তিনি কখনো বলেননি যে, তুমি এ কাজ কেন করেছ? আর কোন কাজ না করলে তিনি কখনো বলেননি যে, তুমি এ কাজ কেন করোনি।"[২২৬]

---

[২২৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৬৬১/৩৮

[২২৬] তিরমিযী, হাদীস নং : ২০১৫

পুরা দশটি বছর.. কয়েক দিন বা কয়েক মাস নয়, অনেক সময় যেখানে দুঃখ বেদনা, সুখ-শান্তি, চিন্তা, রাগ, মানসিক পরিবর্তন ও অস্থিরতা থেকে শুরু করে অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে তার মাঝে। যাতে সাচ্ছন্দ্য ও অসচ্ছলতার অনেক দিনই অতিবাহিত হয়েছে!! এত ঘটনা প্রবাহের মাঝেও তিনি তাকে কোন দিন ধমক দিয়ে কথা বললেন না, কোন প্রকার নির্দেশও তিনি দিলেন না তাকে। বরং তার স্বীয় ব্যক্তিত্বের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন তার সমগ্র কাজ কর্ম, বরং তাকে তার প্রতিদান দিতেন ও তার মনোভাবকে খুশী রাখতেন, তার ও তার পরিবারের প্রয়োজন ও চাহিদা পূর্ণ করতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন।!!

প্রিয় পাঠক! দেখুন, এক খাদেম তার মুনিব সম্পর্কে আশ্চর্য জবান বন্দী দিচ্ছেন, এক গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য প্রদান ও হৃদয় গ্রাহী প্রশংসা করছেন!!

আপনি কি কখনো কোন খাদেমকে তার মুনিবের ব্যাপারে এমন প্রশংসা করতে দেখেছেন? যেমন প্রশংসা করেছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাদেম তাঁর ব্যাপারে?

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমার মা বলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার এ খাদেমের জন্য দোয়া করুন। তিনি বলেন:

اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ

"হে আল্লাহ তা'আলা আপনি তাকে প্রচুর সম্পদ ও অনেক সন্তানাদি দান করুন এবং তাকে যা দিয়েছেন তাতে প্রাচুর্যতা দান করুন।"[২২৭]

নবী ﷺ এত বড় সাহসী বাহাদুর হওয়ার পরেও তিনি কোন দিন কাউকে অপমান করেননি, ইসলামের হক ব্যতীত কাউকে মারেননি এবং তার কর্তৃত্বাধীন স্ত্রী বা চাকর কোন অপরাধ করলেও তার প্রতিশোধ নেননি!!

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا لَهُ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"রাসূল ﷺ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত তাঁর হাত দিয়ে কাউকে মারেননি এমনকি তার স্ত্রী ও খাদিমকেও না।"[২২৮]

---

[২২৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৬৩৩৪

[২২৮] মুসান্নেফে আব্দুর রহমান, হাদীস নং : ১৭৯৪২

মু'মিন জননী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সৃষ্টির সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ, সুনাম ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দিক-দিগন্তর, এমনকি কুরাইশ বংশের কাফেররা পর্যন্ত তার এ সুখ্যাতির সাক্ষ্য দিয়েছে।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْتَصِرًا مِنْ مَظْلِمَةٍ ظُلِمَهَا قَطُّ مَا لَمْ تُنْتَهَكْ مَحَارِمُ اللَّهِ فَإِذَا انْتُهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ شَيْءٌ كَانَ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ غَضَبًا. وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَأْثَمًا

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘনের ক্ষেত্র ব্যতীত নিজের প্রতি কোন জুলুম-অবিচারের প্রতিশোধ নিতে দেখিনি। কেউ আল্লাহর বিধানের অবমাননা করে থাকলে তিনি সে ক্ষেত্রে তাদের সবার চেয়ে বেশী রাগান্বিত হতেন। আর তাকে কোন দুটি বস্তুর একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেয়া হলে গোনাহের কাজ না হলে তিনি সহজটা গ্রহণ করতেন।"[২২৯]

নবী ﷺ সহনশীলতা ও দয়ার প্রতি আহ্বান করতেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন:

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ

"আল্লাহ তা'আলা সহনশীল এবং প্রত্যেক ব্যাপারে সহনশীলতাকে ভালোবাসেন।"[২৩০]

২৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দানশীলতা

বদান্যতা, মহানুভবতা, দানশীলতা ও উদারতার ক্ষেত্রে কেউই নবী করিম ﷺ-এর সমকক্ষ হতে পারেনি এবং পারবেও না।

দানশীলতার সব কয়টি স্তরই তিনি অতিক্রম করেছেন। সর্বোচ্চ স্তর হলো : আল্লাহর রাস্তায় নিজের জীবন উৎসর্গ করা। কবির ভাষায় :-

يَجُوْدُ بِالنَّفْسِ إِنْ ضَنَّ الْبَخِيْلُ بِهَا وَالْجُوْدُ بِالنَّفْسِ أَقْصَى غَايَةِ الْجُوْدِ

[২২৯] মুসনাদে হুমাইদী, হাদীস নং : ২৬০

[২৩০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৬৯৭২

তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করছেন, যদিও কৃপণ ব্যক্তি নিজের জীবন দান করতে চায় না, আর জীবন উৎসর্গ করাই হলো সর্বোচ্চ পর্যায়ের বদান্যতা।

শত্রুর মুকাবিলায় যুদ্ধ করার সময় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে দিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের খুব কাছাকাছি তিনিই অবস্থান করতেন। বীর বিক্রম যোদ্ধারাই কেবল তার সাথে অবস্থান করতে পারত।

তিনি সর্বদা ইল্‌ম দানে নিরত থাকতেন। আল্লাহ তাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, সার্বক্ষণিক সাহাবাগণকে তা শিক্ষা দিতেন। তাদেরকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। শিক্ষা দানের ব্যাপারে তাদের সাথে নম্রতা ও হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করতেন, সব সময় বলতেন :

إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا، وَلَا مُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا

"আল্লাহ আমাকে কঠোর ও রূঢ় বানিয়ে প্রেরণ করেন নি, বরং একজন সহজকারী শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছেন।"[২৩১]

তিনি আরো বলেন :

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ، أُعَلِّمُكُمْ.

আমি তোমাদের জন্যে পিতৃসমতুল্য, তোমাদের আমি শিক্ষা দান করি।

প্রশ্নকারী কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেয়ার ক্ষেত্রে কিছু বাড়িয়ে বলতেন। আর এটি ইলম শিক্ষাদানের ব্যাপারে উদারতার পরিচয় বহন করে। তাকে কেউ সমুদ্রের পানির পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, উত্তরে তিনি বললেন:

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং এর মৃত প্রাণী হালাল।

মুসলমানদের কল্যাণ এবং তাদের প্রয়োজন মিটাতে গিয়ে তাঁর সময় ও আরাম-আয়েশ কুরবানী করার দৃষ্টান্ত বিরল। তিনি এ ক্ষেত্রেও সকল মানুষের মধ্যে এগিয়ে আছেন। একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তই এর প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট :

মদীনার কোন একজন কৃতদাসী তার হাত ধরে স্বীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্যে যথা ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারত।

---

[২৩১] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৪৭৮/২৯

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসখানা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহানুভবতার উত্তম দৃষ্টান্ত, তিনি বলেন :

مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনও না বলতেন না।"[২৩২]

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ইসলামের বরাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দিয়ে দিতেন। এক ব্যক্তি তার নিকট আসল, তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে থাকা সবগুলো ছাগল দিয়ে দিলেন। সে লোক আপন সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে বলল : হে আমার জাতি, তোমরা মুসলমান হয়ে যাও, কেননা মুহাম্মাদ এমনভাবে দান করেন, মনে হয় তিনি কোন দরিদ্রতার ভয় করেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইন যুদ্ধের পর সফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে তিন শত উট দিয়েছিলেন। অতঃপর সে বলল : আল্লাহর কসম, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক দিয়েছেন। তিনি আমার কাছে সর্বাধিক অপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন, অত:পর ক্রমান্বয়ে দান করতে করতে সকল মানুষ অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয়ে গিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল মানুষের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। আর এ দানশীলতা রমজানে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেত।

কারণ, রমজান মাসে জিবরাইল আ. তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাকে কুরআনের প্রশিক্ষণ দিতেন। আল্লাহর কসম রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন প্রবল বাতাসের চেয়েও বেশি দানশীল হয়ে যেতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার সাথি-সঙ্গীরা হুনাইনের যুদ্ধ হতে ফেরার পথে কতক বেদুইন লোক তার নিকট বিভিন্ন বিষয়ে চাইতে লাগল। তাদের চাপাচাপিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সামুরা বৃক্ষের নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। ইতিমধ্যে গাছে তার চাদর আঁটকে পড়লে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সঙ্গীদের বললেন তোমরা আমার চাদর ফিরিয়ে নিয়ে আস। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যদি আমার কাছে এ বাগানে অবস্থিত গাছের সমপরিমাণও চতুষ্পদ জন্তু থাকতো তাহলে আমি সবই তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম। তারপরও তোমরা আমাকে কৃপণ হিসেবে দেখতে পেতে না এবং কাপুরুষ হিসেবেও না।

---

[২৩২] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৩১১/৫৬

দানশীলতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চিরাচরিত আদর্শ, এমনকি তিনি নবী হওয়ার পূর্বেও দানশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

যেমন, হেরা গুহায় ফেরেশতা জিবরাইল ওহী নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাতের পর তিনি কাঁপতে কাঁপতে যখন খাদিজা রা. এর নিকট ফিরে আসলেন। তখন তাকে তিনি এ বলে সান্ত্বনা দেন যে, কখনও নয়, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমান করবেন না। কারণ, আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, দুস্থ-অসহায় মানুষের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন, অন্ন-বস্ত্রহীন মানুষের সহযোগিতা করেন এবং বিপদাপদে লোকদের আপনি সহযোগিতা করেন।

আনাস রা. বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আগামী কালের জন্য কোন কিছু জমা করে রাখতেন না।

আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, কিছু সংখ্যক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রার্থনা অনুযায়ী দান করলেন, তারা আবারও প্রার্থনা করলে তিনি আবারও দিলেন, এরপর তারা আবারও প্রার্থনা করে, তিনি আবারো তাদের দান করেন। এভাবে যখন দান করতে করতে সব শেষ হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, আমার নিকট কিছু আসলে এমন হয় না যে আমি তোমাদের না দিয়ে জমা করে রাখি। আর যে পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন। আর যে অমুখাপেক্ষী থাকতে চায় আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করে দেন। আর যে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারণের তাওফীক দেন।

৩০. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাদ্যদ্রব্য

সমাজ পতি ও ধনীদের বাড়ীতে খাদ্যের জমজমাট লেগেই থাকে। আর আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আয়াত্তাধীন ছিল রাজ্য ও অসংখ্য জনগণ, তাঁর নিকট আসত উট ভর্তি খাদ্যদ্রব্য, তার সামনে স্বর্ণ-রৌপ্য বয়ে যেত! আপনি কি জানেন! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পানাহার কেমন ছিল?! রাষ্ট্রনায়ক বা রাজাদের মত আরাম আয়েশের ছিল কি? নাকি তাদের চেয়েও বিলাসী?! ভোগ বিলাসে বিভোর ব্যক্তিদের মত ছিল কি তার পানাহার? নাকি পরিপূর্ণ প্রয়োজনীয় ও পরিতৃপ্তপূর্ণ ছিল! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বল্প মাত্রার অভাবী পানাহারের কথা ভেবে আপনি আশ্চর্য হবেন না! আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদেরকে বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْتَمِعْ لَهُ غَدَاءٌ، وَلَا عَشَاءٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، إِلَّا عَلَى ضَفَفٍ

“রাসূল ﷺ-এর দুপুর ও রাতের খাবারে কখনো রুটি মাংস একত্রে মিলত না, যদিও মিলত তা হতো অতি সামান্য।”[২৩৩]

অর্থাৎ তিনি পরিতৃপ্ত হতেন না, কোনো রূপে চালিয়ে নিতেন। যদি মেহমান আসত তবেই তাদের সাথে সৌজন্যমূলক ও তাদের আনন্দের জন্য তৃপ্ত হতেন।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত পরস্পর দুই দিন যবের রুটি পেট ভরে পূর্ণ করে খায়নি।”[২৩৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে:

مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا، حَتَّى قُبِضَ

“রাসূল ﷺ মদীনায় আগমনের পর থেকে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত তাঁর পরিবার পরস্পর তিন দিন পেট পূর্ণ করে গমের রুটি খায়নি।”[২৩৫]

বরং রাসূল ﷺ খাবার কিছু না পেয়ে ক্ষুধার্ত পেটে ঘুমিয়ে যেতেন এক লোকমাও তার পেটে কিছু যেত না!

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস " হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيتُ اللَّيَالِي الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ

---

[২৩৩] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং : ১৩৮৫৯

[২৩৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৯৭০/২২

[২৩৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৯৭০/২৩

"রাসূল ﷺ ও তাঁর পরিবার ক্ষুধার্তাবস্থায় পরস্পর কয়েক রাত অতিবাহিত করতেন। রাতের খাবার থাকত না তাদের কাছে, আর বেশিরভাগ রুটি ছিল যবের।"[২৩৬]

সম্পদ স্বল্পতার কারণে নয়, বরং তাঁর আয়ত্তাধীন ছিল প্রচুর সম্পদ এবং খাদ্য ভর্তি কাফেলা তাঁর সমীপে উপস্থিত হতো সচরাচর। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী করীম ﷺ-এর অবস্থাকে বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ হোক তা পছন্দ করেন।

হযরত উকবা বিন আল-হারেস " হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ একদা আমাদের আসরের সালাত পড়ালেন, অতঃপর তিনি দ্রুতগতিতে ঘরে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এলেন। তারপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম অথবা কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল: প্রতি উত্তরে তিনি বলেন:

كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ

"ঘরে সাদাকার কিছু স্বর্ণ ছিল, তা রেখে আমি এক রাত্রি অতিবাহিত করাটা সমীচিন মনে করলাম না, তাই সেটাকে বণ্টন করে দিলাম।"[২৩৭]

আশ্চর্যজনক বদান্যতা ও অবিচ্ছন্ন দানশীলতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত তো এ উম্মতের মহান নবী ﷺ-এর হাত হতে যা বের হতো।

হযরত আনাস " বলেন:

مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ

"কেউ যদি ইসলামের দোহাই দিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট কিছু চাইত, তবে অবশ্যই তাকে দিতেন। একবার এক ব্যক্তি এসে তার নিকট চাইলে, তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত এক পাল ছাগল দান করলেন। সে ব্যক্তি স্বজাতির নিকট গিয়ে বলল: ওহে আমার জাতি! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, কেননা মুহাম্মাদ ﷺ এমন দান করেন যে, যাতে অভাবের আশঙ্কা নেই।"[২৩৮]

---

[২৩৬] তিরমিযী, হাদীস নং : ২৩৬০
[২৩৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১৪৩০
[২৩৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৩১২/৫৭

এতবড় দানবীর ও দাতা হওয়ার পরও আমাদের নবীর অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করুন!

হযরত আনাস " বলেন:

لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ، وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ

"নবী করীম ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত বিলাসী দস্তরখানায় বসে খানা খাননি এবং তিনি মৃত্যু পর্যন্ত কোনো নরম [চাপাতী] রুটি খাননি।"[২৩৯]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন: অনেক দিন রাসূল ﷺ তার কাছে এসে বলতেন:

أَعِنْدَكِ غَدَاءٌ؟، فَأَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ

"তোমার নিকট খাবার কিছু আছে কি? উত্তরে বলতেন: না, অতঃপর তিনি বলতেন: তবে আমি আজ রোযাই রাখলাম।"[২৪০]

এত স্বল্প খাদ্য ও জীবনোপকরণের পরও তাঁর চরিত্র ছিল মহান, আদর্শ ছিল ইসলামী, আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া করার আহ্বান জানাতেন ও যিনি এ খাদ্য প্রস্তুত করত তাকে ধন্যবাদ জানাতেন এবং এ খাদ্য বানাতে যদি কোনো প্রকার ত্রুটি হতো তবে তিনি তার প্রতি কঠোরতা করতেন না। সে তো প্রস্তুত করতে অনেক চেষ্টা করেছে, হয়তো বা কোনো কারণবশত তা ভালো হয়নি! এজন্যই নবী করীম ﷺ কখনো কোনো খাদ্যের দোষ বর্ণনা করতেন না এবং কোন বাবুর্চীকেও ভর্ৎসনা করতেন না, যা উপস্থিত আছে তাই গ্রহণ করতেন, ফেরত দিতেন না। আর যা নেই তা কখনো চাইতেন না! ইনিই এ মুসলিম জাতির নবী করীম ﷺ; যার ভূরিভোজনের টার্গেট ছিল না!।

হযরত আবু হুরাইরা " বলেন:

مَا عَابَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ

---

[২৩৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৬৪৫০

[২৪০] তিরমিযী, হাদীস নং: ৭৩৪

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কোনো খাদ্যের দোষ বর্ণনা করতেন না, ভালো লাগলে খেতেন আর না লাগলে খেতেন না।"[২৪১]

যাদেরকে পানাহারের ভোগ-বিলাসিতা পেয়ে বসেছে, সে প্রিয় ভ্রাতৃমণ্ডলির জন্য শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার বাণীটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করছি- খাদ্যের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ হলো: ভালো লাগলে পরিমিত খেতেন; উপস্থিত কোনো খাদ্যকে ফেরত দিতেন না, এবং যা নেই তা কখনো অনুসন্ধান করতেন না, গোশ্‌ত রুটি উপস্থিত হলে, তাই খেতেন অথবা ফলমুল, গোশ্‌ত ও রুটি উপস্থিত হলে, তাই খেতেন, শুধু রুটি বা শুধু খেজুর পেলে সেটাই খেতেন। তাঁর কাছে দুই প্রকার খাদ্য আনা হলে তিনি এ কথা বলতেন না যে, আমি দুই প্রকার খাদ্য গ্রহণ করব না। আর মজাদার ও মিষ্টি খাদ্য গ্রহণ করা থেকেও তিনি বিরত হতেন না। হাদীসে এসেছে: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"কিন্তু আমি তো মাঝে মাঝে নফল রোযা রাখি, আবার মাঝে মাঝে রোযা ছেড়েও দেই। রাত্রে কিছু অংশ জেগে ইবাদাত করি ও কিছু অংশে ঘুমাই, আমি তো বিবাহ করেছি এবং গোশতও ভক্ষণ করে থাকি। ওহে আমার উম্মত! তোমরা জেনে রেখো! যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অবজ্ঞা করে, সে আমার উম্মতভুক্ত নয়।"[২৪২]

উত্তম ও পবিত্র খাদ্যসমূহ খাওয়ার ও আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি পবিত্র বা হালাল খাদ্যকে হারাম মনে করল সে সীমা লঙ্ঘনকারী আর যে ব্যক্তি আল্লাহর শুকরিয়া করে না সে আল্লাহর হক্ব আদায় করল না বস্তুত তা যেন সে নষ্ট করল। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ হল সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ। আর দুই পন্থায় লোকেরা সে আদর্শচ্যুত হয়ে থাকে:

১। অপচয়কারী যারা ইচ্ছামত গ্রহণ করে, আর তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্বসমূহ হতে বিরত থাকে।

---

[২৪১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২০৬৪/১৮৭

[২৪২] সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং : ৩২১৭

২। উত্তম ও পবিত্র বস্তুসমূহ হারাম সাব্যস্ত করে এবং এমন বৈরাগ্যের প্রচলন ঘটায় যা আল্লাহ তা'আলা প্রবর্তন করেননি, ইসলামে তো কোন বৈরাগ্য নেই।

তারপর তিনি বলেন: হালাল বস্তু সবই উত্তম ও পবিত্র, আর সব উত্তম ও পবিত্র বস্তুই হালাল। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্র বস্তুগুলোকেই হালাল করেছেন এবং ঘৃণিত ও অপবিত্র বস্তুগুলিকে আমাদের জন্য হারাম করেছেন। পবিত্র হওয়ার কারণ হল: এগুলো যেমন রুচি সম্মত তেমনি তা শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

আর যে বস্তুগুলো আমাদের জন্য ক্ষতিকর আল্লাহ তা'আলা সেগুলোকে হারাম করেছেন। আর যা আমাদের জন্য উপকারী, আল্লাহ তা'আলা তাই আমাদের জন্য হালাল করেছেন।

তারপর তিনি বলেন: পানাহার, পরিধান, ক্ষুধা ও পরিতৃপ্ততায় মানুষের অনেক অবস্থা রয়েছে। আর একজন মানুষের অবস্থাও অনেক প্রকার হতে পারে কিন্তু সর্বোত্তম আদর্শ হল ওটাই যদ্বারা আল্লাহ তা'আলার অনুসরণ হয় ও যা গ্রহণকারীর পক্ষে উপকার হয়।

৩১. অন্যের সম্মান রক্ষা

ইসলামী শিক্ষা ও যিকিরের মজলিসই হল সর্বশ্রেষ্ঠ মজলিস। আর সে মজলিসে যদি মানব জাতির সর্বোত্তম ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন যাতে তিনি তাঁর হাদীস ও যাবতীয় শিক্ষা ও নির্দেশিকা দিবেন তা কেমন হতে পারে? তাঁর মজলিসের বিশুদ্ধতা ও তাঁর আত্মিক নির্মলতার প্রমাণই হল, ভুলকারীকে সংশোধন করে দেয়া, অজ্ঞকে শিক্ষা দেয়া, উদাসিন-গাফেলকে সতর্ক করা। তাঁর মজলিসে উত্তম কথা ও কার্যক্রম ব্যতীত অন্য কোন কিছুই তিনি মেনে নিতেন না। কেউ কথা বলা আরম্ভ করলে যদিও চুপ থেকে তার কথাগুলো তিনি শ্রবণ করতেন তবে তিনি কারো গীবত, পরনিন্দা ও অপবাদ দেয়া কোন ক্রমেই মেনে নিতেন না। এজন্যে তিনি অন্যের সম্মান রক্ষায় এ সব ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করতেন।

উতবান বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ নামাযে দাঁড়িয়ে বললেন:

أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ، لاَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقُلْ. أَلاَ تَرَاهُ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: قُلْنَا: فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ. فَقَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ

"মালেক বিন আদ্দাখশামকে দেখছিনা কেন? এক ব্যক্তি বলল: সে তো মুনাফিক। কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে পছন্দ করে না। এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন: তুমি এ কথা বলো না। তুমি কি জানো না, সে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনায় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই" স্বীকার করেছে! আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে ঐ ব্যক্তির ওপর হারাম করেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনায় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই" বলে ঘোষণা করবে!।"[২৪৩]

নবী ﷺ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া থেকে নিষেধ করেছেন এবং তেমনিভাবে অন্যের অধিকার খর্ব করা থেকেও নিষেধ করেছেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ # এরশাদ করেছেন:

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلاَ وَقَوْلُ الزُّو

"আমি কি তোমাদের সর্বাধিক বড় গোনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না? আমরা বললাম নিশ্চয়ই হে আল্লাহর রাসূল! অবহিত করুন। তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা ও পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দিয়ে বসে ছিলেন, অতঃপর তিনি উঠে বসে বললেন: সাবধান তোমরা মিথ্যা কথা হতে বিরত থাকো।"[২৪৪]

মুমিন জননী হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি অগাধ ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তার কর্তৃক গীবত করাটা কঠোরভাবে দমন করে তার ভয়াবহতা বর্ণনা করেছেন।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

---

[২৪৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৫৪০১

[২৪৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৫৯৭৬

قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ: تَعْنِي قَصِيرَةً، فَقَالَ: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ

"আমি বললাম: হে নবী করীম ﷺ হয়েছে হয়েছে ঐ সেই সাফিয়া! অন্য বর্ণনায় এসেছে- অর্থাৎ তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছিলেন ঐ বেঁটে সাফিয়া! এ কথা শুনে তিনি বলেন: তুমি এমন কথা বলেছ, তা যদি সাগরে মিশ্রু করা হতো তবে সাগরের পানিকে পরিবর্তন করে দিতো।"[২৪৫]

অন্য ভাইয়ের দোষ গোপনের মাধ্যমে সম্মান রক্ষাকারীকে সুসংবাদ দিয়ে নবী করীম ﷺ বলেন:

مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّا

"যে ব্যক্তি অন্য ভায়ের গীবত দমন করে তার সম্মান রক্ষা করল, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।"[২৪৬]

৩২. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যিকিরের বর্ণনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশী বেশী আল্লাহ তা'আলার যিকির করতেন। মুসলিম জাতির প্রধান শিক্ষক তাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইবাদাত ও আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁর অন্তরের যোগাযোগ ছিল সুদৃঢ়। তাঁর জীবনের পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল। এরপরও তিনি আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন, এস্তেগফার ব্যতীত এক মূহুর্ত সময়ও অতিবাহিত করতেন না!। তিনি ছিলেন শুকরগুজার বান্দা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসাকারী রাসূল। তিনি তাঁর প্রভুর মর্যাদা সম্পর্কে সম্মক জ্ঞান লাভ করেই তাঁর প্রশংসা করতেন, করতেন তাঁর সমীপে প্রার্থনা, তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন। তিনি স্বীয় সময়ের মূল্য সম্পর্কে বুঝতেন বলেই তিনি তা হতে উপকৃত হতে পেরেছিলেন, আর সে সময়কে তিনি আল্লাহর অনুসরণ ও তাঁর ইবাদাতে কাটানোতেই ছিলেন সচেষ্ট।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

---

[২৪৫] সুনানে আবি দাউদ, হাদীস নং : ৪৮৭৫

[২৪৬] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং : ২৭৬০৯

"রাসূল ﷺ সর্বদায় আল্লাহ তা'আলার যিকির করতেন।"[২৪৭]

ইবনে আব্বাস " হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসূল ﷺ-কে এক বৈঠকে একশত বার এ দু'আ পড়তে শুনেছি:

رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো ও আমার তাওবাকে কবূল করে নাও, নিশ্চয়ই তুমি দয়ালু ও তাওবা কবূলকারী।"[২৪৮]

হযরত আবু হুরাইরা " বলেন:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

"আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি: তিনি বলেন: আল্লাহর শপথ আমি প্রতিদিন সত্তরের অধিক বার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করে থাকি।"[২৪৯]

ইবনে উমার " বলেন: আমরা রাসূল ﷺ-এর এক বৈঠকে একশত বার এ দু'আ পড়তে শুনেছি:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো ও আমার তাওবাকে কবূল করে নাও, নিশ্চয়ই তুমি দয়ালু ও তাওবা কবূলকারী।"[২৫০]

মুসলিম জননী উম্মু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছে থাকাকালিন এ দু'আটি বেশি পাঠ করতেন:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

"হে অন্তর পরিবর্তনকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো।"[২৫১]

---

[২৪৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৩৭৩/১১৭
[২৪৮] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং : ১৫১৬
[২৪৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৬৩০৭
[২৫০] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং : ১৫১৬
[২৫১] তিরমিযী, হাদীস নং : ২১৪০

৩৩. প্রতিবেশীর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিবেশী হওয়াটাই ছিল সম্মানের কারণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরে প্রতিবেশীর মহা অবস্থান বিরাজ করত। তিনি বলেন:

مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

"জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমাকে সর্বদায় প্রতিবেশী সম্পর্কে অসিয়ত করতেন; এমন কি আমি এ আশঙ্কা করতাম যে, হয়তো তাকে তাঁর উত্তরাধিকার করে দেবে।"[২৫২]

রাসূল ﷺ আবু যার "-কে এ বলে অসিয়াত করেছেন:

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ

"হে আবু যার! তুমি যখন গোশ্‌ত পাকাবে তাতে ঝোল একটু বাড়িয়ে দাও ও প্রতিবেশীর খোঁজ নাও।"[২৫৩]

রাসূল ﷺ প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া থেকে সতর্ক করে বলেন:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

"যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয়; সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[২৫৪]

প্রতিবেশীর জন্য সৌভাগ্য যার সম্পর্কে তিনি বলেন:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করে।"[২৫৫]

৩৪. মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْءُ لَمْ يَقُلْ: مَا بَالُ فُلَانٍ يَقُولُ؟ وَلَكِنْ يَقُولُ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا؟

---

[২৫২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৬০১৪

[২৫৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৬২৫/১৪২

[২৫৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৪৬/৭৩

[২৫৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৪৮/৭৭

"কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো প্রকার ত্রুটির সংবাদ পৌঁছলে রাসূল ﷺ তার নাম উল্লেখ করে বলতেন না যে অমুকের কি হয়েছে? বরং তিনি এভাবে বলতেন: লোকদের কি হলো যে, তারা এমন এমন কথা বলে?।"[২৫৬]

হযরত আনাস বিন মালেক " বলেন: একদা রাসূল ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তি এমন অবস্থায় প্রবেশ করল, যখন তার উপর হলুদ রং পরিলক্ষিত হচ্ছিল, আর রাসূল ﷺ অপছন্দ করেন, এমন কিছু নিয়ে কম লোকই তাঁর নিকট আসত। সে লোকটি যখন তাঁর নিকট থেকে বের হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন:

لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ ذَا عَنْهُ

"তোমরা যদি এ ব্যক্তিকে তা ধৌত করতে বলতে, তবে ভালো হতো।"[২৫৭]

হযরত ইবনে মাসউদ " হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ، عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ

"আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দিব না? যে ব্যক্তি জাহান্নামের জন্য হারাম আর জাহান্নাম তার জন্য হারাম। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্যই জাহান্নাম হারাম যে নিকটবর্তী, সহজ সরল ও নরম প্রবৃত্তির।"[২৫৮]

৩৫. মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ ﷺ

মানুষের ওপর অনেক অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার হক বা অধিকার, পরিবারের হক বা অধিকার স্বীয় আত্মার অধিকার, বান্দাদের অনেক অধিকার। রাসূলুল্লাহ ﷺ সময়কে কিভাবে ভাগ করে দিনের প্রতিটি মূহুর্তকে কাজে লাগিয়ে সঠিকভাবে অধিকারগুলো পালন করেছেন?!

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন:

جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا:

---

[২৫৬] সুনানে আবি দাউদ, হাদীস নং : ৪৭৮৮

[২৫৭] সুনানে আবি দাউদ, হাদীস নং : ৪৭৮৯

[২৫৮] তিরমিযী, হাদীস নং : ২৪৮৮

وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ. فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا. أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ. لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ. وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"একদা তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে এসে তাঁর ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, সে সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তারা তা অতি নগন্য মনে করল। তারা বলে উঠল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদায় আমরা তো নগণ্য, কেননা তাঁর জীবনের পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলল: আমি সারা রাত ধরে সালাত আদায় করব। অন্যজন বলল: আমি সারা জীবন ধরে রোযা রাখব, কখনো ছাড়ব না। অন্যজন বলল: আমি বিবাহ করব না। অত:পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট এসে বললেন: তোমরাই এসব কথা-বার্তা বলেছিলে? আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি: আমিই সর্বাপেক্ষা আল্লাহকে ভয় করে থাকি, তারপরও আমি মাঝে মধ্যে রোযা রাখি আবার মাঝে মধ্যে রোযা রাখি না, রাতের কিছু অংশ সালাত আদায় করি আবার কিছু অংশে ঘুমাই, আর আমি বিবাহ করেছি। ওহে! তোমরা জেনে রেখো! যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অবজ্ঞা করল, সে আমার দলভুক্ত নয়।"[২৫৯]

৩৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ত্যাগ-কুরবানী

আল্লাহর দ্বীনের কালেমাকে বুলন্দ করার নিমিত্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে নিয়ামত দিয়েছিলেন তা তিনি সঠিকভাবে ব্যয় করেছেন। তিনি একাই কুরাইশ ও তাদের নেতাদের দাওয়াত দেয়া ও তাদের সাথে সত্যের আন্দোলনে মুখোমুখি হয়ে এ দ্বীন ইসলাম বিজয় লাভ করা অবধি টিকে থাকার পরও তিনি কখনো বলেননি যে, আমার সাহায্যে কেউ আসেনি অথবা সকল জাতির লোক আমার বিরোধী আমি একা। বরং তিনি

---

[২৫৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৫০৬৩

আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে মহা বীরত্বের সাথে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে গেছেন এবং লোকদেরকে উৎসাহ দান করেছেন এবং তাদেরকে দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য আহ্বান করা সত্ত্বেও লোকেরা দূরে সরে যাওয়ার পরও তিনি স্থির থেকেছেন এসকল আদর্শই প্রমাণ করে তাঁর সাহসিকতা ও ধৈর্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েক বছর ধরে হেরা গুহায় ইবদাত করতেন সে সময় তাকে কেউ কষ্ট দেয়নি, আর কুরাইশরাও তার কোন প্রকার বিরোধিতা করেনি, অথবা কাফের গোষ্ঠীর কেউ তার বিরুদ্ধে একটি তীরও নিক্ষেপ করেনি, কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মানব জাতিকে তাওহীদ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের আহ্বান জানালেন, তখনই কাফেররা আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল:

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا

"সে কি বহু মাবূদকে এক মাবূদে পরিণত করছে!"[২৬০]

তারা মূর্তিকে তাদের ও আল্লাহর মাঝে মাধ্যম মনে করত, যা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বর্ণনা করেছেন:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

"আমরা তো তাদের ইবাদাত এজন্যই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করিয়ে দিবে।"[২৬১]

তারা কিন্তু তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহকে স্বীকার করত, যা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

"বলুন: আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হতে কে তোমাদেরকে রিযিক প্রদান করে? বলুন: আল্লাহ! হয় আমরা, না হয় তোমরা সৎপথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত।"[২৬২]

প্রিয় পাঠক! আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন, বর্তমানে মুসলিম দেশগুলি শিরকে সয়লাব হয়ে গেছে। মৃতের নিকট প্রার্থনা করা, তাদেরকে অসীলা মনে করা,

---

২৬০ আল কুরআন, সূরা সাদ, ৫

২৬১ আল কুরআন, সূরা যুমার, ৩

২৬২ আল কুরআন, সূরা সাবা, ২৪

তাদের জন্য মান্নত করা, তাদেরকে ভয় করা ও তাদের নিকট আকাঙ্ক্ষা করা! এমনকি আল্লাহর সাথে শিরক করার কারণে এবং মৃতদেরকে জীবিতদের স্থানে আসন দেয়ার কারণে আল্লাহ সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

"নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম।"[২৬৩]

এবার আমরা তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে উত্তর দিকে এক পাহাড়ের দিকে ধাবিত হই, সে পাহাড়টি হল উহুদ পাহাড়। যেখানে মহা সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল। যেথায় প্রকাশ পায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বীরত্ব এবং প্রামাণিত হয় অসীম ধৈর্য, যে মহা যুদ্ধে তিনি ভীষণ আক্রান্ত ও জখম হন, এমনকি তার চেহারা মুবারক রক্তাক্ত হয়। সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায় ও মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হন।

সাহাল বিন সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহত হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ، وَبِمَا دُووِيَ، قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْسِلُهُ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً، أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيرٍ، فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا، فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَئِذٍ، وَجُرِحَ وَجْهُهُ، وَكُسِرَتِ

"আমি আল্লাহ তা'আলার শপথ করে বলছি, আমি জানি: কে রাসূল ﷺ-এর আঘাত প্রাপ্ত জায়গা ধৌত করেছে এবং তাতে কে পানি ঢালছিল এবং কোন জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন: রাসূল ﷺ-এর কন্যা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ধৌত করেছিল এবং আলী " লোটা থেকে পানি

---

[২৬৩] আল কুরআন, সূরা মায়িদা, ৭২

ঢালছিলেন। আর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন দেখলেন যে, পানি ঢালায় রক্ত প্রবাহিত হওয়া আরো বৃদ্ধি হচ্ছে তখন তিনি চাটাই পুড়িয়ে লাগিয়ে দিলেন, তখন রক্ত প্রবাহিত হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর সামনের দাঁত ভেঙেছিল এবং তার মুখমণ্ডলে আঘাত লেগেছিল এবং লৌহ বর্ম ভেঙে তাঁর মাথায় প্রবেশ করেছিল।"[২৬৪]

রাসূল ﷺ-এর হুনাইন যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে অব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব " বলেন: হুনায়নের যুদ্ধের দিন মুসলিম বাহিনী যখন হটে যাচ্ছিল, তখন তিনি তার সওয়ারীকে লাথি মেরে কাফেরদের দিকে দৌড়ানো শুরু করেন; কিন্তু আমি এই নিয়তে সওয়ারীর লাগাম ধরে বাধা দেই যেন সে দ্রুত না যেতে পারে। আর নবী করীম ﷺ এ অবস্থায় বলছিলেন:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

"আমি সত্য নবী, মিথ্যা নবী নই, আমি আব্দুল মুত্তালিবের উত্তরসূরী।"[২৬৫]

বীর সেনানী অশ্বারোহী, বহু বহু প্রসিদ্ধ ঘটনা প্রবাহের নায়ক আলী বিন আবু তালেব " রাসূল ﷺ সম্পর্কে বলেন: যখন একদল অন্য শত্রু দলের মুখামুখি হতো ও যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করত, তখন আমরা রাসূল ﷺ-এর আশ্রয় গ্রহণ করতাম, তিনিই সর্বাগ্রে শত্রুর নিকটবর্তী হতেন।

দাওয়াতি কাজে রাসূল ﷺ-এর ধৈর্যের কারণেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন হয় ও উত্তম আদর্শ রচিত হয়; এমনকি যার ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা এ দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং মুসলিম বাহিনী সারা আরব উপদ্বীপ, শাম ও মাওরাআন নাহার [সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আফগান সীমান্ত] পর্যন্তই ইসলামের ঘোড়া অবাধে বিচরণ করেছে, এমনকি পাকা ও কাঁচা সকল ঘরেই ইসলাম প্রবেশ করেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ

---

[২৬৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৪০৭৫

[২৬৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ২৮৭৪

"আল্লাহর রাস্তায় আমাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়েছে কিন্তু এর প্রতিশোধ হিসেবে কাউকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়নি। আল্লাহর রাস্তায় আমাকে অনেক কষ্ট দেয়া হয়েছে কিন্তু এর প্রতিশোধ হিসেবে কাউকে কষ্ট দেয়া হয়নি। আমার উপর ত্রিশ দিন ও রাত অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু আমার ও বেলালের জন্য এমন কোনো খাদ্যও ছিল না যা কোন ব্যক্তি খেতে পারে, তবে শুধু বেলাল যা কিছু তার বগলের নিচে নিয়েছে।"[২৬৬]

অথচ তাঁর নিকট অনেক সম্পদ এসেছে, অনেক গনিমতের মাল লাভ করেছেন তিনি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাতে অনেক বিজয় দান করেছেন। এরপরও তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো অর্থ-কড়ি রেখে যাননি। তবে তিনি যে উত্তরাধিকার রেখে গেছেন, তা হলোঃ ইলম বা জ্ঞান। বস্তুত এটাই হলো 'মীরাসুন্ নবুওয়াহ' বা 'নবুওয়তের উত্তরাধিকার'। কেউ যদি সে উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে চায়, সে যেন তা গ্রহণ করে এবং আনন্দ চিত্তে তা গ্রহণ করে।

হযরত আয়েশা ! বলেন:

مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا شَاةً، وَلَا بَعِيرًا، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো প্রকার দিনার-দিরহাম, কোনো প্রকার ছাগল বা উট রেখে যাননি এবং কোনো প্রকার অসীয়তও করে যাননি।"[২৬৭]

৩৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বীরত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সর্বাপেক্ষা বীরত্বের অধিকারী একজন সাহসী মানুষ। যার প্রমাণ, এক আল্লাহর ইবাদত এবং তার তাওহীদের ঝাণ্ডা নিয়ে কাফির সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় তিনি একাই এগিয়ে গিয়েছেন। তারা সম্মিলিতভাবে তাঁর বিরোধিতা করেছে, তার সাথে যুদ্ধ করেছে, নির্যাতন নিপীড়নের সব পদ্ধতি তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে, হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে বার বার। তাদের এত ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও তাঁকে ভীত করতে পারেনি। মুহূর্তের জন্যেও বিরত রাখতে পারেনি তাঁকে দাওয়াত-কর্ম থেকে। তাদের নির্যাতন যত বেড়েছে তাঁর কর্মস্পৃহা তত বৃদ্ধি পেয়েছে। দাওয়াতি কাজ্য আরো গতিময় হয়েছে। তিনি সত্যকে আঁকড়ে ধরেছেন আরও দৃঢ়তার সাথে। তাদের লোভ প্রদর্শন ও চ্যালেঞ্জের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে ঘোষণা করেছেন :

---

[২৬৬] তিরমিযী, হাদীস নং : ২৪৭২

[২৬৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৬৩৫/১৮

আল্লাহর শপথ! তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য, আর বাঁ হাতে চন্দ্র এনে দিয়ে আমাকে এ দাওয়াত-কর্ম পরিত্যাগ করতে বলে, তবুও আমি তা ত্যাগ করব না। যতক্ষণ না, আল্লাহ তাআলা তার দ্বীনকে জয়ী করেন, অথবা আমি ধ্বংস হয়ে যাই।

আনাস রা. বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ، ولقَدْ فَزِعَ أَهلُ الْمَدِيْنَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَتَلَقَّاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا، وَقَدْ سَبقهُمْ إِلَى الصَّوْتِ، وَهُو عَلى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحةَ عُرْيٍ، فِي عُنقِه السيفُ، وَهُوَ يقُول: "لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُراعُوا" أَيْ لَا تَخَافُوا، لَا تَخَافُوا.

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন একজন সুন্দরতম মানুষ, বড় দানশীল ও সর্বাপেক্ষা সাহসী। এক রাতের ঘটনা, হঠাৎ চিৎকার শুনে মদীনার জনগণ আতঙ্কিত হয়ে আওয়াজের উৎসের দিকে ছুটে চলল। গিয়ে দেখতে পেল রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের আগেই সেখানে পৌঁছে ফিরে আসছেন। তিনি আবু তালহার ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন, তার কাঁধে ছিল তরবারি। আর মুখে বলছিলেন : ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না।[২৬৮]

আল্লামা নববী রহ. বলেন, এখানে অনেকগুলো শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, যেমন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বীরত্ব তিনি সকলের আগে এবং সব চেয়ে দ্রুত শত্রু অভিমুখে ছুটে গিয়েছেন। অবস্থার সত্যতা যাচাই করেছেন এবং অনেকের পৌঁছার পূর্বেই তিনি ফিরে এসেছেন।

জাবের রা. বলেন :

كُنَّا يَوْمَ الخَنْدَقِ نَحْفِرُ، إِذْ عَرضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيْدَةٌ. فَجَاءُوا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: هَذِهِ كُديَةٌ عَرضَتْ فِي الخَنْدقِ. فَقالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا نَازِلٌ" ثُمَّ قَام، وَبَطْنُهُ مَعْصُوْبٌ بِحَجرٍ، وَلَبِثْنَا ثَلاثَةَ

---

২৬৮ বোখারি ও মুসলিম

أَيَّامٍ لاَ نَذُوْقُ ذَوَاقًا, فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِعْوَلَ. فَضَرَبَ فِي الْكُدْيَةِ. فَعَادَ كَثِيْبًا أَهْيَلَ أَوْ أَهْيَمَ.

আমরা খন্দকের দিন পরিখা খনন করছিলাম। হটাৎ একটি বিশাল শক্ত পাথর বের হয়ে এল। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে এ বিষয়ে অবহিত করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি আসছি। এরপর তিনি দাঁড়ালেন। তাঁর পেটে ছিল পাথর বাঁধা। আমরা সকলেই তিন দিন যাবৎ কোন খাবার গ্রহণ করিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুড়াল হাতে নিয়ে খুব জোরে আঘাত করলেন আর পাথরটি বালু কতার ন্যায় টুকরো টুকরো হয়ে গেল।[২৬৯]

এ ঘটনা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শক্তি ও সামর্থ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কঠিন থেকে কঠিনতম মুহূর্তেও স্বীয় বীরত্ব ও সাহসের প্রমাণ দিয়েছেন। যত-ই কঠিন মুহূর্ত হোক-না-কেন তিনি পিছপা হতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা, সম্মান, দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধের গুরুত্ব কেবল সেই ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারে, যাকে আল্লাহ তাআলা এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য নিয়োজিত করেছেন।

এ জন্যই আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। কোন ব্যক্তি একবারের জন্যও প্রমাণ করতে পারেনি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের ময়দান হতে পিছপা হয়েছেন। কি কারণে সাহাবায়ে কেরাম চক্ষু ও অন্তর ভরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মহব্বত করতেন? কি জন্যে ছোট-বড় সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইশারাতে প্রতিযোগিতা করে ছুটে আসতেন? শুধু কি এ জন্যই যে, তিনি একজন রাসূল? না, বরং তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বীরত্ব ও সাহসের কাছে নিজেদেরকে দেখতে পেতেন শূন্য-সদৃশ। অথচ তাদের মধ্যেও এমন বীর ও দুঃসাহসী পুরুষ বিদ্যমান ছিল যাদের মাধ্যমে মানুষ বীরত্বের উদাহরণ পেশ করত।

এ প্রসঙ্গে আলী রা. বলেন :

كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ، وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ, اتَّقَيْنَا بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَمَا يَكُوْنُ مِنَّا أَحَدٌ أَدْنَى إِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ.

---

২৬৯ সহিহ বোখারি

"যখন যুদ্ধ কঠিন আকার ধারণ করত, আমরা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বারা হেফাযত করতাম। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হতেন) তিনিই আমাদের চেয়ে শত্রুর বেশি নিকটবর্তী থাকতেন।"[২৭০]

আলী রা. আরো বলেছেন :

لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ، وَنَحْنُ نَلُوْذُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَأْسًا.

বদরের যুদ্ধে দেখেছি, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বারা নিজেদেরকে রক্ষা করছি। শত্রু পক্ষের অতি নিকটে তিনিই ছিলেন। যুদ্ধে তিনি সকলের চেয়ে বেশি বীরত্বের প্রমাণ দিতেন।[২৭১]

উহুদ যুদ্ধে অভিশপ্ত উবাই বিন খালফ ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যার উদ্দেশে নিকটবর্তী হতে লাগল। সে বলছিল, মুহাম্মাদ! তুমি যদি বেঁচে যাও, তাহলে আমার রক্ষা নেই। সাহাবারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ কি তার ওপর দয়া দেখাতে পারে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে আসতে দাও। সে নিকটবর্তী হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ হারেস বিন সাম্মা থেকে একটি বর্শা নিয়ে ঝাঁকুনি দিলেন, সাথে সাথেই সাহাবায়ে কেরাম তার নিকট হতে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার গর্দানে একটি খোঁচা মারলেন, আর তাতেই সে ঘোড়া হতে কয়েকটি পলটি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল এবং কুরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে বলতে লাগল : মুহাম্মাদ আমাকে হত্যা করেছে। তারা বলল : তোমার কিছু হয়নি। সে বলল : তোমরা বল কি! এ যন্ত্রণা যদি সমগ্র মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়, তবে সকলেই মারা যাবে। তোমরা কি ভুলে গেছ! সে কি আমাকে বলেনি : আমি তোমাকে হত্যা করব। আল্লাহর শপথ করে বলছি, সে যদি আমার প্রতি থুথুও নিক্ষেপ করত, আমি মরে যেতাম। অতঃপর ফেরার পথে সে মারা গেল।

হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানগণ যখন দৌড়ে পালাচ্ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় জায়গাতে স্থির দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর বলছিলেন, আমি সত্যিকারার্থে নবী, মিথ্যুক নই : আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান। (ভীরু নই)।

---

[২৭০] মুসনাদে আহমদ ও নাসাঈ

[২৭১] মুসনাদে আহমদ

৩৮. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রার্থনা

দোয়া-প্রার্থনা হল মহান এক ইবাদাত, যা আল্লাহ ব্যতীত কারো নিকট করা কোনভাবেই বৈধ নয়। দোয়ার অর্থ হলঃ আল্লাহর সমীপেই মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ ও সকল সামর্থও শক্তি আল্লাহর দিকে সোপর্দ করা। আর দোয়া বা প্রার্থনা করাই হল বান্দার আসল পরিচয় এবং মানবিক দুর্বলতা ও বশ্যতার বহি:প্রকাশ তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন: اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ দোয়াই হল ইবাদাত।

তাই তো রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা আল্লাহর সমীপে দোয়া ও বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করতেন এবং তিনি ব্যাপক ভাব সম্পন্ন কথা বলতে ও দোয়া- প্রার্থনা করতে পছন্দ করতেন।

রাসূল ﷺ-এর দুআ-

اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ . وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

“হে আল্লাহ! তুমি আমার দ্বীনকে সুন্দর-সঠিক কর যা আমার সকল কর্মের হেফাযতকারী। আমার পার্থিব জীবনকে সুন্দর কর যাতে আমার জীবিকা রয়েছে। আমার পরকালকে সুন্দর কর যাতে আমার প্রত্যাবর্তন হবে। সৎ কর্মের মধ্যে আমার হায়াত বৃদ্ধি কর এবং মন্দ কর্ম হতে মওতকে আমার জন্য আরামদায়ক কর।”[২৭২]

اَللّٰهُمَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِكِهٖ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِيْ سُوْءاً أَوْ أَجُرَّهُ إِلٰى مُسْلِمٍ.

“হে আল্লাহ! তুমি উপস্থিত ও অনুপস্থিত সম্পর্কে জ্ঞাত, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকারী, হে প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ও অধিপতি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি আমার আত্মার মন্দ হতে এবং

[২৭২] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৭২০/৭১

শয়তান ও তার শিরকের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি নিজের অনিষ্ট হতে এবং কোন মুসলমানের অনিষ্ট করা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[২৭৩]

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

"হে আল্লাহ ! তুমি তোমার হারাম বস্তু হতে বাঁচিয়ে তোমার হালাল রিযিক দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করে দাও। আর তোমার অনুগ্রহ অবদান দ্বারা তুমি ভিন্ন অন্য সব হতে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও।"[২৭৪]

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الأَعْلَى

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া করো ও আমাকে আমার সর্বোচ্চ বন্ধুর সাথে মিলিত কর।"[২৭৫]

নবী ﷺ সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করতেন, বদরের যুদ্ধের ময়দানে তিনি মুসলিম বাহিনীর বিজয় ও মুশরিক বাহিনীর পরাজয়ের জন্য দোয়া করতে করতে কাঁধ থেকে তাঁর চাদর পড়ে গিয়েছিল। নবী ﷺ নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, সাহাবীদের জন্য ও সমস্ত মুসলমানদের জন্য দোয়া করতেন।

৩৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহজ-সরল জীবন পদ্ধতি

দুনিয়ার বাস্তবতা, ভঙ্গুরতা ও অস্থায়িত্ব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ছিল। তাই তিনি নিঃস্ব ও গরিব লোকদের জীবনযাপন-পদ্ধতি প্রাধান্য দিতেন এবং তাদের মতই সাদাসিদা জীবন যাপন করতেন। আর প্রত্যাখ্যান করতেন ঐশ্বর্যবানদের প্রাচুর্যময় জীবনাচার। একদিন অভুক্ত থেকে সবর করতেন, অপর দিন খাবার গ্রহণ করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন।

তিনি নিজ উম্মতকে পার্থিব জগতের ফিতনা-প্রতারণা, চাকচিক্যে নিমগ্ন হওয়ার সমূহ ক্ষতি সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নিশ্চয় দুনিয়া- সুমিষ্ট, শ্যামল। আর আল্লাহ তোমাদেরকে সেখানে খলিফা হিসেবে রেখেছেন। অতঃপর তিনি লক্ষ্য করবেন, তোমরা কি আমল কর। তোমরা দুনিয়া হতে সতর্ক থাক, সতর্ক থাক নারী হতেও। কারণ বনী ইসরাঈলের সর্বপ্রথম ফিতনা ছিল নারী।

---

[২৭৩] আবু দাউদ, হাদীস নং : ৫০৮৩

[২৭৪] তিরমিযী, হাদীস নং : ৩৫৬৩

[২৭৫] তিরমিযী, হাদীস নং : ৩৮৯৬

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিশ্চিত ছিলেন যে, দুনিয়া সেই ব্যক্তির ঘর যার কোনো ঘর নেই, সেই ব্যক্তির জান্নাত পরকালের জান্নাতে যার কোনো অংশ নেই। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, হে আল্লাহ! একমাত্র আখেরাতের সুখ-ই প্রকৃত সুখ।

একারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আখিরাতকে তাঁর একান্ত লক্ষ্য বানিয়েছিলেন। দুনিয়ার যাবতীয় ঝামেলা হতে একেবারে শূণ্য করে রেখেছেন নিজ অন্তরকে। তবে দুনিয়া তাঁর কাছে দৌড়ে আসত, আর তিনি তা পাশ কাটিয়ে যেতেন খুবই সতর্কতার সাথে।

তিনি বলতেন, দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক! আমি তো আরোহীতুল্য - যে ক্ষণিকের জন্য একটি গাছের নীচে বিশ্রাম নিল, পরক্ষণেই তা ত্যাগ করে আবার যাত্রা শুরু করবে।

উম্মুল মু'মিনীন জুয়াইরিয়া রা. এর ভাই আমর বিন হারেস বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুর সময় টাকা-পয়সা, গোলাম-বাঁদি, কিছুই রেখে যাননি। শুধু তাঁর আরোহণের একটি সাদা খচ্চর, ব্যক্তিগত হাতিয়ার আর একখণ্ড জমি যা তিনি সদকা করে দিয়েছিলেন (বিপদগ্রস্ত) পথিকদের কল্যাণার্থে।

এ হল সৃষ্টির সেরা রহমতে আলমের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার। তাঁর ওপর আল্লাহ তাআলার শত কোটি সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। তিনি বাদশা-নবী হতে চাননি। তিনি বরং দাস-নবী হওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত:

جَلَسَ جِبْرِيْلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مَلَكٌ يَنْزِلُ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ: هٰذَا الْمَلَكُ مَا نَزَلَ مُنْذُ خُلِقَ قَبْلَ هَذِهِ السَّاعَةِ . فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ؛ أَمَلِكًا أَجْعَلُكَ، أَمْ عَبْدًا رَسُوْلاً؟ فَقَالَ لَه جِبْرِيلُ: تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: "لَا بَلْ عَبْدًا رَسُوْلاً.

"জিবরাঈল আলাইহিস সালাম একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বসা। এমতাবস্থায় আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন, একজন ফেরেশতা অবতরণ করছেন। জিবরাঈল তাকে বলেন, এ ফেরেশতা সৃষ্টির পর থেকে আজকের এ মুহূর্তের আগ পর্যন্ত কখনো অবতরণ করেননি। তিনি অবতরণ করে বলেন :

মুহাম্মদ! আপনার প্রভু আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। আপনাকে কি বাদশা-নবী বানিয়ে দেব? না, দাস-নবী? জিবরাঈল তাকে বললেন, মুহাম্মদ! আল্লাহর জন্য বিনয়ী হোন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, আমি বান্দা রাসূল হতে চাই।"[২৭৬]

এ হল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পার্থিব জীবন-যাপন। যা ছিল বিনয় নির্লোভ ও দুনিয়া বিমুখতায় সমৃদ্ধ।

আয়েশা রা. বলেন :

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُه ذُو كَبِدٍ إِلَّا شِطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْه حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُه فَفَنِيَ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইন্তেকাল করলেন, আমার ঘরে একটি তাকের ওপর রাখা সামান্য কিছু যব ছাড়া কোন প্রাণী খেতে পারে তেমন কিছু ছিল না। আমি তা-ই খেয়ে যাচ্ছিলাম অনেকদিন যাবৎ। একদিন মেপে দেখলাম, এর পরই শেষ হয়ে গেল।"[২৭৭]

ওমর রা. মানুষের প্রাচুর্য দেখে একদিন বললেন :

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظِلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ.

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, পেট মোড়াতে মোড়াতে দিন পার করে দিয়েছেন, অথচ পেট ভরে খাবার জন্য নিম্নমানের খেজুরের ব্যবস্থাও হয়নি।"[২৭৮]

আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؛ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوارِيه إِبِطُ بِلَالٍ.

---

[২৭৬] সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং : ৬৩৬৫
[২৭৭] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ৩০৯৭
[২৭৮] সহিহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৯৭৭/৩৪

"আমাকে আল্লাহর পথে এতো ভয় দেখানো হয়েছে, যা অন্য কারও ব্যাপারে হয়নি। আল্লাহর জন্য আমাকে এতো কষ্ট দেয়া হয়েছে, যা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। আমার ওপর দিয়ে ত্রিশটি রাত ও ত্রিশটি দিন এমনও অতিবাহিত হয়েছে যে, আমার এবং বেলালের খাবারের জন্য কিছুই ছিল না। একমাত্র বেলালের বগলের ভেতর রক্ষিত সামান্য কিছু খাদ্য ছাড়া।"[২৭৯]

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার পরিবার একাধারে কয়েক দিন পর্যন্ত অভুক্ত কাটাতেন। রাতের খাবারের জন্য কিছুই জুটত না। তাদের অধিকাংশ সময়ের জীবিকা ছিল যবের রুটি।

আনাস রা. বলেন :

لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ, وَلَمْ يَأْكُلْ خَبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ.

নবী আকরাম ﷺ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কখনো টেবিল জাতীয় কিছুর ওপর রেখে খাবার গ্রহণ করেন নি এবং তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কখনো পাতলা রুটি খাননি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণত চাটাইতে বসতেন এবং তাতেই নিদ্রা যেতেন।[২৮০]

ওমর রা. বলেন :

دَخلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى حَصِيْرٍ. قَالَ: فَجلَسْتُ, فَإِذَا عليهِ إِزَارُه، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيرُه, وَإِذَا الْحَصِيْرُ قَدْ أَثَّر فِي جَنْبِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِذا أَنَا بِقبْضَةٍ مِن شَعيرٍ نَحوِ الصَّاعِ، وقَرَظٍ() فِي نَاحِيَةٍ فِي الغُرْفَةِ, وَإِذَا إِهَابٌ() مُعلَّقٌ. فَابتَدَرتْ عَيْنَايَ. فَقَالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟" فَقُلتُ: يَا نبِيَّ اللهِ! وَمَا لِي لَا أَبْكِي, وَهَذَا الْحَصِيْرُ قَدْ أَثَّر فِي جَنْبِكَ, وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ

---

[২৭৯] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং : ২৪৭২

[২৮০] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ৬৪৫০

لَا أَرٰى فِيْهَا إِلَّا مَا أَرٰى، وَذَاكَ كِسْرٰى وَقَيْصَرُ فِي الثِّمَارِ والأَنْهارِ، وَأَنتَ نَبِيُّ اللهِ وصَفْوتُه, وَهَذِهِ خزَانتُكَ! فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : يَا ابْنَ الخَطَّابِ! أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে দেখি তিনি চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন। আমি তার পাশে বসলাম, তার ওপর শুধুমাত্র একটি চাদর ছিল। চাটাই তার পার্শ্বদেশে দাগ কেটে দিয়েছে। আরো দেখলাম, ঘরের কোনায় রাখা এক সা পরিমাণ যব, ডালের ন্যায় সামান্য তরকারি উপকরণ আর ঝুলানো একটি চামড়া। এগুলো দেখে আমি অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওমর! কাঁদছ কেন? আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমার না কাঁদার কি আছে? এ চাটাই আপনার পার্শ্বদেশে দাগ কেটে দিয়েছে! আমার সামনে রক্ষিত আপনার এ সামান্যমাত্র জীবনোপকরণ। অথচ কেসরা-কায়সার তথা রোম-পারস্যের রাজা-বাদশাহরা বড় বড় বাগান আর নির্ঝরিণীতে বসবাস করছে। আপনি আল্লাহর নবী, সব নবীদের সরদার আর এ হলো আপনার সম্বল! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে খাত্তাবের বেটা! তুমি কি তাতে সন্তুষ্ট নও, তাদের জন্য দুনিয়া আর আমাদের জন্য আখিরাত।[২৮১]

৪০. হাদিয়া বিনিময় ও মেহমানদারী

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরের গভীরে স্বাভাবিক ও আবেগময় চাহিদা ও প্রয়োজনিয়তা মজ্জাগতভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রতি নিয়তই তা সামাজিক, পারিবারিক ও ঘর কেন্দ্রিক প্রকাশ পেয়ে থাকে, সমস্ত জিনিসের মধ্য থেকে যে জিনিসটি অন্তরের নিকটতম করে দেয় ও হৃদয়কে জয় করে নেয় তা হল: হাদিয়া বা উপহার-উপঢৌকন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

"নিশ্চয়ই নবী করীম ﷺ উপহার গ্রহণ করতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।"[২৮২]

[২৮১] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং : ৪১৫৩

[২৮২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৩৫৩৬

আর এ উপহার প্রদান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হল: অন্তরাত্মার উদারতা, বদান্যতা ও পরিশুদ্ধিতার বহি:প্রকাশ। উদারতা ও মহানুভবতার চরিত্র হল নবীদের চরিত্র এবং রাসূলদের নীতি।

এ ক্ষেত্রে আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন অগ্রনায়ক। কেননা তিনিই তো বলেছেন:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন মেহমানদের সমাদর করে। তিনদিন মেহমানদারী, এর মাঝে এক দিন ও এক রাত্রি মেহমানদারী করা মেহমানের প্রাপ্য, এরপর খাওয়ানো সাদাকা। মেজবান অতিষ্ঠ হওয়া অবধি মেহমানের অবস্থান করা বৈধ না।"[২৮৩]

অতীতের কোন কাল, পৃথিবীর কোন ভূমি এমনকি আরবের হেজাজ বা আরব উপদ্বীপের কোন অঞ্চল বরং বিশ্বজগত এমন অনুপম আদর্শ ও মহান চরিত্রের অধিকারী কাউকে দেখেনি। আপনার দুই নয়ন সেই দৃশ্যগুলো হতে কয়েকটি দৃশ্য দেখবে।

সাহাল বিন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ، فِيهَا حَاشِيَتُهَا» ، أَتَدْرُونَ مَا البُرْدَةُ؟ قَالُوا: الشَّمْلَةُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: نَسَجْتُهَا بِيَدِي فَجِئْتُ لِأَكْسُوَكَهَا، «فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ» ، فَحَسَّنَهَا فُلاَنٌ، فَقَالَ: اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنَهَا، قَالَ القَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، لَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ، قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ، مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهُ، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي، قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ

---

[২৮৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৬১৩৫

"জনৈক মহিলা হাতে বুনানো সুন্দর একটি চাদর নিয়ে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল: আমি এ চাদরটি নিজ হাতে বুনে আপনাকে পরানোর জন্য নিয়ে এসেছি। আর রাসূল ﷺ তা প্রয়োজনীয় মনে করে গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি সেটিকে লুঙ্গির মতো পরিধান করে আমাদের মাঝে বের হলেন। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি বলল: কতই না সুন্দর এটি! এটি আমাকে দেবেন কি? রাসূল ﷺ বললেন, হাঁ দেব। তিনি আমাদের বৈঠকে কিছুক্ষণ বসার পর উঠে গিয়ে চাদরটি ভাঁজ করে তার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। লোকেরা তাকে বলতে লাগল, তুমি সুন্দর কাজই করেছ! নবী করীম ﷺ প্রয়োজন বশত সেটি পরিধান করেছিলেন তা সত্ত্বেও তুমি তা চেয়েছ! আর তুমি জান যে, তিনি কোনো আবেদনকারীকে নিরাশ করেন না। অতঃপর সে বলল: আমি এটিকে পরিধান করার জন্য তার কাছে চাইনি, বরং আমি এটিকে কাফন বানানোর জন্য চেয়েছি। সাহাল বলেন: সেটি তার কাফনের কাজেই ব্যবহৃত হয়েছে।"[২৮৪]

যাকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা চয়ন করে তাঁর চোখের সামনে প্রতিপালন করেন এবং যাকে আদর্শ বানিয়েছেন তার অনুপম চরিত্র দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই! রাসূল ﷺ দানশীলতায় ও বদান্যতার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

হযরত হাকীম বিন হিযাম " বলেন:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ: «يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى

"আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট আবেদন করায় তিনি আমাকে দিলেন, আমি আবার আবেদন জানালাম, তিনি পুনরায় আমাকে দিলেন, আবার আবেদন করায় তিনি আমাকে আবেদনানুযায়ী দিয়ে বললেন: হে হাকীম! এই যে সম্পদগুলি এগুলি সবুজ ও মিষ্টি, যে ব্যক্তি একে তৃপ্ত চিত্তে গ্রহণ করবে তাতে বরকত হবে, আর যে ব্যক্তি তা অতৃপ্ত চিত্তে গ্রহণ করবে তাতে বরকত হবে না। এর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মতো যে খায় ঠিকই কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না। আর জেনে রেখো! উপরের হাত অর্থাৎ দানকারী, নিচের হাত অর্থাৎ দান গ্রহণকারীর চেয়ে উত্তম।"[২৮৫]

---

[২৮৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১২৭৭

[২৮৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১৪৭২

আরবী কবি ঠিকই বলেছেন:

وَلَهُ كَمَالُ الدِّيْنِ أَعْلَى هِمَّةٍ يَعْلُوْ وَيَسْمُوْ أَنْ يُقَاسَ بِثَانِي

لَمَّا أَضَاءَ عَلَى الْبَرِيَّةِ زَانَهَا وَعَلَا بِهَا فَإِذَا هُوَ الثَّقَلَانِ

فَوَجَدْتُ كُلَّ الصَّيْدِ فِيْ جَوْفِ الْفَرَا وَلَقِيْتُ كُلَّ النَّاسِ فِيْ إِنْسَانِ

তিনি ইসলামের পরিপূর্ণতায় উচ্চাভিলাষী, তিনি তো জগতে অদ্বিতীয় অতুলনীয় উচ্চাসীন। যেহেতু তাঁর সৌন্দর্য সারা সৃষ্টির ওপর আলোকময়। যার মাধ্যমে তিনি জ্বিন ও ইনসানের শীর্ষে আসীন, সবাই তো নির্বুদ্ধিতা ও বর্বরতায় নিমজ্জিত ছিল, তারপর তো মানুষ মানুষে পরিণত হল।

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ: لاَ"

“নবী করীম ﷺ-এর নিকট কোনো কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনো তা না করতেন না।”[২৮৬]

যতই দানশীলতা, বদান্যতা ও উত্তম চরিত্র হোক না কেন, তাঁর বদান্যতা, দানশীলতা, উদারতা, উত্তম আচরণ ও প্রকৃত আন্তরিকতার কোনো নজীর নেই।

রাসূল ﷺ-এর অভ্যাসই ছিল যে তিনি সবার সাথেই হাস্যোজ্জ্বল মুখে কথা বলতেন এমনকি তাঁর সকল সাহাবীই এ ধারণাই পোষণ করত যে, তাঁর নিকট সেই বেশি প্রিয় ব্যক্তি।

হযরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ " বলেন:

مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَانِي إِلَّا تَبَسَّمَ

“আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূল ﷺ যখনই আমার নিকট হতে আড়াল হতেন এবং যখনই আমাকে দেখতেন তখনই তিনি মুচকি হাসি দিতেন।”[২৮৭]

এক ব্যক্তির সাক্ষ্য তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়াটাই আপনার জন্য যথেষ্ট ও উপদেশমূলক হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আল হারেস বলেন:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

[২৮৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৬০৩৪

[২৮৭] তিরমিযী, হাদীস নং : ৩৮২১, হাদীসটি সহীহ।

"আমি রাসূল ﷺ-এর মতো হাস্যোজ্জ্বল মুখ আর কারো দেখিনি।"[২৮৮]

প্রিয় পাঠক! আপনি কি তাঁর মুখের হাসির বর্ণনা শুনে আশ্চর্য হচ্ছেন? আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তিনিই তো বলেছেন:

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

"হাস্যোজ্জ্বল মুখে তোমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করাটা তোমার জন্য সাদাকাহ সমতুল্য"।[২৮৯]

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের খাদেম আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর এমন গুণ বর্ণনা করেছেন যা স্বল্প লোকের মাঝেই বর্তমান রয়েছে। তিনি বলেন,

مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ لُطْفًا بِالنَّاسِ، مَا سَأَلَهُ سَائِلٌ قَطُّ إِلَّا أَصْغَى إِلَيْهِ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ عَنْهُ، وَمَا تَنَاوَلَ أَحَدٌ بِيَدِهِ قَطُّ إِلَّا وَلَبَّاهُ، فَلَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُهَا مِنْهُ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বাপেক্ষা বিনয়ী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমীপে কেউ আবেদন করলে তিনি তার দিকে এমন মগ্ন হতেন, যতক্ষণ আবেদনকারী নিজেই না ফিরতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য মগ্ন থাকতেন এবং কেউ তাঁর হাত ধারণ করলে, তিনি নিজে স্বীয় হাতকে, টেনে নিতেন না, যতক্ষণ না সে লোক স্বীয় হাত টেনে না নিয়েছে"।[২৯০]

বিদায়ী আরজ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস, তাঁর পবিত্র জীবনী, তাঁর জিহাদ ও বিপদাপদের বর্ণনা শুনে আমাদের কর্তকে সুরভিত করার পর এবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে অধিকার রয়েছে {তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত} তা আদায় করে দ্বীন-ইসলামের সঠিক পথ অবলম্বন করি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি উম্মতের করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

---

[২৮৮] তিরমিযী, হাদীস নং : ৩৬৪১

[২৮৯] তিরমিযী, হাদীস নং : ১৯৫৬

[২৯০] মুসনাদে আবি হানিফা।

"আল্লাহ ও তাঁর ফেরেস্তাগণ নবীর প্রতি সালাত প্রেরণ করেন, হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য সালাত ও সালাম জানাও।[২৯১]

ঈমানের আবাদ ও সৎকর্ম প্রতিষ্ঠিত ঘর হতে আমরা এখন প্রস্থান করছি, আমরা যারা হিদায়েত চাই ও যারা মুক্তি চাই, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতই হবে অনুকরণীয় আদর্শ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর উত্তম অনুসরণ ও যথাযথ অনুকরণের তাওফীক দান করুন।

পরিশেষে প্রিয় ভাইদেরকে মহান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি মূল্যবান হাদীস স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আর তা হল: নবী ﷺ এরশাদ করেন:

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟
قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

"আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, শুধু তারা ব্যতীত যারা অস্বীকার করবে। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করল: হে আল্লাহর রাসূল! কারা অস্বীকারকারী? তিনি বল্লেন: যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যারা আমার আবাধ্য হবে তারাই অস্বীকারকারী।"[২৯২]

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার নবীর মুহাব্বাত দান করো এবং সরল ও সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণের তাওফীক দান করো। পথভ্রষ্টকারীদের পথে নয়।

হে আল্লাহ! দিবা-নিশি সব সময় মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর রহমত বর্ষণ কর।

হে আল্লাহ! সমস্ত আবেদ ও সৎলোকে যত পরিমাণ রহমত কামনা করে, তার প্রতি সেই পরিমাণ রহমত বর্ষণ কর।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে জান্নাতুল ফেরদাউসে একত্রিত করিও এবং তাঁকে দেখিয়ে আমাদের চক্ষু শীতল করিও এবং তাঁর হাউজ কাউসার থেকে পানি পান করাইও

নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর রহমত বর্ষণ করো এবং তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সাহাবা ও সকল মুসলিমের ওপর।

#####

---

[২৯১] সূরা আহযাব, আয়াত নং : ৫৬

[২৯২] সহিহ বুখারী, হাদীস নং : ৭২৮০

১.	কুরআনুল কারীম (সহজ-সরল অনুবাদ)	মাওলানা ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক মাওলানা শাহ্ আলম খান ফারুকী মাওলানা জি এম মেহেরুল্লাহ	প্রকাশিতব্য
	শব্দার্থে আল কুরআনুল কারীম	মাওলানা শাহ্ আলম খান ফারুকী মাওলানা জি এম মেহেরুল্লাহ মাওলানা ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক	প্রকাশিতব্য
	আল কুরআনের সারমর্ম (সংক্ষিপ্ত তাফসীর)	মাওলানা শাহ্ আলম খান ফারুকী	প্রকাশিতব্য
২.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও সহীহ্ হাদীস সংকলন-১	ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ	৩৫০ টাকা
৩.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও সহীহ্ হাদীস সংকলন-২	ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ	৪০০ টাকা
৪.	দারুসুল কুরআন ও দারুসুল হাদীস-১ দারুসুল কুরআন ও দারুসুল হাদীস-২	মুহাম্মদ ইসরাফিল মাওলানা শাহ্ আলম খান ফারুকী	১৪০ টাকা
৫.	Quranic Vocabulary তিন ভাষায় উচ্চারণসহ	আব্দুল করিম পারেখ	২৯৫ টাকা
৬.	আল কুরআনে নারী (নারীর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ)	মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	২৬০ টাকা
৭.	মহানবী (স)-এর গুণাবলী	হাফেয মাওলানা মোঃ ছালাহ্ উদ্দীন কাসেমী	২৫০ টাকা
৮.	কেমন ছিলেন রাসূল (স)	আল্লামা আবদুল মালেক আল কাসেম আল্লামা আদেল বিন আলী আশ শিদ্দী	২০০ টাকা
৯.	রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিপ্লবী জীবন	আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই	১৩০ টাকা
১০.	খোলাফায়ে রাশেদা (রা)	সম্পাদনা পরিষদ	প্রকাশিতব্য
১১.	মহিলা সাহাবী	সম্পাদনা পরিষদ	প্রকাশিতব্য
১২.	সুয়ারীম মীন হায়াতুস সাহাবা (সাহাবীদের জীবন চিত্র) ১, ২	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	প্রকাশিতব্য
১৩.	আল্লাহ ও রাসূল (স) যা করতে নিষেধ করেছেন	মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
১৪.	বারো চান্দের ফজিলত	ত্বকী উসমানী	প্রকাশিতব্য
১৫.	কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবী-রাসূল	ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক	প্রকাশিতব্য
১৬.	কুরআনের মু'জিযা	সম্পাদনা পরিষদ	প্রকাশিতব্য
১৭.	কুরআন ও বিজ্ঞান	সম্পাদনা পরিষদ	প্রকাশিতব্য

১৮.	শব্দার্থে হিসনুল মুসলিম	সাঈয়েদ ইবনে আলী আল কাহ্তানী	১২০ টাকা
১৯.	সহীহ্ আহকামে জিন্দেগী	মাওলানা ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক	প্রকাশিতব্য
২১.	রাহমাতুল্লিল আলামিন	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	প্রকাশিতব্য
২২.	কিয়ামতের আলামত বিষয়ে রাসূল (স) ভবিষ্যত বাণী	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	১৮০ টাকা
২৩.	কিয়ামতের বর্ণনা রাসূল (স) দিলেন যেভাবে	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	২৪০ টাকা
২৪.	রমজানের ৩০ শিক্ষা ৫০০ মাসআলা	আব্দুল্লাহ্ শহীদ আব্দুর রহমান	২১০ টাকা
২৫.	৩০ তারাবীতে ৩০ শিক্ষা	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	১৫০ টাকা
২৬.	নাসিরুদ্দীন আলবানী, মুফতি আমীমুল ইহসান ও আব্দুল হামীদ ফাইযী রহ.-এর গ্রন্থাবলম্বনে **রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নামায**	মাওলানা ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক মাওলানা জি এম মেহেরুল্লাহ মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	৪০০ টাকা
২৭.	মৃত্যুর পরে অনন্ত জীবন (জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা)	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	৩৫০ টাকা
২৮.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে **কবীরা গুনাহ্**	ইমাম আয যাহাবী	২৮০ টাকা
২৯.	কুরআনের আদেশ ও নিষেধসূচক আয়াত	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৩০.	বাইবেল কুরআন বিজ্ঞান	ডা. মরিচ বুকাইলি	প্রকাশিতব্য
৩১.	আসুন আল্লাহর সাথে কথা বলি	মাওলানা মো: মিজানুর রহ্মান	প্রকাশিতব্য
৩২.	তাকওয়া		প্রকাশিতব্য
৩৩.	ইসলামে নারী	আল বাহি আল খাওলী	প্রকাশিতব্য
৩৪.	ইসলামের দৃষ্টিতে প্রেম-ভালবাসা	আল্লামা ইবনুল জাওযী	প্রকাশিতব্য
৩৫.	আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না	প্রফেসর ড. ফযলে এলাহী	২৬০ টাকা
৩৬.	খাতামুন নাবীঈন (সা)	ডক্টর মাজেদ আলী খান	প্রকাশিতব্য
৩৭.	আল্লাহর পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় কাজ	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৩৮.	রাসূলুল্লাহ সা.-এর পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় কাজ	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৩৯.	আল কুরআনে ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ	যোবায়ের হোসাইন রাফীকী	প্রকাশিতব্য
৪০.	আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে প্রতিদিন (৩৬৫ দিনের ডায়েরী)	মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৪১.	ছোটদের হযরত আবু বকর রা.	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৪২.	ছোটদের হযরত ওমর রা.	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৪৩.	ছোটদের হযরত ওসমান রা.	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৪৪.	ছোটদের হযরত আলী রা.	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য

কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

কেমন ছিলেন রাসূলুল্লাহ

ISBN 978-984-91091-4-3

দারুস সালাম বাংলাদেশ
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭৩৩১১৩৪৩৩, ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯